মনুষ্যধর্ম্মতত্ত্ব

লেখক :
ডাঃ শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, B.Sc., M.B., D P.H.
"উপনয়নে উপহার ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ" এবং "বৌভাতের থালা" প্রভৃতির

প্রকাশক :

শ্রীনিমাইচাঁদ মুখার্জ্জি B. Sc.

প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬৫

মুদ্রাকর :

বিকাশ প্রেস

বি ১৬।২০ পাণ্ডে হাউলী, বারাণসী।

লেখকের নিবেদন

এই ব্রাহ্মণস্নাতকোত্তর বিভাগের তথা মনুষ্যধর্ম্মতত্ত্বের সহৃদয় পাঠকবর্গকে বিনীত ভাবে অবগত করা যায় নিম্নে :— (১) পাশ্চত্য-বিজ্ঞানের ছাত্র এই গ্রন্থকার ; উদ্ধৃত শাস্ত্র-মন্ত্রাদির ব্যাখ্যায় ও শাস্ত্রালোচনায় নাই ভাষার মাধুর্য্য এবং প্রবন্ধগুলিতেও নাই তাহার ভাবের উচ্ছ্বাস ; (২) কুতর্কপরায়ণ— যুক্তিবিচারহীন কুনিশ্চয়-বুদ্ধিসম্পন্ন-নাস্তিকজনগণের জন্য নহে এই গ্রন্থ। (৩) উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রমের সেবক এই গ্রন্থকার ; সুতরাং তাহার লেখার ধারা বহুলশঃ ঊর্দ্ধস্রোতবাহিনী এবং "মনুষ্য ধর্ম্মপ্রচারিণী"। উপাদেয় না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে নিঃশ্রেয়স্কারিণী। (৪) এই গ্রন্থের পাঠে চাই মন্ত্রাদির আলোচনায় বিশেষ মনোনিবেশ ও সুগভীর চিন্তা—ধ্যান-ধারণা। পাঠকের মাত্র মুখস্থ ও ভাসা-ভাসা চিন্তায় হইবে না কোন রসোপলব্ধি। এই ৩য়-ভাগ আশ্রয়ে চাই আলোচনাত্মক তপস্যা। ইহা অবশ্য পাঠককে মনে রাখিতে হইবে যে এই ৩য় ভাগে আলোচিত বিষয় বস্তুগুলি কঠিনতর স্নাতকোত্তর বিভাগের (postgraduate) উপযোগী এবং মাত্র উপাধিপ্রাপ্ত সজ্জনেরই পাঠ্য ও পঠিতব্য। (৫) প্রসিদ্ধ ইংরাজী প্রবাদ "PLAIN LIVING HIGH THINKING" এই মতাবলম্বী সজ্জনগণই সম্যক্ করিবেন অনুধাবন এই পুস্তক পাঠে। (৬) যাহারা ভগবৎসত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসবান নহে, গুরুজনবাক্যে ও বেদাদিশাস্ত্রবাক্যে যাদের নাই অবিচল শ্রদ্ধা, যাদের উন্মেষিত হয় নাই সুষুম্নাপ্রবাহ, তাদের পক্ষে তত্ত্বালোচনায় বিশেষ কিছু ফল হবে না। যদি সহস্রের মধ্যে একজনও এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের পথে হন অগ্রসর, অথবা এ সকল তত্ত্বকে সত্য বলিয়া আদরের দৃষ্টিতে দেখেন, তবে এই সত্যসন্ধানীর সন্ধানে নিষ্ফলতাজানিত অনুশোচনার

মধ্যেও ঘটিবে একটা অনাবিল আনন্দভোগের সুযোগ। (৭) তত্ত্বদশার দৃষ্টিতে মান-অপমান সমান পদার্থ। চিত্ত ও জীবাত্মা—এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ অনুভব করা দুঃসাধ্য; যোগী না হ'লে তাহা পারা যায় না। শুদ্ধ অনুমান প্রমাণ দ্বারা এই দু'এর পার্থক্য করা যায় না। (৮) "শব্দার্থাৎ ভাবার্থঃ, ভাবার্থাৎ তত্ত্বার্থঃ, তত্ত্বার্থাৎ মোক্ষঃ" এই শাস্ত্রোপদেশে তত্ত্বানুসন্ধানী মুমুক্ষুকে অবশ্যই জানিতে হইবে প্রথমে মন্ত্রাদির শব্দার্থ (কথার মানে), পরে জানিতে হইবে তাদের সূক্ষ্ম মানে বা তাৎপর্য্য, তবেই স্বচেষ্টায় উদ্ভাসিত হবে সাধক-হৃদয়ে মন্ত্রের তত্ত্বার্থ এবং প্রকৃত তত্ত্ব জানা মাত্রই সাধকের ছুটী বা কর্ম্মাবসান অর্থাৎ মুক্তি—জীবন্মুক্তি অথবা পরমমুক্তি।

(৯) বেদানুরাগী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য লেখা যায়—বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই প্রহেলিকাপূর্ণ এবং বেদের মধ্যে অনেক মন্ত্রে প্রহেলিকাভাবাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হইয়াছে বিকৃত; ক্রমে ক্রমে সেই বিকৃতঅর্থই লাভ করিয়াছে বিস্তৃতি। পুস্তক কলেবরে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হবে কয়েকটা ঋক্‌মন্ত্র। সুতরাং সেই প্রহেলিকাগুলির গূঢ়ার্থ নিষ্কাষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। সহৃদয় ধৈর্য্যশীল পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করে লেখক সনমস্কার অন্তরের অগ্রিম-ধন্যবাদ।

(১০) আরও শেষ বিনীত অনুরোধ যে অনবধানতা বশতঃ মুদ্রণ ও ভাষার রচনা কৌশলেয় ভ্রমপ্রমাদজনিত ত্রুটী সুধী জনোচিত ক্ষমার দৃষ্টিতে যেন দেখেন পাঠকবর্গ। যে গূঢ় কারণে "উপনয়নে উপহার ১ম ভাগের ১ম সংস্করণের মূল্য ছিল ৫'/৪ টাঃ, সেই গূঢ় কারণেই এই তৃতীয় ভাগের মূল্য ধার্য্য হইল চৌদ্দ-মুদ্রা।

ইতিপূর্ব্বে "উপনয়নে উপহার ১ম্ ভাগ" পুস্তক প্রথম সংস্করণের মূল্য কোন বিশেষ প্রহেলিকা পূর্ণ উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছিল ৫।/৪টাঃ;

এই সংখ্যার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হয় এইরূপে—**৫ টাকায়** বুঝিতে হবে স্থূল ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় ; ।/০ পাঁচ আনায় সূক্ষ্ম **৫টী** জ্ঞানেন্দ্রিয় ; এবং **৪** গণ্ডায় সূক্ষ্মতর ৪টী অন্তরেন্দ্রিয় যথা— মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। অর্থাৎ পুস্তকক্রেতাকে পুস্তকপাঠে নিয়োজিত করিতে হইবে অকপটে ও সর্ব্বান্তঃকরণে একে-একে ক্রম অভ্যাস দ্বারা তাহার ঐ **১৪টী ইন্দ্রিয়।**

আর, এখন এই নবভাবে অনুপ্রাণিত "উপনয়নে উপহার ৩য় ভাগ" পুস্তক পাঠে চাই **যুগপৎ ঐ চতুর্দ্দশ** ইন্দ্রিয়ের নিয়োজনের নিশানরূপ **মুদ্রা**, তাই ইহার ধার্য্যকৃত মূল্য—**চৌদ্দ-মুদ্রা।** ইতি—

অকপটে
বিনীত লেখক

❀

স্বাধীনতা ?

"প্রত্যেক সমাজের স্বকীয় সংস্কৃতি ও স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া বাঁচিবার যে নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা তাহারই নাম **স্বাধীনতা**"।

[ঋষি বঙ্কিম]

মন্ত্র ?

মন্ত্র যদি উপযুক্ত আধার না পায় তবে মন্ত্রও জড় বা প্রাণহীন শব্দসমষ্টিমাত্র। চাই মন্ত্রচৈতন্য ; মানুষকে আশ্রয় করিয়াই মৃত মন্ত্র হয় **সঞ্জীবিত।** [গুরুবাক্য]

ওঁ গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম ওঁ

উপনয়নে উপহার তৃতীয় ভাগ

সূচীপত্র

বিষয়বস্তুর পাশে পাশে পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রদত্ত

উপনয়নে উপহার তৃতীয় ভাগ

বা

মনুষ্যধর্ম্মতত্ত্ব

(ব্রাহ্মণস্নাতকোত্তর বিভাগ)

—ঃ ভূমিকা ঃ—

ইতিপূর্ব্বে মৎকৃত "উপনয়নে উপহার" ১ম্ ভাগ ও ২য় ভাগ পুস্তক দু'খানিতে ব্রাহ্মণত্বের প্রাথমিক আলোচনা-অবসরে প্রদত্ত হইয়াছে উপনয়নের ভূমিকায় একটী উদ্বোধনী বাণী। এই ৩য় ভাগে থাকিবে ব্রাহ্মণত্বের শেষকথা বা উপসংহার; কথান্তরে, ১ম্ ভাগটী ছিল ইহার (ব্রাহ্মণত্বের) ভিত্তিভূমি যাহার উপর দণ্ডায়মান সুপ্রতিষ্ঠিত সৌধ—২য় ভাগ; এবং সৌধ হইতে এই ৩য় ভাগরূপ সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে গগনস্পর্শী উন্মুক্ত সৌধশিরে; এখানে মিলিবে কোলাহলশূন্য প্রশান্ত জীবন্মুক্তির বিমল আনন্দ! সোপানশ্রেণীনির্ম্মাণকর্ম্মের পূর্ব্বায়োজন-স্বরূপ থাকিবে এখানে বহুলশঃ গভীরচিন্তামূলক বিষয়বস্তুর দফায় দফায় তত্ত্বালোচনা। প্রতিটী কর্ম্মানুষ্ঠানে চাই কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান নতুবা কর্ম্ম হয় নিষ্ফল। উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রমের উত্তরবাহিনী মাতার অকিঞ্চন সেবক দুর্ব্বোধ্য দুরূহ বিষয়গুলির সরল প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতে যথাসাধ্য যথাশক্তি চেষ্টা করিবে। সুধী সহৃদয় আগ্রহশীল পাঠকপাঠিকাগণ আপন আপন বিচারশক্তি দ্বারা পাঠ করিয়া উপকৃত হইলে উত্তরবাহিনীসেবকের শ্রম হইবে সার্থক।

এখানে উল্লেখ থাকে যে "ব্রাহ্মণ" মানে মাত্র কণ্ঠসূত্র ব্রাহ্মণপুত্র বা জাতিতে ব্রাহ্মণ নহে; ৷ আদর্শ ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত অব্রাহ্মণেরও আগ্রহ থাকিলে এই ৩য় ভাগ পাঠে হবেন উপকৃত—ইহাই আশা করা যায়; তাঁহাদের—অব্রাহ্মণদের পুস্তকের প্রথম ভাগটী না পড়িলেও চলিবে অথবা পড়িবার আবশ্যকতাও নাই। তবে, আগ্রহশীল স্বধর্ম্ম

নিষ্ঠ অব্রাহ্মণকে এই ৩য় ভাগ পাঠের পূর্ব্বে ২য় ভাগটী মাঝে মাঝে আশ্রয় করিতে হইবে। চারিটী যে পুরুষার্থ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ (ধর্ম্ম+অর্থ+কাম+মোক্ষ) বা চতুর্ব্বর্গ তাহা লাভের প্রয়াসী মাত্রই—মুমুক্ষু-মুক্তিকামী মাত্রই, প্রব্রজ্যা (=ভিক্ষুকাশ্রমী) মাত্রই, বানপ্রস্থাবলম্বী সজ্জনমাত্রই এই তৃতীয় ভাগ পাঠে আনন্দ পাবেন আশা করা যায়। এই ভাগ হবে ব্রহ্মকথাপূর্ণ—ব্রহ্মের পরিচয়, ব্রহ্মবিজ্ঞান।

আজ মকর রাশিস্থে ভাস্করে মাঘে মাসি শুক্ল-পক্ষে পুণ্য শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা!! মা-সরস্বতীর অন্যতম নাম বাগেদবী (=বাক্+দেবী)। এই বাগেদবীই শ্রুতির কথায় সৃষ্টি-শক্তি (Creative Imagination)—আমাদের জগজ্জননী। এই সৃষ্টিশক্তি স্বরূপা জগজ্জননী বাগেদবীই হ'ন সন্ধ্যাহ্নিকের অঘমর্ষণ মন্ত্রের "সত্যং" অর্থাৎ যথার্থভাষণধর্ম্মা সত্যরূপিণী; আর, মন্ত্রের "ঋতং" টী হ'ন যথার্থ সৃষ্টিসংকল্পবিশিষ্ট মহামন—জগৎ-পিতা। ঋতং (=পুমান্ বিশ্বপিতা) ও সত্যং (=স্ত্রী বিশ্বজননী) এই উভয়ের মিথুনমিলনে রূপান্তরিত হ'য়েছেন জগৎরূপে এবং তাহাতেই মিলেছে এই স্থূল-দৃঢ়ভূমি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত এই তৃতীয়ভাগের ভিত্তি।

আরও এখানে উল্লেখ থাকে যে "বাগ্‌দেবী" বা "সরস্বতী"—এই ডাক্‌নামে সুপরিচিতা দেবীর রাশিনাম **"উত্তরবাহিনী"**; লেখকের "শিয়াখালার উত্তরবাহিনী-মা" পুস্তকে এই রাশিনামালঙ্কৃতা দেবীর যথাসম্ভব মিলিবে পরিচয়, এবং বারাণসীর "উত্তরবাহিনী"—(গঙ্গা) প্রসিদ্ধতর ও সুবিদিত হ'লেও, বিশ্বকাশীর উত্তরবাহিনী—মহতী চিতিশক্তিই এই তৃতীয়ভাগের লক্ষ্যভূমি। অতএব ইনিই এই তৃতীয় ভাগের তথা ব্রাহ্মণস্নাতকোত্তর বিভাগের **একমাত্র দৃঢ় ভূমিকা!** তাঁরই শ্রীচরণভরসা একমাত্র সম্বল করিয়া এবং সাধকসমাজের করুণাসিক্ত দৃষ্টি ও অশুভহারী আশীর্ব্বাদ সঙ্কলনের জন্যই মুদ্রিত হইল এই ৩য় ভাগ। এই করুণাসিক্ত দৃষ্টি ও অশুভহারী আশীর্ব্বাদ পিতা-পিতামহ-পিতামহী-আদি গুরু উপগুরুগণ সঞ্চারিত মদীয়

শক্তিকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত করিয়াছে; ইহাই অকিঞ্চন ব্যাখ্যাতার ইহলোকের অবলম্বন ও পরলোকের পাথেয়॥

মা বাগ্‌দেবী-উত্তরবাহিনী! তুমি আনন্দময়ী মহাশক্তি! তুমি কর আত্মপ্রকাশ, মা! ধীরূপে—ধারণাবতী মেধারূপে! তোমার অতিগহন লীলারহস্য আমাদের এই ক্ষুদ্র-ক্ষীণ বুদ্ধিতে হউক উদ্ভাসিত। তোমার কৃপায়, ততোহধিক তোমার স্নেহে এই দুরধিগম্য মধুচক্র হইতে আনন্দময় বিজ্ঞানমধু পান করিয়া- আহরণ করিয়া হই ধন্য! জগতের লোক তোমার এই অপূর্ব্বলীলারহস্য অবগত হইয়া, তোমাকে সরল প্রাণে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখুক। দুঃখসন্তাপময় বিশ্ব আবার হউক প্রতিষ্ঠিত আনন্দে॥

মা! হও তুমি উদ্ভাসিত ধীরূপে। তোমার সাধনরহস্য তুমি করাইয়া দাও বোধগম্য আমাদিগকে। জ্ঞানভক্তির পবিত্র আলোকে! অজ্ঞানান্ধ জীবজগৎ আবার হউক উজ্জ্বল!

ভূমিকার সমাপ্তিতে—

উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রমাশ্রমীর গভীর ক্ষোভের আর্ত্তনাদ।

"একঃ দ্বৌ বা ত্রয়োবাপি যৎব্রূয়ুঃ ধর্ম্মপাঠকাঃ।
ধর্ম্মস্তদেব মন্তব্যো নেতরানাং সহস্রশঃ॥"

স্বজন-আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধুবান্ধব-সামাজিকগণের কটাক্ষ সম্পাতে বিষম ব্যথিত হইয়া গভীর ক্ষোভেই লিখি—যাঁরা আমার এই সকল উপাদেয় প্রবন্ধের প্রতি দেখান উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞা, জানি না তাঁদের উপেক্ষা-অবজ্ঞার কারণ কি? তবে আমি বলিতে পারি—তাঁদের জন্য আমার এই উদ্যম নহে! কাল যখন অনন্ত, পৃথিবীও যখন বিরাট্! তখন আমার প্রবন্ধাদির প্রকৃত রসগ্রাহী সহৃদয় মহাত্মা হয় কোথাও আছেন, না-হয় কালে (ভবিষ্যতে) জন্মিবেন। আমি নিজে যে অমৃতে—যে অপার্থিব রসে বিমুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত, সেই অমৃত যাহাদিগকে আমি ভালবাসি আমার সেই স্বদেশবাসীকে আস্বাদন করাইতে গেলাম,

আর তাঁহারা কি না মুখ ফিরাইয়া বসিলেন !—ইহাতে দুঃখ না হয় কার? হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অন্তঃসারশূন্য শোচনীয় অবস্থা দেখিলে সহৃদয় সজ্জনমাত্রেই ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনও ইহা পাঠ করিতে পারেন, সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনের হৃদয়েও আমার অনুভব সংক্রমণ করিতে পারে—এই ক্ষীণ আশার উপর ভর করিয়া, এবং ভারতবিখ্যাত স্বনামধন্য ঐশ্বর্য্যময়-মাধুর্য্যময়-মহিমময় দীক্ষা-ও-শক্তিপাতক্ষম মহাগুরু শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথজীর (যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই উপনয়নে উপহার ১ম্ ও২য় ভাগ শতাধিক খণ্ড নগদমূল্যে ক্রয় করিয়া লেখককে আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন) —সেই মহামানবের প্রেরণায় ও উৎসাহদানে উৎসাহিত হইয়াই এই জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ "উপনয়নে-উপহার"৩য়ভাগ রচনায় প্রবৃত্ত হইল মাদৃশ নগণ্য অখ্যাতনামা লেখক। যাই হোক্, আড়ম্বরশূন্য গম্ভীরার্থক শিক্ষামূলক কথায় সমৃদ্ধ এই পুস্তক, সূক্ষ্মচিন্তাশীলগণের হইবে নিশ্চয় চিত্তবিনোদী। আর উল্লেখ থাকে, মূল্যবান বিষয়বস্তুতে বিশেষ সমৃদ্ধ হইলেও বিজ্ঞানের ছাত্র—এই লেখক সাহিত্যসেবী না হওয়ায় তাহার প্রাঞ্জল লেখায় ভাষার মাধুর্য্য—লালিত্য ও ভাষায় সামঞ্জস্য হয় তো নাই। সুধীসমাজে সে ক্রটী মার্জ্জনীয়। আশা হয় প্রকৃতসুধীসমাজে পুস্তকখানি হইবে না অনাদৃত। অলমতিবিস্তারেণ। ইতি—

ওঁ-ভূঃ, ওঁ-ভুবঃ, ওঁ-স্বঃ, ওঁ-মহঃ, ওঁ-জনঃ, ওঁ-তপঃ, ওঁ-সত্যং।
ওঁভূর্ভুবঃ স্বরোঁ। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ॥ ইতি ভূমিকা সমাপ্তা।

উত্তরবাহিনী-আর্ত্তাশ্রমের অকিঞ্চন সেবক
শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

উচ্ছ্বাসের

উৎসর্গ-পত্র

পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া পিতামহী-ঠাকুরাণী ৺খাকমণি দেবীর শ্রীচরণকমলেষু সশ্রদ্ধায় সমর্পিত হইল "উপনয়নে উপহার ৩য় ভাগ" তথা এই **"মনুষ্য"-ধর্ম্মতত্ত্ব** গ্রন্থখানি। ঠাকুর-মাগো! তুমি ছিলে তোমার পিত্রালয়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য শিবমন্দিরের শ্রীশ্রীরামেশ্বরশিবের একনিষ্ঠ-ভক্ত-সেবিকা। এই পুণ্যতীর্থ ৺কাশীধামের শিব শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ দর্শনের জন্য তোমার বৃদ্ধবয়সে তোমার প্রগাঢ় আগ্রহ আকিঞ্চনে ও দয়াময় শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের স্নেহময়আকর্ষণে আমার পূজনীয় পিতামহ-ঠাকুরের নির্দ্দেশে ইং ১৯১৬ খৃঃ এনেছিলাম তোমাকে পুণ্যতীর্থ কাশী-ক্ষেত্রের শিব বিশ্বনাথদর্শনে। অতীতের এই স্মৃতি হৃদয়ে জাগায় বিশেষ অনুভূতি যে সত্যই সার্থক হ'য়েছে তোমার **শিবসাধনা!**

তখন হইতে অর্দ্ধশতাব্দীরও পরে তোমার পরিত্যক্ত তোমার একমাত্র বংশধর (তোমার একমাত্র সন্তানের একমাত্র পুত্র তথা তোমার স্নেহপুষ্ট আদরের একমাত্র এই পৌত্রটীও তোমার অশুভহারী অমোঘ আশীর্ব্বাদে তাহার বৃদ্ধবয়সে স্থায়ী কাশীবাসী হ'য়ে তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছে নিরতিশয় শ্রদ্ধাসিক্ত দৃষ্টিতে তাহার লেখনীপ্রসূত এই পারমার্থিকতত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থখানি। নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা তোমারই শিবসাধনার অমৃতময় ফল।

মা-গো! স্মৃতিপটে এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে যে, জীবনের প্রথম জ্ঞানোদয়েই তোমায় জানিতাম "মা", ও তোমায় ডাকিতাম "মা", এবং পান ক'রেছি তোমার শুদ্ধস্তন; অবোধশিশু! শৈশবেই মাতৃহারা অজ্ঞান শিশু-পৌত্রকে তাহার আপন-মা'র অকাল দেহান্তের অব্যবহিত পরই তাহার মাতুলালয় কলিকাতা-ভবানীপুর হইতে স্থানান্তরিত

ক'রেছিলে গণ্ডগ্রামে তোমার পিত্রালয়ের বাটীতে; সেখানেই অপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়া পূর্ণমাতৃত্বের অধিকারিণী হইলে তুমিই; শিশুপৌত্র তোমাকেই "মা" জানিত, "মা"-ব'লে ডাকিত অকপটে। শৈশব ও প্রথম বাল্য পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা হয় তোমারই কোলে। পরে অঘটনসংঘটনপটীয়সী মহামায়ার ইচ্ছায় পূজনীয় পিতামহঠাকুরমহাশয় ভার নিলেন তাঁহার শিশু-বালক পৌত্রের এবং গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহার আশ্রয়ে সে হইল স্থানান্তরিত। এই দ্বিতীয় স্থানান্তরে ঘুচিল তাহার ঠাকুরমাকে "মা"-বুলিতে ডাকা; শেখানো হ'লো তাহাকে যথার্থ বুলি—নূতন বুলি "ঠাকুর-মা" তথা "বড় ঠাকুর-মা", কারণ নূতন সংসারে ছিলেন তোমার ছোট সতীন মোদের "ছোট-ঠাকুর-মা"।

অনন্তর তোমার কিশোর পৌত্রের উপনয়নবাসরে সেজেছিলে তুমি তার "ভিক্ষা-মা" এবং ফিরিয়ে এনেছিলে তোমার ভিক্ষাপুত্র দণ্ডধারী বালব্রহ্মচারী পৌত্রকে ভিক্ষুকাশ্রম (= প্রব্রজ্যা) হইতে সংসারাশ্রমে এবং অদূরভবিষ্যতে বিবাহ দিবার প্রস্তাবে গেরুয়া ছাড়াইয়া পরাইয়াছিলে স্বর্ণালঙ্কার ও বারাণসী চেলী ধুতিচাদর। মা-গো! আবার তার যৌবনে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে বিবাহবন্ধনে বাঁধার প্রচেষ্টার প্রধান কারণ ছিলে তুমি! ইং ১৯২১।৩ মার্চ্চ তোমার শেষ-কর্ত্তব্য—পৌত্রের বিবাহদেয়া কর্ম্ম সমাপন করার মাত্র দুই মাস পরেই ১২ মে তোমার সাধের বালিকা নাতবৌয়ের কোলে মাথা রাখিয়া (যেন ইচ্ছামৃত্যুর মত) বিনা কষ্টে সকলের অজ্ঞাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সংবরণ করিলে ইহলোকলীলা স্বামীর সমক্ষে গঙ্গাতীরস্থ শিবপুর বাটীতে। তোমার বহুবাঞ্ছিত ও কাম্য বস্তু নাত্‌বৌকেই যেন তোমার আদরের নাতির সম্যক্ দায়িত্বভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে লাভ করিলে জীবন্মুক্তি তুমি! ধন্য **তোমার শিবসাধনা!**

মাগো! মাতৃস্বরূপ মহামায়াস্থের কত সাজই সাজ্‌লে তুমি!

গর্ভেধারণ + প্রসবকরণ + বক্ষেধারণ + স্তন্যদানে পরিপোষণ + লালন-পালন + সন্তানকে সংসারীকরণ + তাহাকে মুক্তির পথপ্রদর্শন—ইহাই তো পূর্ণাঙ্গমাতৃত্বের পরিচয় ? মদীয় জনকের জননী হ'য়েও এই ভাগ্যহীন মাতৃহারা প্রসন্তান-পৌত্রকে তাহার অসহায় অবস্থায় বক্ষেধারণ ও শুষ্কস্তন্য ও জ্ঞানস্তন্যদানে লালনপালনাদিতে ক'রেছ পরিপোষণ এবং শেষে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিনীরূপে পিতৃমাতৃহীন প্রসন্তানকে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলে সংসারাশ্রমে তুমি। আশৈশব সারাজীবন তোমারই জ্ঞানস্তন্যে লক্ষ্যস্থির রাখিয়া এই জীবনসায়াহ্নে তোমার মত মুক্তিলাভের আশায় কাশীধামে করিতেছে অপেক্ষা সে ! তাহার আশা যে অবসানে পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থায় তুমিরূপ পূর্ণব্রহ্মে অভিন্নভাবে মিলন সম্পাদনে সহায়তা করিবে তুমি !—ইহাই হইবে তোমার মহামায়াত্ব ! জগজ্জননী জগদম্বার জীবন্ত বিগ্রহ তুমি! তুমি ছিলে মোর "মা",—গুরুমা—ঠাকুরমা – ভিক্ষামা—বড় ঠাকুরমা এবং শেষে মুক্তিপথের পথপ্রদর্শক মোক্ষ-মা ! মা-গো ! সেখানে—পরমাত্মক্ষেত্রে এখনও তুমি, মনে হয়, লক্ষ্য করিয়া খুসী হইতেছ যে তোমার ক্ষেত্রে তোমার ক্ষেত্রপতি শিবঠাকুর (=কালীচরণ) কর্ত্তৃক যথাসময়ে শুভক্ষণে যে শুভঙ্কর বীজটী হ'য়েছিল উপ্ত, তাহারই উপবীজ কালে অঙ্কুরিত—পল্লবিত—পুষ্পিত-ফলিত হইয়া তোমার ক্ষেত্রস্থ বীজবৃক্ষের (=পুত্রের) এতাদৃশ শোভায় নিশ্চয়ই তোমার করে প্রীতিবর্দ্ধন ! শেষ বৃক্ষের কাণ্ড হ'তে পাঁচটী শাখা ও তাদের প্রশাখা-উপশাখা বিরাজ করিতেছে এখন বর্ত্তমানে জগদ্ধাত্রীরূপিণী-তোমার বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলার জগতে। আজও প্রত্যক্ষভাবে কিছু না করিলেও, মাগো ! পরোক্ষে অভূতপূর্ব্ব উপায়ে তোমার এই প্রসন্তানের হিতসাধনের পথ পরিষ্কার ক'রেছিলে অতীতে, এবং করিতেছ এখনও বর্ত্তমানে।

তোমার পৌত্রের সর্ব্ববিধ বাধা-বিঘ্ন-অন্তরায়-সঙ্কুল সংসারযাত্রার অগ্রগতিতে তোমার অদৃশ্য-অমোঘ-অশুভহারী-আশীর্ব্বাদই তাহার সম্বল। তোমার অন্তরের অসীম-অকুণ্ঠ-অপকট নিঃস্বার্থ স্নেহাশী-

বর্ব্বাদের স্মরণে মদীয় গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ করি অর্পণ তোমার উদ্দেশে দীনহীনের এই "মনুষ্যধর্ম্ম" গ্রন্থখানি। লও, মা! অধম-অকৃতজ্ঞ সন্তানের ভক্তিহীন শ্রদ্ধাহীন ক্ষুদ্র প্রণামী—এই গ্রন্থাগুলি তোমার আরাধ্য ৺শ্রীশ্রীরামেশ্বরের তথা জ্ঞানদেবতা শিবঠাকুরের সেবার জন্য॥

বড় মা-গো! তোমার কোলেই এই মাতৃহারা জীবটার প্রথম জ্ঞানোন্মেষ আলাগ্রামে, তার আগে কোনও স্মৃতিই এমন কি মাতৃ স্মৃতিও নেই! তোমার কোলেই জ্ঞানোদয়—কথা-বলা, হাঁটতে শেখা লেখাপড়া শেখা ইত্যাদি। তোমার স্নেহের কথা মনে পড়িলে মর্ম্ম শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যায়, যখন শৈশবেই আবার এই হতভাগ্য জীবটা হারালো তার পিতাকেও; ৺মঙ্গলময় শিব বোধ হয় এই জীবটারই মঙ্গলের জন্য তাহার পিতা তথা তোমার একমাত্র সন্তানকে সরালেন তোমার কোল থেকে, যাহাতে তোমার পূরো কোলটাই পেলো সে! এইরূপে তার জনক-**জননী** তুমি বক্ষে ধরিলে তাকে (=**ধারিণী**) এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাকে করিলে লালনপালন (=**পালিনী**); অতঃপর তার যৌবনে তাকে সংসারের মোহে ফেলে সাজিলে **বিমোহিনী**! দেখ্‌লে না মোহজালে প'ড়ে সে কতই কাতর হ'লো! তাই বলি, মাগো! আর্ত্তস্বরে এইবার কর উদ্ধার ঐ জাল থেকে তোমার সাধের জীবটাকে এবং দাঁড়াও একবার **মোক্ষদায়িনী**রূপে! তোমার সাধ্-আহ্লাদ তো মিটেছে!• এইবার দাও, মা! ছুটী!

"কাছে এসে হাতে ধ'রে, নিয়ে যাও মা! কোলে ক'রে।
আমি দু'হাত তুলে নেচে-নেচে "মা" "মা" ব'লে
ঘরের ছেলে যাই মা ঘরে"।

তোমার একান্ত স্নেহের
মুল্লুকচাঁদ
(শ্রীকনকভূষণ)
বৃদ্ধ কাশীবাসী একমাত্র পৌত্র

১। তত্ত্বালোচনা

পূর্ব্ব দুইভাগে প্রধানতঃ কথিত হ'য়েছে দ্বিজগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্যকরণীয় কর্ম্মকাণ্ডগুলি। কর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান। এই ৩য় ভাগে প্রধানতঃ থাকিবে লিপিবদ্ধ ঋষিবাক্য গুলির তত্ত্বকথা। এই তত্ত্বালোচনায় দেখিতে হইবে প্রথমতঃ, তত্ত্ব বলে কাকে ?

ব্যাকরণঃ - তত্ত্ব = তৎ + ভাবার্থে ত্ব সং ক্লী। বিস্তার করা অর্থবোধক √তন্ + ক্বিপ্ = তৎ ; তৎ-এর ভাব = তত্ত্ব। শাস্ত্রবচন—"তত্ত্বং পরমাত্মনি, বাচ্যভেদে স্বরূপে চ"—অর্থাৎ তত্ত্ব শব্দ পরমাত্মা, বাচ্যভেদ ও স্বরূপ এই সব অর্থে হয় ব্যবহৃত। ইদং-পদবাচ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বরূপতঃ 'ব্রহ্ম' ;তিনিই 'তৎ'। তৎ বা ব্রহ্মের ভাব 'তত্ত্ব'। তদ্ বা তৎ সর্ব্বনাম-শব্দ। আবার, এই "সর্ব্বনাম" বলে ব্রহ্মকে যথা শাস্ত্রবচন "সর্ব্বে চ ব্রহ্ম, তস্য নাম সর্ব্বনাম"। ব্রহ্মবাচীশব্দ এই সর্ব্ব শব্দটী যেমন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দোগ্য উপনিষৎ] অর্থাৎ, প্রত্যক্ষাদি = প্রমাণ-প্রমেয়-বস্তুজাত স্বরূপতঃ "ব্রহ্ম"। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই ; স্বরূপ-শব্দের মানে "নিজরূপ"—"স্বভাব" বা অবিকৃত, "অবিকৃতাবস্থা"! সকল বস্তুই যখন "ব্রহ্ম", তখন "ব্রহ্মই" যে সকলের "স্বরূপ"-স্বভাব—অবিকৃতাবস্থা তাহা নিশ্চিত। অতএব কোন পদার্থের স্বরূপচিন্তা ও ব্রহ্মচিন্তা এক কথা। তবে, বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ অবস্থা পরমাত্মা হ'লেও, সবাই তাহা পারে না বুঝিতে। কোন এক বস্তুর স্বরূপ ধরিতে যাইয়া—কোন এক কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব-স্ব-শক্তি-বা-প্রয়োজনানুসারে অনেকেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, কিংবা চতুর্থাদি ক্রমসূক্ষ্ম অবস্থা-বা-পর্ব্ব নিবহের মধ্যে কোন একটি অবস্থা-বা-পর্ব্বকে পরীক্ষ্যমাণ বস্তুর স্বরূপাবস্থা বা দৃশ্যমান কার্য্যের পরমকারণ মনে করিয়া ক্ষুণ্ন

সন্তুষ্ট। তাহাতেই মনে হয়—"স্বরূপ" শব্দের বা কোন শব্দেরই প্রকৃতরূপ সাংসারিক বুদ্ধিতে হয় না প্রতিভাত। অতএব তত্ত্বজিজ্ঞাসা যে জড়বিজ্ঞান দ্বারা বিনিবৃত্ত হইতে পারে না—তাহা বোঝা গেল। শ্রুতি বলেন 'তত্ত্ব' একাধিক নহে। ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২ মন্ত্র—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সমুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥"—

যিনি সেই এককেই অনেক বলিয়া বুঝিয়াছেন, দুর্ভেদ্য মায়াবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া যিনি সেই একেকে, অসৎ বা অজ্ঞেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলে, এককে জানিতে হইলে, যেরূপ সাধনা করিতে হয়, তিনি তাহা অবগত নহেন, তাঁহা দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নহে। জড়বিজ্ঞান কেন-হয় (= why ?)—এর উত্তর দিতে অপারগ ; কিরূপে হয় (How ?) ইহারই উত্তর দিতে পারেন জড়বিজ্ঞান। যে কোন শাস্ত্র হউক, সকলেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণায়ক, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়-তত্ত্ব-প্রতিপাদক। যাহা দেখা যায়, ইন্দ্রিয়দ্বারে যাহা পড়ে, তাহা কি, তাহা কি রূপে, কোন্ নিয়মে বা কি নিমিত্ত উৎপন্ন-স্থিত-বিলীন হয় ; এবং যাহা দেখা যায় না, স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়গ্রামের যাহা অবিষয়, তাহাই বা কিং স্বরূপ শাস্ত্রের এই সকল বিষয়ই প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রমাত্রেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণায়ক বটে, কিন্তু কার্য্যমাত্রের পরমকারণনির্দ্দেশ সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।

সম্বন্ধতত্ত্ব—"জগতের জ্ঞান সম্বন্ধাত্মক", "চিন্তনব্যাপার একের সহিত অপরের সম্বন্ধনির্ণয়াত্মক" (We think in relations) ; "ব্যাপ্তি"শব্দটি সম্বন্ধবিশেষের বাচক ; 'সম্বন্ধ'কথাটির এরূপ বহুশঃ ব্যবহার।

"যুক্তি" (Connection), "ব্যাপ্তি", "ক্রম" (Succession)",-"যৌগপদ্য" (Simultaniety), **"সামানাধিকরণ্য"**—এই শব্দ-

গুলি পরস্পর সম্বন্ধে সম্বন্ধ। এই "সামানাধিকরণ্য" শব্দটী = 'সমানাধিকরণ'-শব্দ + ভাবে ণ্য ; আবার সমানাধিকরণ = সমান + অধিকরণ ; সমানাধিকরণের ভাব = সামানাধিকরণ্য ; এমতে সামানাধিকরণ্যের অর্থবোধ অধিকরণপদার্থ বোধাধীন। যে কারণবশতঃ আমাদের চিন্তাস্রোত ক্রমশঃ অধিকরণপদার্থপর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে সেই কারণই "যুক্তি", তাহাও হয় সম্বন্ধতত্ত্বমূলক। যে সম্বন্ধনামক পদার্থের এতাদৃশ প্রয়োজনবত্তা সেই সম্বন্ধপদার্থের স্বরূপ যথাঃ—সম্ (সম্যক্ রূপে) + বন্ধন করা অর্থবোধক (To bind, to tie together, unite, join, connect) √বন্ধ + ঘঙ্ = সম্বন্ধ ; তাই সম্বন্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ = বন্ধনের ভাব, সংসর্গ, সন্নিকর্ষ (connection, union, relation)। বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-প্রয়োজক সংযোগের নাম "**সম্বন্ধ**"। সম্বন্ধ দ্বিবিধ—(১) সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ, (২) পরম্পরা সম্বন্ধ।

১। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বহুবিধ—সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ ইত্যাদি। অবয়বের সহিত অবয়বীর, জাতির সহিত ব্যক্তির, দ্রব্যের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ তাহাকে বলে **সমবায়সম্বন্ধ** ; সমবায়সম্বন্ধ নিত্য-সম্বন্ধ। **সংযোগসম্বন্ধ**—বামুনের পৈতার ও কলমের নিবের যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের অপায় (going away) লোকচক্ষুতে পড়ে তাহাই **সংযোগসম্বন্ধ। স্বরূপসম্বন্ধ** = বিশেষণতা ; যেমন গুড়ের মিষ্টতা ও নারীর স্তন ইত্যাদি। সম্বন্ধযুক্ত বস্তুদ্বয়ের একটী প্রতিযোগী, অন্যটী অনুযোগী, স্বরূপসম্বন্ধও যখন সম্বন্ধ, তখন ইহারও আছে অনুযোগী প্রতিযোগী ভাব। যৎসম্বন্ধিতাবশতঃ যদ্ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহা তদ্ভাবের প্রতিযোগী এবং যাহাতে আছে অভাব তাহাকে বলা যায় তদ্ভাবের অনুযোগী।

২। পরম্পরা সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধের সৃষ্টিতে (নির্ম্মাণে) সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকে, তাহা পরম্পরা সম্বন্ধ। ইহা সমবায়-সম্বন্ধঘটিত ও সংযোগসম্বন্ধঘটিত। তন্তু থেকে হয় পট, তন্তু পটের

সমবায়ি কারণ। যাহা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয়, যাহা সমবায়িকারণ তাহা দ্রব্য। তন্তু দ্রব্যপদার্থ ; তন্তুতে আছে রূপ, তন্তু তন্তুরূপের সমবায়ী। তন্তুসমবেত পটেও, সুতরাং (স্বসমবায়ি-সমবেতরূপ-সামানাধিকরণ্য নামক পরম্পরাসম্বন্ধদ্বারা) তন্তুর আছে রূপ। যে সম্বন্ধদ্বারা তন্তু-সমবেতপট, তন্তুরূপবান্ হইয়াছে, তাহা সমবায়ঘটিত-পরম্পরা সম্বন্ধ।

আর, "দণ্ড-কমণ্ডলুধারী পুরুষ গৃহে আছেন বিদ্যমান"—বলিলে, পুরুষের সহিত সংযোগসাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দণ্ডকমণ্ডলুর ও গৃহের সহিত যে সম্বন্ধ আছে বোধ হয়, তাহা সংযোগঘটিত পরম্পরা-সম্বন্ধ।

সমবায়াদি সাক্ষাৎ- সম্বন্ধের ন্যায় দৈশিক-বা কালিক ব্যবধান—দৈশিক বা কালিক বিপ্রকর্ষ, পরম্পরা-সম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। দৈশিক বা কালিক ব্যবধানে ব্যবহিত পদার্থদ্বয় পরস্পর পরম্পরা-সম্বন্ধ-সম্বদ্ধ হইতে পারে।

অর্থাৎ সম্বন্ধ কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি-কারক হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা ক্রিয়া-কারকপূর্ব্বক—ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়া ব্যতিরেকে সম্বন্ধ হয় না উপপন্ন, ক্রিয়াই নিঃশ্রয়ণীয় (সোপানবৎ, like a ladder or staircase) সিদ্ধস্বভাব দ্রব্যদ্বয়ের অথবা দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ করিয়া থাকে। ক্রিয়াকারকভাব সম্বন্ধকারণ (**original**), শেষসম্বন্ধ ফলভূত (**Derivative**)। একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায়—দানপ্রতিগ্রহাদি ক্রিয়াকারকত্ব পরস্পরকে সম্বন্ধসূত্রে করে বদ্ধ এবং উপকার্য্যোপকারক ভাবই এই সম্বন্ধের স্বরূপ।

সম্বন্ধতত্ত্ব বুঝিতে হইলে মনে রাখা চাই—

(i) ক্রিয়া-বা পরিবর্ত্তনই (**Change**) জগতের রূপ,

(ii) ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিতপদার্থের **গ্রহণার্থ** এবং অনীপ্সিতরূপে নির্ণীত পদার্থের **ত্যাগের** জন্যই অনুষ্ঠিত হয় ক্রিয়া ;

(iii) কোন জাগতিক পদার্থই নহে পূর্ণ ;

(iv) জগতের উপাদান-কারণ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ও ইতরেতরাশ্রয়ী (= পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ) ;

(v) **রসায়নশাস্ত্রসূত্রে**—(a) যদ্বস্তু যৎসম্বন্ধে ধনধর্ম্মী (Positive), তদ্বস্তু তাহার সহিত হয় সংযুক্ত (রাগ বা আকর্ষণ—attraction) (b) ধনের প্রতি ধনের (Positive), ঋণের প্রতি ঋণের (negative) হয় বিরাগ বা বিকর্ষণ—Repulsion। বস্তুদ্বয় রাসায়নিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পরস্পর যত বিষম (dissimilar) তদ্বস্তুদ্বয়ের অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা (Affinity) তত প্রবল। যে সকল বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা (— ইতরেতর-সংসক্তি) তাহারা পরস্পর বিভিন্নতাড়িতাত্মক (একটী ধনতাড়িতধর্ম্মী অন্যটী ঋণতাড়িতধর্ম্মী)! এই বিরুদ্ধতাড়িতধর্ম্মবত্ত্ব যে পদার্থদ্বয়ে যত বেশী সেই পদার্থদ্বয়ের পরস্পরসংযুযুক্ষা তত প্রবলা। একটী মিশ্র পদার্থকে পৃথককৃত (বা তাহার ঘটকাবয়ব—constituents সমূহের সন্ধি ভঙ্গ) করার সময়ে উহাদিগকে সমতাড়িতাবস্থায় আনা হয়, সমতাড়িতাবস্থায় আসিলেই constituents গুলি পরস্পর হ'য়ে পড়ে বিযুক্ত ! বিষমধর্ম্মী ঘটকাবয়ব পদার্থেই লক্ষিত হয় রাসায়নিক সংযুযুক্ষা ও তাড়িতক্রিয়া।

(c) Oxygen, Chlorine, Bromine, Iodine সর্ব্বদাই ঋণধর্ম্মী ; তাই অন্য রূঢ় পদার্থের সাথে সংযুক্ত হবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা। Potassium অতিমাত্র ধনধর্ম্মী (Strongly positive) Oxygen ভৃশ ঋণধর্ম্মী (Strongly negative) ; এইজন্য উভয়ের অন্যোন্য-সংযুযুক্ষা নিতান্ত প্রবলা, পরস্পর-সংযুক্ত, এই পদার্থদ্বয়কে (Potassium ও Oxygen) পৃথক করা কষ্টসাধ্য !

(d) একবস্তুও সম্বন্ধিভেদে হইয়া থাকে ধন-ঋণ উভয়ধর্ম্মী যথা গন্ধক (S) oxygen সম্বন্ধে ধন (positive) কিন্তু Hydrogen সম্বন্ধে ঋণ (negative)। অতএব, প্রত্যেক অণুতেই (Atom) ধন ও ঋণ এই দ্বিবিধ তাড়িত আছে বিদ্যমান !

রসায়নশাস্ত্রের মূল তত্ত্বই রস। ধর্ম্মশাস্ত্রকথায়, "রসঃ বৈ সঃ" ; রস = আনন্দ—সচ্চিদানন্দ = পরমাত্মা = সঃ।

বেদের কথায়—জগৎ ভোক্তৃ-ভোগ্যসম্বন্ধাত্মক, কোন জাগতিক

বস্তুই সর্ব্বথা সম্পূর্ণ বা পর্য্যাপ্ত নহে; ইহ-সংসার অন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, ক্রিয়াশূন্য বা পরিবর্ত্তিত না হইয়া, স্বাধীনভাবে থাকার স্থান নহে। ভিখারী থেকে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই এখানে পরমুখাপেক্ষী; সবাইই ধন-ও-ঋণ এই উভয়াত্মক। একটী পরমাণুও ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই দ্বিবিধ শক্তির সম্মূর্চ্ছিত ভাব। পঞ্চভূতের ক্ষিতি-অপ্ ভোগ্য-ভূত (=অন্ন) এবং তেজঃ-মরুৎ ভোক্তৃ-ভূত (=অন্নাদ); আর ব্যোম্—আকাশ নিখিলপদার্থের ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধাত্মক আধার= আবপনস্থানীয়। আধুনিক বিজ্ঞানের matter=ক্ষিতি ও অপ; energy=তেজঃ-মরুৎ।

সংসারে উপকার প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারও সহিত কাহারও অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ হয় না উপপন্ন; সম্বন্ধমাত্রেই উপকার প্রত্যুপকার মূলক। এই উপকার প্রত্যুপকারমূলক সম্বন্ধকেই ব্যাকরণ বলিয়াছেন স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধ, আধারাধেয়, অবয়বাবয়বী, প্রতিযোগ্যনুযোগী (প্রতিযোগী+অনুযোগী), বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাদি; অন্যান্য সম্বন্ধ ইহারই অবান্তর ভেদ। ক্রিয়াজ্ঞানই জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধাত্মক; তাই জগতের **জ্ঞান** ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধমূলক।

"একস্য সর্ব্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃভোক্তব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ॥" (বাক্যপদীয়)

ব্যাখ্যা—সর্ব্ববীজ (=সবব কারণ বা সর্ব্বশক্তিময়) ব্রহ্মের মায়া-পরিচ্ছিন্ন শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য-ও-ভোগরূপে অনেকধা (বহুরূপিণী) স্থিতিই **কালশক্তি**। খণ্ডকাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ; অতএব, সর্ব্ববীজ ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য-ও-ভোগরূপে বহুরূপিণী স্থিতিই ক্রিয়া বা জগৎ। কাল বা কালশক্তির লক্ষণ—কাল জন্যপদার্থনিচয়ের জনক, কাল জগতের আশ্রয়, কাল পরত্বাপরত্ববুদ্ধির (=পৌর্ব্বাপর্য্যবুদ্ধির) হেতু। "কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ" এই বাক্যের মর্ম্ম যে ক্রিয়াই জন্য-পদার্থনিচয়ের জনক, ক্রিয়াই জগতের আশ্রয়, ক্রিয়াই পৌর্ব্বাপর্য্য বুদ্ধির হেতু। এমতে বোঝা গেল কি জন্য

সম্বন্ধকে ক্রিয়াকারকপূর্ব্বক বলে। অমূর্ত্তা ক্রিয়া (=শক্তি), কর্ত্তৃকরণাদিকারকদ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারকশরীরে শরীরিণী না হ'লে তাহা হয় না বুদ্ধিগোচর ; কর্ত্তৃকরণাদি-কারকদ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারকশরীরে শরীরিণীই বা মূর্ত্তক্রিয়াই জগৎ। শেষ কথায়—কারণ= পরমাত্মা, সূক্ষ্ম=পরমাত্মার শক্তি এবং স্থূল=পরমাত্মার কার্য্য এই জগৎ।

স্তবস্তোত্রাদিতে বহুলশঃ ব্যবহৃত ও গায়ত্রীমন্ত্রের মুখ্য প্রসিদ্ধ শব্দটী যে "বরেণ্যং" শব্দ, তাহার সাথে আছে নিকট সম্বন্ধ অত্রালোচিত "তত্ত্ব" শব্দটীর। "তত্ত্ব" ও "বরেণ্যং" এই শব্দ দু'টীর ধাতুগত অর্থ হইতে মনে হয় তাদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থও প্রায় সমান ; এবং উভয়ের লক্ষ্য একই—অর্থাৎ উহারা পৌঁছে দেয় সাধককে সেই চিরস্থির-বস্তুতে—সেই সারতমসামগ্রী পরমাত্মক্ষেত্রে।

ব্যাকরণ—(i) চুরাদিগণীয় √বৃ—বৃঞ (আবরণে—to cover, to surround)+এন্য র্ম্ম=বরেণ্য—শ্রেষ্ঠ আবরক।

(ii) আর, তনাদিগণীয় √তন্ (বিস্তারে—to stretch, to extend, or to surround) হইতে উৎপন্ন "তৎ" শব্দের উত্তর ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন এই "তত্ত্ব"-শব্দটী।

অতএব বলা যায়—আবরণ ও বিস্তারণ (ব্যাপ্তি ও বিশালতা) ক্রিয়ায় প্রায় সমানধর্ম্মার্থবোধসূচক শব্দ দু'টীর ("বরেণ্যং" ও "তত্ত্ব") লক্ষ্য একই বস্তু—সেই **সারতম সামগ্রী**—পরমাত্মার নিত্য নিরঞ্জন সত্তার শক্তি।

তত্ত্বালোচনার উপসংহারে বলা যায়—সর্ব্বতত্ত্বেরই **মূলতত্ত্ব** পরমাত্মা। সর্ব্বদা-সর্ব্বত্র-সর্ব্বথা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই একমাত্র সত্য **তত্ত্ব** ; এবং পরমাত্মার সাথে নিকটতম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ জীবাত্মা মাত্র মোহবশতঃ খুঁজিতেছে নিরন্তর তাহার জনককে—পরমাত্মাকে ! সেই পরমাত্মাকেই বলা হয় কথান্তরে নারায়ণঃ ; নারস্য (=তত্ত্বসমূহস্য) অয়নম্ যঃ সঃ

নারায়ণঃ ; অথবা আরও, নারস্য [= জলস্য] অয়নম্ যঃ সঃ "নারায়ণঃ" । নমো নারায়ণায় নমঃ ।

২। তত্ত্ববিচার-কথা

কর্ম্মানুষ্ঠানের তত্ত্বানুসন্ধানে তত্ত্বনির্দ্ধারণের প্রধান উপায়—**বিচার**। শাস্ত্রের উপদেশ—যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে ; সে শ্বাস-প্রশ্বাস ও আহার-নিদ্রা প্রভৃতি জীবিতের কর্ম্ম করিলেও, বস্তুতঃ জীবিত নহে সে ; তাহার জীবন অনর্থক। অতএব নিম্নে প্রদত্ত হইল কতিপয় মূল্যবান বিচারকথা :—

১। বিচারই সাধুদের গতি ; বিচার না করিলে মোহ ভঙ্গ হয় না ও অজ্ঞান হয় না নাশ। ২। বিচার ব্যতীত বিদ্বানের নাই অন্য উপায়। ৩। বুদ্ধিবিচারবলেই সাধুদের অধিকাংশই অশুভ ছাড়িয়া প্রাপ্ত হন শুভ। ৪। বিচারবলেই সফল হয় ধীমানগণের বল-বুদ্ধি-তেজঃ প্রতিপত্তি-ক্রিয়ানুষ্ঠান এই সমুদয়। ৫। কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা—তাহা নিশ্চয় করার পথে বিচার মহাদীপস্বরূপ ! ৬ কেবল বিচার দ্বারাই ঘটে শুদ্ধজ্ঞানলাভ। ৭। বিচার দ্বারাই দুর্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হয় সম্ভব। ৮। মানুষের পক্ষে বিচারশক্তিই ভগবদ্দত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান ; ইহাতে মানুষের অসাধারণ অধিকার ; ইতরজীবসঙ্ঘ হইতে এই বিচারশক্তিই মানুষকে করে বিশেষিত ! ৯। বিচার ব্যতিরেকে হয় না জ্ঞানলাভ। ১০। বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল কারণ। অথর্ব্ববেদ বলেন, "যাহা আন্তর, তাহাই বাহ্য ; যাহা বাহ্য তাহাই "আন্তর", আন্তর জগৎই যে, বাহ্যজগতের আকার ধারণ করে—তাহা সূক্ষ্ম বিচারেরই সিদ্ধান্ত। ১১। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোন কোন ধীমান্ করেছেন অনুভব—"ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রকার স্থূল শক্তির মূল ; বিচারশক্তিই

আন্তর ও বাহ্য জগতের আদ্যাশক্তি। ১২। যিনি বিচারবিহীন, যাঁহার তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাসবশতঃ বিচারশক্তির হয় না স্ফূরণ, তিনি মৃত বা জড়বৎ। ১৩। যথারীতি বিচার না করিলে কোন বিষয়ের তত্ত্বদর্শন হয় না। ১৪। ত্রিপুটী বিচার—যথাঃ—(জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান), (দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন), (ভোক্তা-ভোগ্য-ভোগ), (গ্রহীতা-গ্রাহ্য-গ্রহণ), (দাতা-দেয়-দান), (শ্রোতা-শ্রাব্য-শ্রবণ) ইত্যাদি এক অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রেই তিনটী তরঙ্গ, লোকের নিকট জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-রূপে হইতেছে প্রতিভাত। কি রূপ-রসাদিবিষয়, কি কামাদিবৃত্তি, সবই ঐ ত্রিপুটী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিচারকেই বলে ত্রিপুটী প্রয়োগ অথবা জ্ঞানদাতা শিবঠাকুরের ত্রিশূল প্রয়োগ। আবার এই যে বিচার, ত্রিপুটীবিচারের শক্তি যোগান যিনি, তিনি তুরীয়া—চতুর্থী, মহতী চিতিশক্তি—মহামায়া, যে শক্তি প্রভাবে উক্ত জ্ঞানসমুদ্র জ্ঞাতৃ জ্ঞান-জ্ঞেয় রূপে হয় তরঙ্গায়িত; সেই শক্তি "চতুর্থী-শক্তি"।

উপসংহারে বলা যায়—যিনি বিচারশীল, যিনি বস্তুতঃ জীবিত, তিনি কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বিচার করার প্রবৃত্তি, সাধুভাবে বিচারকরার শক্তি, পূর্ব্ববাসনা বা অভ্যাস জনিত সংস্কারানুসারে, গুণভেদনিবন্ধন হ'তে পারে ভিন্ন।

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যং তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

৩। সত্যানুসন্ধান

সত্যদর্শন তথা ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শন করিতে হইলে চাই সত্যানুশীলন ও সত্যানুসন্ধান এবং তাহাতে একান্ত প্রয়োজন সযুক্তি বিচার বিশ্লেষণ। সত্যসন্ধানে প্রয়োগ করিতে হয় পূর্ব্বকথিত বিচারবুদ্ধি।

কি আধিভৌতিক ক্ষেত্রে, কি আধিদৈবিক ক্ষেত্রে, অথবা কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানই প্রধান কর্ত্তব্য। কি ইহজাগতিক ক্ষেত্রের ও কি সেই পারমার্থিক ক্ষেত্রের পথে অগ্রসর হ'তে হয় এই বিচারের সহায়তায়।

সত্য কাকে বলে ?—সর্ব্বোপনিষৎসার বলেছেন, "সত্যমবিনাশি নামদেশকালবস্তুনিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি তদবিনাশি"। অর্থাৎ যাহা অবিনাশী—যাহা অপরিণামী (**Unchangeable something**), যাহা নষ্ট হয় না এমন কি নাম-দেশ-কালাদির নাশ হইলেও যাহার নাই ধ্বংস, যে তত্ত্ব নিয়তস্থির তাহাই সৎ, এবং যাহা সৎ ও যাহা অব্যভিচারী, তাহাই **সত্য**।

'যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতম্ যদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্' [শঙ্করাচার্য্য]

যেরূপে যাহা হয় নিশ্চিত, যে-রূপে যাহা হয় বুদ্ধির বিষয়ীভূত, যদি তাহা—(সেই রূপ) কদাচ ত্যাগ না করে, অর্থাৎ সেই রূপের যদি কখন না হয় অন্যথা—না ঘটে ব্যভিচার, তবে তাকেই বলে সত্য। সত্যসন্ধানী অবশ্যই জান্‌বেন যে, এখানে আলোচ্য পারমার্থিক সত্য ছাড়াও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আছে আরও সত্যের প্রতিরূপ যেমন প্রাতিভাসিক সত্য, জাগতিক সত্য, ব্যবহিত সত্য ও অব্যবহিত সত্য। জীবের ক্ষুধা জীব কোন ব্যবধান রহিত হইয়াই নিজেই করে অনুভব—এ সত্যটী জানার জন্য তাহাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয় না, কোন পূর্ব্ব ঘটনা হইতে অনুমান করিতে হয় না, তাহার অন্তর্বোধই এ সত্যের প্রমাণ, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ বা অব্যবহিত সত্য। স্বতঃসিদ্ধ সত্যসমূহ কোন শাস্ত্রের বিষয় নহে যাহা গুরুমুখে গ্রহণযোগ্য। আর, **ব্যবহিত** সত্যসমূহই শাস্ত্রাদির বিষয়বস্তু এবং পূর্ব্বসত্য হইতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, অন্য প্রমাণের উপর করে নির্ভর ঐ ব্যবহিত সত্য।

গমনার্থক √গম+ক্বিপ্ হইতে নিষ্পন্ন জগৎ-শব্দটী; জগৎ পদার্থটী কি তাহ'লে অসত্য বা মিথ্যা, যেহেতু জগৎ গমনশীল বা সততচঞ্চল বা প্রতিক্ষণ পরিণামী পরিবর্ত্তনশীল? জগৎ যদি মিথ্যাই

হয়, তাহা হইলেও মিথ্যারূপে জগৎকে বলিতে হইবে সত্য, যেহেতু জগতের মিথ্যাত্ব বা পরিবর্ত্তনশীলত্ব অব্যভিচারী অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল—নিয়ত গতিশীল। এই লক্ষণ-অনুসারে জগতের সত্যত্ব হয় সিদ্ধ ; কারণ, জগৎ চিরদিনই জগৎ—গতিশীল ও পরিণামী ইহা নিশ্চিত। তাই জগৎকে সত্য-মিথ্যা দুইই বলা যায়, নিত্য ও অনিত্য দুইই। কারণভাবে—সন্মাত্রাবস্থায় জগৎ সত্য বা নিত্য, কার্য্যভাবে জগৎ মিথ্যা বা অনিত্য। যাহা বিকারাত্মক, তাহাই অনিত্য। ভাববিকারাত্মাতে, সুতরাং, জগৎ অনিত্য ; কিন্তু, আত্মভাবে জগৎ অপরিচ্ছিন্ন—অখণ্ডৈকরস-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মরূপে নিত্য। জগতের মূলে নিহিত আছে অনন্ত সত্তা ; অপরিচ্ছিন্নভাব মূলে না থাকিলে, পরিচ্ছিন্নভাব থাকিতে পারে না। জগৎ সন্মাত্রাত্মায় নিত্য ; আর, যেহেতু বিকারমাত্রেই অনিত্য সেহেতু পরমাণু-আদি ভাববিকারাত্মার বিকারাত্মকত্ববশতঃ জগৎ অনিত্য।

ভাব বা সত্তা দ্বিবিধ—নিত্য কারণাত্মক ও অনিত্য কার্য্যাত্মক ; আমাদের কার্য্যাত্মক সত্তা বা ভাবই ইহ জগৎ বা সংসার।

ইহজগতের স্বরূপ ও সীমানির্দ্দেশ—কার্য্যাত্মক ভাব ত্রিগুণময়ী মায়ার ভাব = সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ষড়্‌ভাববিকার। ইহজগৎ সসীম ও পরিচ্ছিন্ন (Finite)—ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত ভাব হয় কার্য্যাত্মভাব। যে ভাব সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক, যে ভাব বর্ত্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট, তাহা কার্য্যাত্মভাব বা ইহজগৎ ; পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জাগতিক অবস্থাই (বর্ত্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ) অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দেরই (= সত্যেরই) মায়াপরিচ্ছিন্ন ভাব। সত্য বা কারণাত্মভাব হইতে কার্য্যাত্মভাব স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নহে।

সীমা—বর্ত্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়াত্মক নিখিল জগৎ সত্যরূপ-পরমকারণ পরব্রহ্মেরই মহিমা বা স্বকীয় সামর্থ্য বা স্বীয়শক্তি বিশেষ। এখানে জিজ্ঞাস্য তাহা হইলে ত্রিকালময় জগতের রূপই কি সত্যের বাস্তব রূপ ? কথান্তরে অনিত্য বা মিথ্যা জগৎই কি তিনি বা

সত্য ? উত্তরে বলা যায়—না, ইহজগৎ সত্যের বাস্তব স্বরূপ নহে। ইহজগৎ হইতে অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার এই জগদ্রূপ মহিমা বা সামর্থ্য (=শক্তি) হইতে সত্যস্বরূপ 'পরমাত্মা' অতিশয় বৃহৎ বা অত্যন্ত অধিক। বিশ্বভূত সেই সত্যস্বরূপ .পরমাত্মার চতুর্থাংশ মাত্র ; ইহার অবশিষ্ট তিন অংশ হয় অমৃত—বিনাশরহিত ও সদাতন-চিরস্থায়ী এবং নিত্য ও দ্যোতনাত্মক অর্থাৎ স্বপ্রকাশ-স্বরূপে চিরব্যবস্থিত। জগৎ সত্যজ্ঞান অনন্তব্রহ্মের স্বরূপাপেক্ষায় মাত্র অল্প। অনন্ত সত্যরূপ পরব্রহ্মকে বিভক্ত করা অসম্ভব ; তাঁর ইয়ত্তা যে হইতে পারে না তাহা নিঃসন্দেহ ; তবে এরূপ করার তাৎপর্য্য এই যে জগৎ সত্যের স্বরূপ অবস্থা হইতে অনেক ক্ষুদ্র, জগৎ তাঁহার একাংশ মাত্র—এই সত্যই বিজ্ঞাপনকরা এই কথার তাৎপর্য্য ! সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের বস্তুতঃ নাই ইয়ত্তা।

গীতার কথায়, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি"। অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার এই এক পাদ (=অংশ) মায়াদ্বারা পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করিয়া থাকে।

সত্যস্বরূপ পরমাত্মার এই এক পাদ মায়াযুক্ত, অবশিষ্ট পাদত্রয় মায়াবিনির্মুক্ত। ইচ্ছাময় পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে ইচ্ছা বা মায়াদ্বারা ব্যাপ্ত হন দেবতির্য্যগাদি বিবিধরূপে—**সাশন**রূপে (অর্থাৎ ভোজনাদি-ব্যবহারোপেত চেতনপ্রাণিজাত) এবং **অনশন** রূপে (অর্থাৎ তদ্রহিত অচেতন গিরিনদীসাগর প্রভৃতি) ; নিজেই এই উভয়রূপে বিবিধ হইয়া সৃষ্টি করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অখণ্ড **একরস**সত্তা সচ্চিদানন্দের ভাব **দু'টী**—নিত্যভাব বা কারণাত্মভাব (=সৎ সত্য) ও কার্য্যাত্মভাব (=অসৎ-মিথ্যা)। এই নিত্যভাব সদাতনাবস্থা—চিরস্থায়ী, ইহা পরিদৃশ্যমান জন্মাদিবিকারময় সংসারের বহির্ভূতাবস্থা এবং জগৎ সংসারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত ; জনন-মরণ-আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ প্রভৃতি সাংসারিক দোষ এই নিত্যভাবকে পারে না স্পর্শ করিতে, এস্থানে নাই

কালের কোন অধিকার, এস্থান সদানন্দময়, এই স্থানেই যাবার জন্য জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক লালায়িত আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলেই ; আরামপ্রার্থি-জীবজগতের লক্ষ্যস্থান ইহাই— এই সত্য-নিত্য-ভাবই। পরব্রহ্মের স্বরূপ কারণাত্মভাব আর তার পাশেই কার্য্যাত্মভাব, পরিবর্ত্তনের ভাব—ক্রিয়াময় ও মায়িক অবস্থা ; আমরা আছি যে ভাবে, আমরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম যে ভাবের, তাহাই হয় কার্য্যাত্ম-ভাব। উহা ব্রহ্মের অপরাবস্থা. উহা অপরব্রহ্ম ও বিকারাত্মক ; পক্ষান্তরে কারণাত্মভাব নিত্য ও নির্ব্বিকার।

কারণাত্মভাবের স্বরূপ—যে ভাব অদৃশ্য তথা বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য, যাহা অন্তর্ব্বহিঃ এই অবস্থাদ্বয়শূন্য, যে ভাব অগ্রাহ্য তথা কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের অবিষয়, যিনি অগোত্র (অর্থাৎ যাঁহার এমন মুল নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাকে যায় চেনা—ইনি এমন ব ইনি তেমন), যিনি অবর্ণ (দ্রব্যের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও শুক্লত্বাদিধর্ম্মের নাম বর্ণ, যিনি তদ্বিরহিত তিনিই অবর্ণ), যাঁহার নাই চক্ষুকর্ণাদি কোন প্রকার ইন্দ্রিয়, যিনি অপাণি-পাদ, যিনি নিত্য (অবিনাশী), যিনি বিভু (অর্থাৎ যিনিই ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত চেতনাচেতন বিবিধ পদার্থরূপে হন প্রকাশিত, যিনি সর্ব্বগত (অর্থাৎ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী). যিনি সূক্ষ্ম, যে ভাব অব্যয় (অর্থাৎ সর্ব্বদাই যাহা একরূপ) এবং যাহা সর্ব্বভূতযোনি (সর্ব্বকার্য্যের কারণ); **তিনি কারণাত্মভাব।** এই নিত্যত্ব আবার দ্বিবিধ—এক কূটস্থ নিত্য (=একভাবে চিরস্থায়ী), অপর প্রবাহরূপে নিত্য। আবার তাহাও নিত্যপদবাচ্য, যাহার তত্ত্ব বা তদ্ভাবত্ব হয় না নষ্ট। জগৎ কূটস্থ নিত্যতাপেক্ষায় অনিত্য হ'লেও প্রবাহরূপে নিত্য ; কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বা আবির্ভাব-স্থিতি-তিরোভাবাত্মক জগৎ আছে বিদ্যমান্ অনাদি কাল হইতেই এবং থাকিবেও বর্ত্তমান্ অনন্তকালের জন্য। যে চন্দ্র সূর্য্য এখন দেখিতেছি ইহারা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে ; এই ভূলোক-ভুবলোক-স্বর্লোক-জনলোক-তপলোক-সত্যলোক সকলেই আছে অনাদি কাল হইতেই। কোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস বা বিনাশ

প্রাপ্ত হয় না। যাহা নাই—যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব। অ-বস্তু ও অ-ভাব হইতে বস্তুসিদ্ধি ও ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না।

জন্মাদিষড়্ভাববিকার অবিচ্ছিন্নপ্রবাহাত্মক—

জন্মাদিষড়্ভাববিকারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই জগৎ। জন্মের পর স্থিতি স্থিতির পর বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পর বিপরিণাম, বিপরিণামের পর অপক্ষয়, অপক্ষয়ের পর বিনাশ, বিনাশের পর আবার জন্ম, আবার স্থিতি আবার বিপরিণাম, সূত্রপাত হইতে সংসার-বন্ধনমোচন (=জীবাত্মা-পরমাত্মার একীভূত ভাবে মিলন) পর্য্যন্ত : অর্থাৎ যতদিন না পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় ততদিন সকলকেই অবিরাম জন্মাদিভাববিকারে হইতে হইবে বিকৃত—অবশভাবে জন্মাদি পরিণামস্রোতে নিয়তগতিতে ভাসিয়া যাইতে হইবে।

সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে বীজগণিতের ভাষায় যদি ছয়টী অক্ষর ব্যবহার করা যায় ছয়টী ভাববিকারের নামের পরিবর্ত্তে যেমন, জায়তে = ক, অস্তি = খ, বর্দ্ধতে = গ, পরিণমতি = ঘ, অপক্ষয়তি = ঙ, নশ্যতি = চ ; তাহা হইলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে যে ষড়্ভাববিকার গুলি নিয়তপরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহাদের তত্ত্ব হয় না বিনষ্ট ; অতএব তাহাও নিত্যপদবাচ্য, সুতরাং ষড়্ভাবময় জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য ; জাগতিক ভাবজাত ব্যক্তিতঃ অসত্য বা অনিত্য হইলেও তত্ত্বতঃ সত্য। তাই জগৎ সদসদাত্মক। জগতের মূর্ত্তি দাঁড়ায় বীজগণিতের ভাষায়—(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)+(ঙ)+(চ)= প্রবাহরূপে নিত্যতা **(Constant quantity)**। শক্তি সুরক্ষণের (ঠিক ঠিক বজায় রাখন) সূত্র (**Principle of the conservation of energy**) ধরিয়া দেখা যায় যে বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সমূহের সমষ্টিতে সদাই দাড়ায় এক নির্দ্দিষ্ট নিত্য পরিমাণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে বামের **symbol** গুলি (ক) প্রভৃতি নিজেই নিজেই নিত্য নির্দ্দিষ্ট ; বস্তুতঃ প্রতিটাই পরস্পর পরস্পরে পরিবর্ত্তনশীল।

[বিঃ দ্রঃ **সত্যাদি শব্দসমূহের শব্দবিজ্ঞান :—**

(i) :—সত্য = সৎ-শব্দ + ভাবে ষ্ণ্য ;

সৎ = ভাববচন (বিদ্যমানার্থবাচী) √অস + শতৃ ক ব্যাকরণসূত্র "অস্ ভুবি"— অনুসারে এই সত্তার্থক ধাতু অস্ অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী **(to be)** ; (লট-বিধিলিঙ্ লোট্-লঙ্ ভিন্নে আর্ধ ধাতুকে প্রত্যয়ে পরে অস্‌ধাতোঃ স্থানে ভূরাদেশো ভবতি)। আরও, এই সম্পর্কে সূত্র, "অকর্ম্মকধাতুভির্যোগে দেশ-কাল-ভাব-গন্তব্যাধ্ববাচকানাং শব্দানাং কর্ম্মসংজ্ঞা ইতি"। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সেট্ ধাতু "ভূ সত্তায়াম্"

এখানে উল্লেখ থাকে আরও যে এই সৎ-শব্দের উত্তর ভাবে ত প্রত্যয় করিলে ব্যুৎপন্ন হয় "**সত্তা**"-শব্দ এবং আরও ভাবে ত্ব প্রত্যয় করিলে ব্যুৎপন্ন হয় "**সত্ত্ব**"-শব্দ। এইরূপে একই ধাতু √অস্ হইতেঃ ব্যুৎপন্নঃ—(ক) "**সৎ**"-শব্দ-বা-বস্তু যেখানে নাই কোনই ভাবের বালাই ; কথান্তরে "সন্মাত্র"-(= সৎ + মাত্র)-অবস্থা ; কালক্রমে পরিবর্ত্তনের ফলে নির্ভাব "সৎ"-এ ঢুকিল ভাব ; এবং সেই ভাবে "ষ্ণ্য" যুক্ত হওয়াতে নূতন শব্দ হইল (খ) "**সত্য**" (সৎ-র আদি ভাব); এবং অপর দু'টী প্রত্যয় তা ও ত্ব যুক্ত হ'য়ে ব্যুৎপন্ন হইল। (গ) "**সত্তা**" **(existence)** ও (ঘ) "**সত্ত্ব**" **(the first of the three inherent qualities or strands of nature**—সত্ত্বগুণ—"সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকম্")।

(ii) "**পরিবর্ত্তন**"—শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বিচারে দেখা যায়—**পরিবর্ত্তন** = "পরি" উপসর্গ (= বর্জ্জন বা ত্যাগ) + থাকা অর্থে √বৃত ভাববাচ্যে ল্যুট ; সুতরাং ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ = বর্জ্জন বা ত্যাগ-পূর্ব্বক অবস্থান, অর্থাৎ পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়া অপরভাবে সংক্রমণ কর্ম্মই "পরিবর্ত্তন"।

(iii) **ভাব**—ভাব কাকে বলে ? যাহা সৎ—বিদ্যমান্, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যাহা বুদ্ধিগোচর হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তাহা 'ভাব'। ভাব = সত্তার্থক ভ্বাদিগণীয় পঃ সেট ধাতু √ভূ + ঘঙ্

ব্যাকরণসূত্র—"ভূ সত্তায়াং" ! শুদ্ধ-সরল সাধারণ ধারণার (=অনুবৃত্ত-বুদ্ধির—Abstract notion) হেতুই ভাব বা সত্তা; যে কোন পদার্থই হউক, তাহাই সত্তার গর্ভে ধৃত এবং সকল পদার্থই ভাবের বা সত্তার বিকার। অতএব ভাবই—সত্তাই (Existence) **কেবল** বা **পরসামান্য**। ব্রাহ্মণ-মানব-জীব-সত্তা এই সব শব্দের অর্থ চিন্তা করিলে মনে হয়, পর পর শব্দ পূর্ব্ব-পূর্ব শব্দের ব্যাপক অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শব্দবোধ্য অর্থ পর-পর শব্দবোধ্য অর্থ হইতে অল্প-বিষয়-অল্পদেশবৃত্তি (Less comprehensive)। ব্রাহ্মণ শব্দটী মনুষ্যের তুলনায় অল্পদেশবৃত্তি, কারণ ইহা মনুষ্যপদবোধ্য অর্থের অন্তর্ভূত। মনুষ্যনাম, সুতরাং, ব্রাহ্মণনামাপেক্ষায় পর বা ভিন্ন; আবার মনুষ্য, ব্রাহ্মণশব্দের অপেক্ষায় ভিন্ন বা অধিক-দেশবৃত্তি বটে, কিন্তু জীবনামাপেক্ষায় অপর বা অল্প-দেশবৃত্তি। এইরূপ জীবও আবার, মনুষ্যের তুলনায় পর (ভিন্ন) হইলেও সত্তার তুলনায় অপর। সত্তাই, সুতরাং, পরজাতি বা **পরসামান্য** (Higher class), ইহা হইতে আর পর (প্রধান-শ্রেষ্ঠ-অধিক) নাই।

বিশুদ্ধসত্ত্বের (=নিস্তরঙ্গ প্রকৃতির) উপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ—এই দুই গুণ বা শক্তি ঘটায় তরঙ্গ বা ভাববিকার; ইহাই জগৎ। বিমল স্ফটিক যেমন নীল-পীতাদি উপরঞ্জক দ্রব্যের সংযোগে আকারিত হয় তৎ-তদাকারে; এক সামান্য-সাধারণ সত্তা সেই রকম আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়জনিত পরিস্পন্দনাত্মিকা-ক্রিয়াসম্বন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়া বহুরূপে হইয়া থাকে অভিব্যক্ত। আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই বিকারদ্বয়ের অন্তরালাবস্থার নাম স্থিতি-ভাব। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব শব্দদ্বয়ের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ চিন্তনীয়; আবির্ভাব=আবিস্+√ভূ+ঘঞ্; তিরোভাব=তিরস্+√ভূ+ঘঞ্; পদদ্বয়ের উভয়েই 'ভাব'-শব্দটী বিদ্যমান; আবিস (=আবিঃ) সুস্পষ্ট-প্রকাশ্য অর্থে অব্যয়শব্দ এবং তিরস (=তিরঃ) অন্তর্দ্ধান অর্থে অব্যয়শব্দ। আবিস ও তিরস্—

পরস্পরবিপরীতার্থক এই অব্যয় শব্দদ্বয়ের সংযোগবশতঃই ইহারা হইয়াছে ভিন্নপদার্থ। আবির্ভাব ও তিরোভাব—এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে প্রকাশভাব ও অপ্রকাশভাবের বাচক। যে কোন-রূপ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হউক, আরম্ভ হ'তে শেষ-পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয়ের পূর্ব্বাপরীভূতভাব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। "The homogeneous is instable and must differentiate itself." এই প্রবচনের প্রসঙ্গে বলা যায়—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়ের পরস্পর সমাবেশের ভিন্নতায় প্রধানতঃ ষড়্ভাববিকার হওয়াই প্রাকৃতিক। কারণসমূহের সমাবেশ ও পরস্পর সান্নিধ্যের তারতম্যই (permutations and combinations) কার্য্যের বা সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু। বৈষম্য বা প্রকৃতির বিসদৃশপরিণাম হইতেই হয় সৃষ্টি ; অতএব সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যই সৃষ্টির কারণ। যদি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিতয়ের সত্ত্বের স্থলে "ক", রজোর স্থলে "খ" ও তমোর স্থলে "গ" অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহইলে ঐ তিনটী অক্ষরের ষড়্বিধ বিভিন্নরূপ সমাবেশ (permutations) হয়, যথা—১। (ক+খ+গ), ২। (খ+ক+গ), ৩। (গ+ক+খ), ৪।(ক+গ+খ), ৫। (খ+গ+ক), ৬। (গ+খ+ক) ; এইরূপে, জগৎ প্রধানতঃ ষড়্ভাব বিকারই বটে।

(iv) বস্তু—কোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; যাহা নাই, যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব। অবস্তু—অভাব হইতে বস্তুসিদ্ধি—ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না। নিবাসার্থক √বস্ (to exist) + তুন্ = বস্তু। যাহা বাস করে—অবস্থান করে, যাহা সৎ, তাহাই বস্তু ; ন বস্তু = অ-বস্তু, অর্থাৎ, অ-ভাব। জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য ; যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার অভাব (= একেবারে নাশ) এবং যাহা অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার সদ্ভাব অসম্ভব। অতএব, অতীত ও অনাগত (= ভবিষ্যৎ) স্বরূপতঃ **বিদ্যমান**। এক সত্ত্বেরই ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন অভিব্যক্তি-মাত্র

হয়। ধর্ম্ম বা গুণেরই ঘটে অধ্বভেদ (=পরিবর্ত্তন—বিপরিণাম—change of condition), ধর্ম্মী বা বস্তু থাকে ঠিক, সত্তার হয় না ধ্বংস।

(v) মিথ্যা—অসত্য—অসৎ, অভাব, অবস্তু; যাহা প্রতীত হয়, অথচ নাই তাহা **মিথ্যা** যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম; আর, যাহা প্রতীত হয় না এবং নাইও তাহাই **অসৎ** যেমন বন্ধ্যাপুত্র। ব্যাকরণের নঞতৎপুরুষ সমাসসূত্রে ছয় প্রকার অর্থ হয় নঞের, যথা, সদৃশ-অভাব-ভিন্নতা **অল্পতা**-অপ্রশস্ততা-বিরোধ। সূত্র যথা—

"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

যেহেতু ব্রহ্মনিরূপণসূত্রানুসারে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম বা সত্য—সদ্বস্তু—সৎ ছাড়া কোথাও কিছু নাই এবং অসত্য-অসৎ-অভাব-অবস্তু বলিয়া কিছু নাই, সবই ভাসিতেছে একমাত্র সৎ-র কোলে, সেইহেতু এই নঞতৎপুরুষবিশেষ শব্দগুলিতে "অ"-এর অর্থ ধরিতে হইবে অল্পতা—ঈষদর্থে "অ"-প্রয়োগ; যেখানে অল্পমাত্র বা ঈষৎ মাত্রায় এই সর্ব্বব্যাপিনী সৎ তাহাই অসৎ; সেইরূপ অসত্য অভাব অবস্তু ইত্যাদি এইরূপ সত্য-মিথ্যাই লৌকিক-ব্যবহারিক লীলা-জগতের ইচ্ছানুযায়ী বিধির বিধান ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক জগতের কথা, "সৎ অসৎ তৎ পরং যৎ"

এখানে আলোচ্য "মিথ্যা" শব্দ মানে সত্যবিরোধী অথবা যাহা করে অপলাপ সত্যের তাহাই মিথ্যা। "মিথ্যা"—শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ—বধকরা অর্থে √মিথ (to kill)+ক্যপ্ র্ম্ম+স্ত্রিয়াং-আপ্ =মিথ্যা। প্রসঙ্গতঃ এই √মিথ হইতেই নিষ্পন্ন "মিথুন"-শব্দটীও; যুগ্ম-দ্বন্দ্ব-স্ত্রীপুরুষ অর্থবোধক এই মিথুন-শব্দটীর আছে গূঢ় তাৎপর্য্য।] ব্রহ্মনিরূপণসূত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-অনুসারে পূর্ণ-অদ্বিতীয় মহাসত্য—লীলাবিহীন সন্মাত্রক্ষেত্রে উপভোগ করিতেছিলেন একাকী নির্জ্জনতা-নিঃসঙ্গতার আনন্দ; এমন সময় কাহার যেন ইচ্ছায় (অঘটনসংঘটনপটীয়সী মহামায়ার) লীলাকৈবল্য বশতঃ সেই

একাকিত্ব নাশ করিতে (বধ করিতে যেন) উদ্ভব হইল দ্বিতীয় এক গুণনীয় কারণশক্তি ; শ্রুতির কথায় "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি" ; ইহাই আদি মিথ্যাশক্তি—একাকিত্বনাশিনী ব্যভিচারিণী-শক্তি ; "বিহায়স্থিতির্ব্যভিচারঃ"। ইহার লক্ষ্য সদাই স্বপ্রকাশ-সত্যকে আবৃত করা বা সত্যের করা অপলাপ। যাই হোক এই বিশ্বনাটকে এই যুগ্ম (শক্তি + পুরুষ)—বহুত্বের লীলাভিনয়ের জন্য অবতীর্ণ মিথুনরূপে। বিশুদ্ধসত্য তথা সত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে জাগিল ভাব, "একোঽহম্ বহুস্যাম্" ; এই ভাবের বশেই মিথুনের আবির্ভাব এবং মিথুনের দ্বন্দ্বেই আরম্ভ হ'লো সৃষ্টি ; মিথ্যাজ্ঞানই দ্বন্দ্বের কারণ। বাৎস্যায়ন মুনির কথায়, "যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি" অর্থাৎ, যেখানেই মিথ্যাজ্ঞান সেখানেই বিদ্যমান রাগদ্বেষ। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানবশগ ব্যক্তিতেই বাস করে রাগ-দ্বেষ। যাহা, যাহা নহে, যে ধর্ম্মীতে যদ্ধর্ম্ম বস্তুতঃ নাই, তাহাকে তদ্বৎ বা তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জানা,—ইহাই মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। পক্ষান্তরে যাহা—যে ধর্ম্মী বা দ্রব্য, ঠিক যদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাকে ঠিক তদ্রূপে জানার নাম **সত্য** বা যথার্থ-জ্ঞান = সমীচীনঅনুভব, ইহার নাম বিদ্যা।

যাহা দুষ্ট বা ব্যভিচারি জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান চতুর্ব্বিধ যথা—(i) সংশয়, (ii) বিপর্য্যয়, [পদার্থের পারমার্থিক রূপকে যে জ্ঞান রাখে আচ্ছাদন করিয়া (= প্রতিভাসিত হইতে দেয় না), যে জ্ঞান অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ—অযথার্থ, তাহারই নাম বিপর্য্যয়জ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ (= উপলব্ধ পদার্থের রূপ তদ্রূপ, তদ্রূপে যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা তদ্রূপ্রতিষ্ঠিত ; ন তদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ। শুক্তিতে রজতজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান — অযথার্থা-নুভব], স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়। মিথ্যাজ্ঞানের কারণ দু'টী — ইন্দ্রিয়-দোষ ও সংস্কারদোষ। **চক্ষুঃ** কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি রোগ বা-বার্দ্ধক্য-দূষিত হইলে পদার্থসকলের যথাযথ রূপ মেলে না চিত্তে—ইহাই ইন্দ্রিয়-দোষ। দ্বিতীয় কারণ, সংস্কারদোষের কথায়—মানুষ যাহা কিছু করে

অনুভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা যে কোন বিষয় গ্রহণ করে, সেই বিষয়ের সংস্কার তাহার চিত্তে থাকে লগ্ন—তাদের ছবি (copy or image) তাহার চিত্তপটে হয় অঙ্কিত। অনুভূত বিষয়গুলি কালে স'রে গেলেও (তাদের অনুপস্থিতিতেও সে তাদের রূপ যথাযথরূপে ধ্যান করিতে পারে) ; চিত্তে অনুভূত বিষয়ের ছাপ লাগিয়া থাকাই (= সংস্কারই) তাহার একমাত্র কারণ।

৫। সত্যসন্ধানে কারণ-জ্ঞান

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভুক্তান্নই দেহের মূল ; ভুক্তান্ন জলদ্বারা দ্রবীভূত ও জঠরাগ্নিদ্বারা পচ্যমান হইয়া পরিণত হয় রসাদি ভাবে ; রস হইতে শোনিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে 'মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে সারতম সামগ্রী যে শুক্র-রেতঃ-বীর্য্য-তেজঃ পদার্থ তাহা হয় সমুদ্ভূত। এইরূপে যে অন্ন দেহের মূল, ইহাও উৎপত্তি বিনাশশীল, সুতরাং অন্নও কার্য্য বা বিকারপদার্থ। যাহা কার্য্য, অবশ্যই আছে তাহার কারণ ; অন্নের কারণ পর্য্যালোচনায় দেখা যায়—অন্ন যেমন দেহের সাক্ষাত কারণ, জল তেমন অন্নের কারণ ; জল পদার্থও বিকার বা কার্য্য পদার্থ, জলের কারণ তেজঃ ; আবার তেজঃ ও মূল পদার্থ নহে, তেজের কারণ সদ্বস্তু। সদ্বস্তুই সেই সত্যনারায়ণ পরমকারণ—ইহা অকার্য্য, ইহা অন্য কোন কারণ কর্ত্তৃক পিহিত (লুক্কায়িত-আবৃত) নহে। সুতরাং ইহাই—এই সত্যই জগতের মূল কারণ ; স্থাবরজঙ্গম নিখিল প্রজারই এই অদ্বিতীয়, এই অকারণ সৎস্বরূপ সত্যনারায়ণরূপ পরব্রহ্মই পরমকারণ ; ইহার নাই কোনই কারণ ; জগৎ যে কেবল সন্মূল, তাহা নহে, স্থিতিকালেও ইহা সদাখ্য পরব্রহ্ম-সত্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে বিদ্যমান্। ঘটের কারণ মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটের স্থিতি যেমন অসম্ভব, জগৎকারণ ঐ সৎ-নামক পদার্থ

ব্যতিরেকে জগতের সত্তা বা স্থিতিও তেমন অসম্ভব। জগৎ সন্মূল, সদায়তন (= সৎ + আয়তন) এবং সৎপ্রতিষ্ঠ, কথান্তরে সৎ-বস্তুই এক মাত্র বস্তু যাহা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব যেমন "ঘট"-নামমাত্রে হয় পর্য্যবসিত—মৃত্তিকাবাদে ঘটের বাস্তব অস্তিত্ব যেমন নাই তেমন বিশ্বের মূলকারণ সৎ-পদার্থ ব্যতীত বিশ্বের থাকে না অস্তিত্ব।

মৃত্তিকা ও ঘট, এই বস্তুদ্বয় পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মৃত্তিকা কারণ, ঘট ইহার কার্য্য। কারণশূন্য কার্য্য হইতে পারে না। যতদিন ঘট থাকিবে, ততদিন মৃত্তিকা ঘটকে ছাড়িবে না। মৃত্তিকা যে ঘটের কারণ, তাহাতে নাই কোন সন্দেহ; মৃত্তিকাবাদে থাকে না ঘটের অস্তিত্ব— সত্য বটে, কিন্তু মৃত্তিকাজ্ঞান ও ঘটজ্ঞান সমান নহে; ঘটের বদলে মৃত্তিকা শব্দ বলিলে, ঘটশব্দের উচ্চারণের উদ্দেশ্য হয় না সিদ্ধ। মৃত্তিকা হইতে কুম্ভকার করে ঘট চিরদিনই, তথাপি মৃত্তিকার মৃত্তিকারূপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, সকল মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয় নাই, মৃত্তিকা ও ঘটের (কারণ- কার্য্যের) স্বতন্ত্র সত্তা আছে অব্যাহতই। প্রথমেই বলা হয়েছে কার্য্যাত্ম ও কারণাত্মা-ভেদে দ্বিবিধ ভাব, তন্মধ্যে কারণাত্ম ভাব কূটস্থ-নিত্য ও কার্য্যাত্ম-ভাব প্রবাহরূপে নিত্য: তাই জগৎ কার্য্যাত্মভাব এবং ইহা প্রবাহরূপে নিত্য; আরও, ব্রহ্মের ভাব দ্বিবিধ—পর ও অপরভেদে, তন্মধ্যে **পরব্রহ্ম** সত্বলক্ষণ—সন্মাত্রলিঙ্গ, তিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ রস-গন্ধ-ময় বা বিকারাত্মক নহেন; তিনি অমৃত—অপরিণামী। পক্ষান্তরে, **অপরব্রহ্ম**—ভাববিকার, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-এই ত্রিগুণময়। তাঁহার স্বরূপ—মধ্যস্থ বিশুদ্ধ সত্ত্বের উভয় পাশে আবির্ভাবাত্মক রজঃ ও তিরো-ভাবাত্মক তমঃ। রজঃ=কাম, তমঃ= দ্বেষ; রাগ ও দ্বেষই কর্ম্মহেতু এবং কর্ম্মের মূর্ত্তি এই জগৎ। অতএব ক্রিয়ার বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞানই জাগতিক জ্ঞান; ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান= দ্বৈতজ্ঞান; সুতরাং, জাগতিক জ্ঞান ও দ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধাত্মক। জগৎ বা কার্য্যাত্মভাব প্রবাহ

রূপে নিত্য, অতএব, দ্বৈতজ্ঞানও প্রবাহরূপে নিত্য।

ঘটের সহিত মৃত্তিকার যেমন নিত্য সম্বন্ধ, তেমন দ্বৈতজ্ঞানের সহিত অদ্বৈতজ্ঞানের, অর্থাৎ কার্য্যের সহিত কারণের নিত্যসম্বন্ধ। দ্বৈত-জ্ঞানের পশ্চাতে সদাই বিদ্যমান্ অদ্বৈতজ্ঞান, অপরভাব কদাচ নহে পরভাব বিরহিত। তাই বলা যায় দ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাব দু'টীই সত্য। শুদ্ধসত্ব, নিষ্কাম, ব্রহ্মজ্ঞানির কাছে অদ্বৈতজ্ঞানই অব্য-ভিচারিজ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞানী একব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু পান না দেখিতে। অবিদ্যা কামদ্বারা সম্যক্ বদ্ধ, বিক্ষিপ্তচিত্ত বহির্মুখ ব্যক্তি, দ্বৈতজ্ঞান ছাড়া অদ্বৈতজ্ঞানের কোন সংবাদ রাখেন না, দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চাতে অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈতজ্ঞান তাঁহার অগম্য।

সাধারণ ধারণায় জ্ঞান (consciousness) উৎপত্তি-বিনাশশীল ও আপেক্ষিক। পরিবর্ত্তন (= ক্রিয়া) বা কার্য্যাত্মভাবের জ্ঞানকেই লোকে "জ্ঞান" বলিয়া জানে। কার্য্য, কারণেরই পরিচ্ছিন্ন (conditioned) অবস্থা; কার্য্যমাত্রেরই আছে একটী পরমকারণ (unconditioned cause) অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নভাবের মূলে নিশ্চয়ই আছে অপরিচ্ছিন্নভাব (= অনন্তসত্তা—Absolute Reality by which it is immediately produced)—পারমার্থিক সত্তাজ্ঞান, চিন্তাশীল সাংসারিক দ্বারা এইরূপ মাত্রই হইয়া থাকে অনুমিত। যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিতে না পারিলে অর্থাৎ বৃত্ত্যধীন জ্ঞান একেবারে তিরোহিত না হইলে, পারমার্থিক জ্ঞানের হইতে পারে না বিকাশ। অতএব, চিত্তবৃত্তি যতদিন না সম্যক্প্রকারে নিরুদ্ধ হয়, ততদিন সকলকেই পরিচ্ছিন্নজ্ঞান বা দ্বৈতবুদ্ধি লইয়া থাকিতে হইবে। অদ্বৈত বা অবিভক্তজ্ঞান স্বরূপতঃ সত্য হইলেও সংসারী যথাযথরূপে তাহা উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে। সাংসারিকের কাছে দ্বৈতজ্ঞানই প্রধান। দ্বৈতজ্ঞানদ্বারাই নির্ব্বাহিত হয় নিখিল লোকব্যবহার।

৬। সত্যানুসন্ধানে দ্বৈত-অদ্বৈত বিচার

দ্বৈতাদ্বৈত এই দ্বিবিধ জ্ঞানেরই **সত্যত্ব** প্রতিপাদন ক'রেছেন ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২১।২২ মন্ত্র দ্বারা—

"ন বিজানামি যদি বেদমস্মি নিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসাচরামি।
যদামাগন্‌প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ॥"

মন্ত্রের ভাবার্থ—ইদং-পদবাচ্য জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে পৃথক বস্ত্বন্তর নাই; কার্য্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ নহে ভিন্ন – ইত্যাদি শাস্ত্র বচন সকলের প্রকৃত মর্ম্ম যাঁহার হইয়াছে হৃদয়ঙ্গম, তিনি অনায়াসে বলিতে ও ভাবিতে পারেন—"আমিই বিশ্ব; আমি (অহং) বা সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম ছাড়া জগতের স্বতন্ত্র আকৃতি বা পৃথক সত্তা নাই, থাকিতে পারে না। শুনেছি—ব্রহ্মই জগৎ, আত্মাই বিশ্ব, আমিই কৃৎস্ন প্রপঞ্চ, কিন্তু কার্য্যকারণ বা দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে বর্ত্তমান্, অবিদ্যাদ্বারা সম্যগন্ধ, মায়া-পরিবেষ্টিত, বহির্মুখ, সুতরাং বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, আমি কিরূপে বলিব—"আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগদাকারে?", পরিচ্ছিন্ন হৃদয় আমার, অহং ও মম বা আমি ও আমার ইত্যাকার দ্বৈতবুদ্ধি আমাতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবল, দুঃখে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত এবং সুখে হয় প্রসারিত, নিন্দায় ক্লেশ এবং স্তুতিতে হইয়া থাকে আমার হর্ষ; দুর্জ্জয় কামরিপুকে জয় করিতে আজও আমি হই নাই সক্ষম, তবে কেমন করিয়া আমি বলিব, "অহমেবেদং সর্ব্বং" অর্থাৎ আমিই সব, আমি ছাড়া নাই দ্বিতীয় বস্তু। তাই আমিই ব্রহ্ম, আমিই বিশ্ব—একথা স্পষ্টতঃ বলিতে পারি না আমি; "একমেবাদ্বিতীয়ম"—এক ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই শাস্ত্রোদ্ভাসিত তত্ত্বজ্ঞান সম্যগ্‌রূপে অনুভব করার আমি অযোগ্য। তবে কি আমি কেবল কার্য্য, আমি শুদ্ধ দ্বৈত? না, তাহা নয়, অদ্বৈতভাব যে আমার পশ্চাতে রহিয়াছে, আমি যে দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী তাহাও

বুঝিতে পারি। "মনসা চরামি", অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা সম্যক্ বদ্ধ হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতময় জগতে—সংশয়াত্মক মনের বশে বিচরণ করিতেছি আমি—ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতেছি, আমি এখন বৃত্ত্যাধীন। অদ্বৈতজ্ঞানের—আমিই ব্রহ্ম ইত্যাকার অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির কি কখন বিকাশ হওয়া সম্ভব নহে? দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী মানব কি কখন সর্ব্বদুঃখহর শান্তিময় অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন না? ইহার উত্তর—পারেন। ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ—প্রথমোৎপন্ন—চিত্ত-প্রত্যক্প্রবণজনিত অনুভাব-আদিভূত জ্ঞান যখন আমাকে প্রাপ্ত হইবে - ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া যখন আমি অতীন্দ্রিয় সনাতন জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিব, বহির্মুখীন চিত্তবৃত্তিকে যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যখন আমি অন্তর্মুখীন করিতে পারিব, তখনই আমার অদ্বৈতজ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হইবে—আমার সর্ব্বসংশয় হইবে বিদূরিত, এক ব্রহ্মভিন্ন বস্তন্তর নাই—এই অমূল্যোপদেশের মর্ম্ম-তখনই আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইব সক্ষম।"

স্বপ্রকাশ পরমাত্মা রূপরসাদি ও রসাদি-বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ইন্দ্রিয়নিচয়; লোকসকল তাই ইন্দ্রিয়দ্বারা দেখে বাহ্য বিষয়, দেখিতে পায় না অন্তরাত্মাকে। অন্তরাত্মাকে দেখার করণ, ইন্দ্রিয় নহে। তবে কে কোন্ উপায়ে অন্তরাত্মাকে দেখিতে পান? সংসার অনিত্য, সংসার দুঃখময়—যাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাস—প্রতীতি হইয়াছে স্থির, আমরা যাহা চাই সংসার তাহা পারে না দিতে, অথবা তাহা দিবার শক্তি সংসারের নাই—যিনি এ-কথা ঠিক-ঠিক বুঝেছেন, অমৃতত্ব বা মুক্তি-লাভেচ্ছু তাদৃশ ধীর (= বিবেকী) ব্যক্তি বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া বহির্মুখ চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া, অন্তরাত্মাকে পান দেখিতে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে দ্বৈতাদ্বৈত দুই মতকেই আদর ক'রেছেন ঋগ্বেদ।

আগুনে পোড়ে হাত, বিষপানে জীব মরে, এটী "আমার" ছেলে, ও-ছেলেটী 'আমার' কেউ নয়, ইনি "আমার"-মিত্র, ও "আমার" শত্রু

ইত্যাদি ঘোর দ্বৈতবুদ্ধি সংসারী মানুষের মধ্যে যখন প্রবল, তখন অগ্নির নাই দাহিকা শক্তি, অথবা বিষ ও সুধা সমান পদার্থ—একথা সংসারীর মুখে সাজে না। তাহার কাছে, "এক ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই"—কথাটী পাগলের প্রলাপ। সংসারীর কাছে আগুন—আগুন, জল—জল ; দ্বৈতজ্ঞানী সংসারী সুধা ও বিষকে এক সমান পদার্থ বলিতে পারেন না। কর্তৃকরণাদি কারক দ্বারা বিভক্ত জ্ঞান (Consciousness) লইয়াই সংসারী বাস করেন, স্বস্বামিভাবাদি-সম্বন্ধজ্ঞান-ভিন্ন অবিভক্ত বা অদ্বৈতজ্ঞানের (True knowledge) বিমল আলোক দেখিতে পান না সংসারী, তাই তিনি দ্বৈতজ্ঞানী।

[দ্বৈত শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :- দ্বৈত=দ্বীত+ভাবার্থে অণ্ ; দ্বীত=দ্বি+ইত (গত্যর্থে √ই+ক্ত ;) "গমের্জ্ঞানার্থকত্বং" এই ব্যাকরণ সূত্রে - যে সকল ধাতুর অর্থ **গতি** তাহারা **জ্ঞানার্থক** ও **প্রাপ্ত্যর্থক**ও হয়। এই সূত্রটীর কথাটা শুনিতে ক্ষুদ্র-নগণ্য হ'লেও বস্তুতঃলুক্কায়িত আছে ইহার মধ্যে অনেক অত্যন্ত সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক রহস্যের **সত্য**। ৫ গতিমাত্রই যে ঈপ্সিততমকে পাবার জন্য হয় প্রবর্ত্তিত - স্থিতিই যে গতির লক্ষ্য, এতদ্বারা তাহাই সূচিত। কেবল তাহাই নহে, গত্যর্থক ধাতুসকল জ্ঞানার্থকও হইয়া থাকে ; এই কথাটুকু দ্বারা কি না বলা হ'য়েছে? ঈপ্সিততমের সমাগম যে কেবল জ্ঞানসাধ্য—ইহা দ্বারা তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেয়া হ'য়েছে।]

সে যাহা হউক, দুই (দ্বি) দ্বারা যাহা ইত, অর্থাৎ, একাধিক ভাব দ্বারা যাহা জ্ঞাত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত, তাহা দ্বীত এবং দ্বীতের ভাব দ্বৈত। আরও, দ্বৈত-শব্দটীর অন্যরূপ অর্থও করা যায়, যথা—দুই-এর ভাব দ্বিতা, এবং যাহা দ্বিতা বা একাধিকভাব সম্বন্ধীয় তাহা "দ্বৈত"। দুই প্রকারদ্বারা—বিরুদ্ধ উভয়ধর্ম্মপ্রকারকজ্ঞান দ্বারা ইত বা জ্ঞাত= দ্বীত, যাহা দ্বীতবিষয়ক, তাহা দ্বৈত। অথবা, দুই বা অনেকের ভাব= দ্বিতা, অর্থাৎ, "নানাত্ব", যাহা দ্বিতা বা নানাত্বসম্বন্ধীয়, তাহা দ্বৈত। পরমার্থদশাতে - পারমার্থিক দৃষ্টির বিকাশে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মভিন্ন

বস্তন্তরের অস্তিত্ব হয় না উপলব্ধি, ব্রহ্মবিদের কাছে এক ভিন্ন নাই দ্বিতীয় পদার্থ। শ্রুতি অদ্বৈতজ্ঞানকেই বলেছেন পারমার্থিক **সত্যজ্ঞান**। নানাত্ববুদ্ধি = মিথ্যাবুদ্ধি ; ইহা অন্তঃকরণবৃত্ত্যধীন জ্ঞান, ইহারই অপর নাম অবিদ্যা ; অবিদ্যা যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকিবেঃ। আরও, দ্বৈতজ্ঞানে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য বা ভোক্তৃ ভোগ্য, এবম্প্রকার বিভক্তজ্ঞানে, একজন দ্রষ্টা বা কর্ত্তা বা বিষয়ী এবং অন্য দৃশ্য – কর্ম্ম বা বিষয়রূপে হয় লক্ষিত ; কিন্তু যে মহাত্মা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অহং-ভাবে দেখিয়া থাকেন, আত্মেতর পদার্থ যাঁহার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না, তিনি আর কি দেখিবেন ? কাহাকে ভোগ্যরূপে বা দৃশ্যরূপে নিশ্চয় করিবেন ? আত্মা হইতে পৃথক পদার্থই যখন নাই তখন কোন পদার্থ তাঁহার ভোগ্য বা দৃশ্যরূপে হইবে বিবেচিত ?

আরও, পুংশক্তির ও স্ত্রীশক্তির বিনা সংযোগে কোনরূপই ক্রিয়া হয় না। ক্রিয়াজ্ঞান, সুতরাং, প্রবৃত্তি-সংস্থ্যান বা আবির্ভাব-তিরোভাব, এই ভাব বিকারদ্বয়ের জ্ঞান দ্বারা হয় সিদ্ধ। জগতের জ্ঞান ক্রিয়াজ্ঞান ; জগৎ হয় ক্রিয়া-কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার। অতএব দ্বৈতজ্ঞানই জগৎ।

দ্বি তথা ২ = ১ + ১ ; এক কি ? একরূপ ক্রিয়ানুভূতিই **এক**, এবং দুইপ্রকার ক্রিয়ানুভূতিই **দুই**। তাই দ্বিত্বজ্ঞান অপেক্ষাবুদ্ধিজ বা আপেক্ষিক (Relative)। **এক** ও আর-**এক** বা ১ + ১ এতদ্বাক্য নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপর অনুভূতিদ্বয়ের মিলনসূচক ; পূর্ব্বানুভূতি ও অপরানুভূতি অথবা পূর্ব্বানুভূতিযুক্ত অপরানুভূতি—ইহাই সূচিত হয় এই দ্বি ২ = ১ + ১ অঙ্ক দ্বারা – পৌর্ব্বাপর্য্য, কালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য (Relatioos of sequence) এবং দেশকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য (Relations of co-existence) ; কথান্তরে, পূর্ব্বকালানুভূতি + অপরকালানুভূতি, অথবা পূর্ব্বদেশানুভূতি + অপরদেশানুভূতি, [বিঃ দ্রঃ —নিরুক্তভাষ্য বলেন "পৌর্ব্বপর্য্যং হি দেশকালকৃতম্"। আবার কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ ["ক্রিয়ৈব কালঃ"।] ; ক্রিয়া, কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার এক পদার্থ ; অতএব কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ যে সংসারীর কাছে দ্বৈত-

জ্ঞানমূলক তাহাতে নাই সন্দেহ। এই দ্বি+গত্যর্থে √ই হইতে নিষ্পন্ন শব্দ দ্বৈত সূচনা আরও করে—যাহা গতিশীল, তাহা নিশ্চয়ই ভাবাভাবময় ও প্রকাশাপ্রকাশাত্মক। **সংসার** বা জগৎ হয় গতিশীল (=সততচঞ্চল), এই জন্য ইহা ভাবাভাবময় ও এখানে আছে জন্মমৃত্যু, আছে দিবস-রজনী, আছে আরোহ-অবরোহ, আছে জ্যোৎস্নী-তমিস্রা। এখানে নিবৃত্তিকে পিছনে ফেলে প্রবৃত্তি (উৎপত্তির বা জন্মের) প্রকাশ করে আপনাকে; এদেশে মরার জন্যই হয় জন্ম, এখানে বিয়োগযাতনা ভোগকরার জন্য হয় সংযোগ; পরিবর্ত্তনশীল সংসারে পতিবত্ন‍্গা পত্নীর ন্যায় যামিনী নিত্যসঙ্গিনী দিবসের; এখানে তমিস্রা (=আঁধার) কে পিছনে রেখে আসেন জ্যোৎস্নী (=আলো); জগৎ সুরাসুরের সংগ্রামস্থল—তাদের জয়-পরাজয়চক্র পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে নিয়মিতরূপেই।

এখানে আরও স্মর্ত্তব্য সেই সন্ধ্যাহ্নিকের অঘমর্ষণ মন্ত্রের যুগ্মমূর্ত্তি ঋতং (পুমান্) ও **সত্যং** (=স্ত্রী---যথার্থ ভাষণধর্ম্মা বাগ্‌দেবী বা সৃষ্টিশক্তি) এঁরাই বিশ্বসংসারের মূল।

সাধারণ মানুষ জগৎকে মাত্র জগৎরূপেই দেখে; আর, সত্যদর্শী সাধক সজ্জন জগৎকে দেখেন সত্যরূপে। এক দল মানুষ আছেন যাঁহারা **জগৎকে বলেন মিথ্যা।** ব্রহ্ম বা **সত্যই** জগৎরূপে প্রতিভাত—এই দর্শনই সত্যদর্শন। সদ্যোজাত নিরাময় শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদে; স্নেহময়ী জননীর শান্তিময় কুক্ষি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই কাঁদার কারণ—গর্ভবাসকালে শিশু যে ভাবে থাকে গর্ভচ্যুত হইয়া সে ভাবে থাকিতে পায় না। সংসারীর সমীপে জন্ম, উৎসবের সামগ্রী এবং মৃত্যু, শোকের সামগ্রী; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী দেখেন না প্রভেদ জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে। মৃত্যুর সময় সংসারী যে কারণে কাঁদে, সদ্যোজাত শিশু সেই কারণেই জন্মের সময় কাঁদে। পরিবর্ত্তনই মৃত্যু— ইহা জানিয়াই সূক্ষ্মদর্শী সদ্যোজাত শিশু কাঁদে, তাহার কাছে এই সংসার বা জগৎ পরিবর্ত্তনাত্মক, অতএব ইহা মৃত্যুর রাজ্য; ভীষণ কঠোর-শাসন

শমনগ্রাসে পতিত, শমনভয়নিবারিণী জননীর অঙ্ক-চ্যুত বিপন্ন শিশু কালের ভীষণরূপ দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠে। আরও স্মর্ত্তব্য বিবাহরাত্রের পরদিন বর-ক'নে বিদায়কালীন কন্যাপক্ষীয়দের ও ক'নের ক্রন্দনের পাশাশাশি বরের বাড়িতে সকলের সাথে ক'নের ও হাঁসিমুখ। অবিরাম এক ভাব হইতে ভাবান্তরে যাওয়ার নামই সংসারবাস। [বি দ্রঃ —"সংসার"—শব্দটী নিষ্পন্ন এইরূপ—সংসার = সম্ + ভ্বাদিগণীয় পঃ √সৃ (to move on, to slide, to slip) + ঘঞ্] ! "সংসরত্যস্মাৎ **মিথ্যাজ্ঞান**জন্য সংস্কাররূপবাসনায়াম্", অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত সংস্কাররূপ বাসনার নাম সংসার, যাহাতে একভাবে থাকার নাই উপায়,—একভাবে থাকার চেষ্টা করিলেও যেখানে সরিয়া পড়িতে হয় তাহাকে বলে সংসার। অতএব, সংসার যে মৃত্যুর রাজ্য তাতে নাই সন্দেহ।

আরও, জন্মই হউক্ অথবা মৃত্যুই হউক, জাতের বা মৃতের সমানোদকদের হয় অশৌচ; শাস্ত্রকার জন্মাশৌচ ব্যবস্থাও ক'রেছেন, কারণ তাঁহার উপদেশ—জন্ম ও মৃত্যু সমানসামগ্রী।

জন্ম ও মৃত্যু যে সমানসামগ্রী তাহা যিনি বুঝিতে পারেন, ভাব বিকার সমূহ যে পরস্পর শৃঙ্খলিত, জন্ম ও মৃত্যু বা আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, ইহারা ভাববিকারের দেশকালকৃত—পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মক্রমসূচক-শব্দ-ভিন্ন আর কিছু নহে—ইহা যাঁহার হৃদয়ে গেঁথেছে, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন—অভাব হইতে ভাবের এবং ভাব হইতে অভাবের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। তাঁহার হৃদয়ে স্থান নাই মিথ্যাজ্ঞানের।

"মিথ্যাজ্ঞান" বলে কাকে ? যাহা, যাহা নহে—তাহাকে তাহা বলিয়া জানা, অথবা যাহা বস্তুতঃ যাহা, তাহাকে তাহা বলিয়া না-জানার নাম মিথ্যাজ্ঞান (**a false notion, a wrong impre-ssion**) মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ যথা :—

(i) আত্মা নাই"—এইরূপ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান, (ii) অনাত্মপদার্থে

আত্মবোধ, **(iii)** দুঃখে সুখবোধ, **(iv)** অনিত্যে নিত্যবোধ (v) অত্রাণে ত্রাণবুদ্ধি, **(vi)** সভয়ে নির্ভয়বুদ্ধি, **(vii)** জুগুপ্সিতকে (নিন্দিতকে) সমর্থন-অনুমোদন, **(viii)** ত্যাজ্যকে গ্রাহ্যরূপে নিশ্চয়করা, (ix) প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলেও কর্ম্ম নাই ও কর্ম্মফল নাই—এইরূপ প্রত্যয়, **(x)** দোষসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও, সংসার দোষনিমিত্ত নহে—এইরূপ বিশ্বাস **(xi)** প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্ম বস্তুতঃ সৎ হইলেও পুনর্জ্জন্ম নাই, মৃত্যুর পর এমন কিছুই (জীবই বল, সত্ত্বই বল, বা আত্মাই বল, কোন পদার্থ ই) থাকে না যাহার হইবে পুনর্ব্বার জন্ম, জন্ম অনিমিত্ত— বিনা কারণে হয় জন্ম, জন্মবন্ধের (বা মৃত্যুর)-ও নাই কোন কারণ, ইহাও অনিমিত্ত, দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-ও বেদনাসন্তান (=উপলব্ধি— Sensations ; ইত্যাদির নিবৃত্তি হইলে আত্মারও হয় নিবৃত্তি ; তবে আবার কাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে—এইরূপ প্রতীতি ; (xii অপবর্গ বা মোক্ষ ভয়ঙ্কর পদার্থ যাহাতে উপরম (বন্ধ) হয় সর্ব্বকার্য্যের, ও যে অপবর্গ সর্ব্বকল্যাণবিলোপী সেই জড় সেই অচৈতন্য অপবর্গকে অখিল সাংসারিক-সুখভোগপরিত্যাগপূর্ব্বক চাইবে কোন্ বুদ্ধিমান্ ?—এইরূপ মতিই **মিথ্যাজ্ঞান**। এই মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধন অনুকুল পদার্থে রাগ (অনুরাগ বা **Attraction—affinity**) এবং প্রতিকুলপদার্থে হয় দ্বেষ **(Repulsion—aversion)** রাগ ও দ্বেষ হইতে ঈর্ষ্যা-লোভাদি দোষ সমূহের হয় আবির্ভাব ; দোষপ্রযুক্ত জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; এবং তজ্জন্য জীবকে পুনঃ পুনঃ (যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান না হয়) জন্মপরিগ্রহ করিতে ও বিবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে কথিত যে, জগৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি—জগৎ পরিবর্ত্তনের ছবি ; রাগ-দ্বেষই কর্ম্মোৎপত্তির হেতু, রাগ-দ্বেষ ব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়ার হয় না উৎপত্তি ; আবার ঐ রাগদ্বেষ মিথ্যাজ্ঞানাধীন এবং অপূর্ণ-বা-**পরিচ্ছিন্ন শক্তিই** আবার মিথ্যাজ্ঞানের কারণ; ব্যাকরণে দেখা যায় এই "পরিচ্ছিন্ন"-শব্দের বিজ্ঞান—পরি + ছেদন করা – বিভিন্ন করা অর্থে রুধাদি গণীয় উভয়পদী √ছিদ (**to cut, to divide**) + ক্ত ;

'পরি' উপসর্গের অর্থ বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন বা বিভক্ত হওয়া; ∴ যাহা ছিন্ন, ভিন্ন বা বিভক্ত (cut off—divided), যাহা পরিমিত (measured or condtioned) তাহাই পরিচ্ছিন্ন; পরিচ্ছিন্না এমন যে শক্তি তাহাই পরিচ্ছিন্নশক্তি। আবার, শক্তি = স্বাদিগণীয় পঃ, অথবা দিবাদিগণীয় উঃ সামর্থ্যবাচী √শক্ (to able, to b ar) + ক্তিন্; ∴ শক্তির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হবার যোগ্য, যোগ্যতাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীর বা দ্রব্যের যাহা ধর্ম্ম ["যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ।"], কারণের যাহা আত্মভূত ["কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং।"] যদ্দারা পরলোক জয়,—মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারা যায় আত্মাকে (=সংস্কারাত্মক আত্মাকে বা মনঃকে অর্থাৎ, যদ্বারা জীব জীবত্ব ত্যাগ করিয়া, অমৃতত্ব পাইতে সক্ষম হয় তাহাকে বলে "শক্তি"। এই শক্তি অপূর্ণা অবস্থায় থাকিলেই হয় মিথ্যাজ্ঞানের কারণ।

দ্বৈতজ্ঞানী সংসারীর কাছে জগৎ সত্য; আর অদ্বৈতজ্ঞানী অদ্বিতীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূজ্যপাদ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য মহাত্মার কথায় জগৎ মিথ্যা। তাঁর অনুকরণে কোন কোন সংসারীও মুখে বলেন (!) বুকে নয়, জগৎ মিথ্যা। যে জ্ঞানভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বলেছিলেন—"জগৎ মিথ্যা" তাহা এইরূপ এবং এই জ্ঞানের উদয়ে জগৎ সত্তা হয় বিলুপ্ত, তাই আচার্য্য শঙ্কর জগৎকে বলেছেন **"মিথ্যা"**। ক্রিয়ার অনুভূতিই বস্তুর অনুভূতি, এবং ক্রিয়াভেদেই হয় বস্তুর ভেদজ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহে অগ্নি-জল, সুধা-বিষ প্রভৃতি বস্তুসকল ক্রিয়া করিতে পারে না বিভিন্নরূপে; অতএব তিনি ইহাদিগকে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া পরিগণিত করিবেন কেন? ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পঞ্চ প্রকার অবস্থা (স্থূল স্বরূপ-সূক্ষ্ম-অন্বয়-অর্থবত্ত্ব); যে ব্যক্তি ভূতসকলের স্থূলত্বাদি পঞ্চবিধ অবস্থার প্রতি যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সংযম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তিনি হ'ন ভূতজয়ী অর্থাৎ ভূতসকল তাদৃশ সিদ্ধিপুরুষের হয় বশীভূত, কথান্তরে পৃথিবী পারে না তাঁহাকে

বাধা দিতে, জলে ক্লিন্ন হ'ন না তিনি, অগ্নি তাঁর দেহকে পারে না দগ্ধ করিতে, বায়ু পারে না শুষ্ক করিতে ; অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হয় তাঁহার। পঞ্চভূতের মত পঞ্চভাবেরও অর্থাৎ পঞ্চঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ারও পঞ্চবিধ অবস্থা বর্ণিত হয় শাস্ত্রে যেমন গ্রহণ-স্বরূপ-অস্মিতা-অন্বয়-অর্থবত্ত। যে ব্যক্তি এই অবস্থাপঞ্চকের প্রতি সংযম করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন, মনের ন্যায় (মন যেমন ক্ষণকালের মধ্যে তড়িৎ গতিতে বহুদূরে পারে যেতে) তাঁহার শরীরেরও হয় উত্তমগতি—ত্বরিত-দ্রুতগামী ; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অল্পসময়ে বহুদূর গমন করিতে পারেন ; তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শরীরকে অপেক্ষা না করিয়া বিষয় গ্রহণ করিতে পারেন ; শরীর হইতে বহুদূরে বিদ্যমান পদার্থ সকলও জিতেন্দ্রিয় যোগির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে ; এক কথায় প্রকৃতি পরিচারিকার ন্যায় তাঁহার বশীভূতা বা নির্দ্দেশবর্ত্তিনী হ'ন। তাই ভূতজয়ী ও ভাবজয়ী (=ইন্দ্রিয়জয়ী) বলিতে পারেন অনায়াসেই—অগ্নির দাহিকাশক্তি নাই এবং সুধা-বিষও নহে ভিন্ন পদার্থ। ব্রহ্মজ্ঞানী বা সত্যজ্ঞানী, এক ব্রহ্ম বা সত্য-ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পান না, সুতরাং, তাঁহার কাছে ব্রহ্মছাড়া-জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে রজ্জুতে রজ্জুবোধ বা বিষকে বিষ বলিয়া জানা এবং রজ্জুতে সর্পবোধ বা বিষে সুধাবুদ্ধি—এইরূপ দ্বিবিধ জ্ঞানই ভ্রম—একটী সম্বাদি, অপরটী বিসম্বাদি ভ্রম ; একটী তাত্ত্বিক মিথ্যাবুদ্ধি, অন্যটী প্রাধানিক মিথ্যাবুদ্ধি। ব্রহ্মজ্ঞানী এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখেন না, তাই ব্রহ্মই তাঁহার কাছে বস্তু বা **সৎ**, তদ্ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই ; তদ্ব্যতীত সকলই স্বরূপতঃ অবস্তু—সকলই **মিথ্যা**।

আজকাল অনেকেই প্রবাহরূপে সৃষ্টির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে চান না ; বলেন উহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বচন, তাঁদের এই অযৌক্তিক উক্তি সত্য-সমীচীন নহে। বর্ত্তমানকালে যে সমস্ত সত্য আছে অন্ধকারাচ্ছন্ন, জ্ঞানের উন্নত অবস্থায় তাদের হ'তে পারে বিকাশ—এইরূপ বিশ্বাস রাখাই ভাল। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া অপরিচ্ছিন্ন

তত্ত্বের অনুসন্ধান বা মতবাদ প্রকাশ ধৃষ্টতা মাত্র ; পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির কাছে যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বলে মনে হয়, সর্ব্বজ্ঞ তথা ব্রহ্মজ্ঞ অপরিচ্ছিন্ন পুরুষের কাছে তাহা যুক্তিসঙ্গত। বিজ্ঞানের প্রসার যে পরিমাণে হইবে, অজ্ঞতা সেই পরিমাণে প্রকাশ পাইবে। পুস্তকের প্রথম ভাগ "ব্রাহ্মণ-প্রবেশিকা কথা" য় ২৮ পৃঃ প্রদত্ত শেষ মন্ত্রটী সৃষ্টির পূর্বাভাস ও ক্রমবিকাশের বর্ণনা করে ; পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ "ব্রাহ্মণোপাধি কথায় মন্ত্রটী বিশেষ ব্যাখ্যাত। ইহা ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।৮।৪৮ ; মন্ত্রটীর মর্ম্ম অবলম্বনে দেখা যায়, কালের ধ্বজভূত—কালের মানদণ্ড স্বরূপ যে সূর্য্য-চন্দ্র এবং স্বর্গ-পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ এই ত্রিভুবন বিধাতা পূর্ব্বকল্পে যেমন সৃষ্টি ক'রেছিলেন, আগামী কল্পেও সেই রূপ সৃষ্টি করিবেন। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি কাল হইতেই চলিতেছে, এবং চলিবেও অনন্ত কালের জন্য। **সুষুপ্তিকালে**—সুগাঢ়নিদ্রাবস্থায় বিদ্যমান বস্তু গুলির প্রত্যেক বস্তুগত বিশেষ বিশেষ সত্তা-জ্ঞান বিলীন হইয়া গিয়া যেমন এক অবিশেষ সত্তামাত্রের **জ্ঞান** থাকে অবশিষ্ট, "আছে" এইজ্ঞানেই সমস্ত বস্তুর সামান্য অস্তিত্ব থাকে ভাসমান্—বিশেষ বিশেষ অস্তিত্ব জ্ঞান হয় বিলুপ্ত, বস্তুসকলের নামরূপ থাকিলেও যেমন তাহা জ্ঞান গোচর হয় না তখন—ইহা এই, আমি অমুক, এ আমার ছেলে', এটা আমার বাড়ী ইত্যাদি বস্তু গুলির ইদং-তৎ-পদবাচ্য অর্থ যেমন স্ফুরিত হয় না তখন, উৎপত্তির পূর্ব্বে (অর্থাৎ জন্ম বা প্রাদুর্ভাবনামক বিকার পাইবার অগ্রে) জগতের নাম-রূপ থাকিলেও তাদের স্ফূর্ত্তি হয় না তখন ; স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়া তাহা যে একেবারে থাকে না, তাহা নহে ; নামরূপে ব্যাকৃত জগৎ, ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হবার পূর্ব্বে থাকে **সন্মাত্র**।

জীবের নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থাদ্বয় যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টির অপর ভাব ; নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থারই পরভাব লয় ও সৃষ্টি। নিদ্রা ও জাগরণের স্বরূপ চিন্তা করিলে লয় ও সৃষ্টির স্বরূপ যায় জানা। জীবের বাহ্যকরণ গুলির (=৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়) একেবারে উপরতির নাম অর্থাৎ তাদের পূর্ণ বিশ্রামের নাম নিদ্রা ; যে কালে

ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ন্যায়ে [বিঃ দ্রঃ —**Newton's Third Law of Motion = To every action there is always an equal and contrary reaction** অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই আছে প্রতিক্রিয়া ; সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যথাক্রমে পরস্পর জয়-পরাজয়ই প্রাকৃতিক লীলা।] উপরত হয় অর্থাৎ বিশ্রাম করে, কথান্তরে যে কালে তমোগুণদ্বারা রজঃ ও সত্ত্ব-গুণ হ'য়ে পড়ে অভিভূত, সেই কালের নাম নিদ্রাকাল। আর, জাগরণ কালে জীবের দশটী বাহ্যকরণ ও চারিটী অন্তঃকরণ (মন + বুদ্ধি + চিত্ত + অহঙ্কার) থাকে সজাগ অর্থাৎ ক্রিয়াশীল। উভয় অবস্থাতেই ঠিক থাকে জীবের বাসনা-কামনারূপ সংস্কার ; নিদ্রা হইতে সুপ্তোত্থিত সজ্জন জাগিয়া উঠিয়া, পূর্ব্ব সংস্কার বশে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হয় কার্য্যে। নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রিত হবার পূর্ব্বে যে ভাবে থাকে, জাগরিত হবার পরও সেই ভাবই করে ধারণ, তাহার কোনরূপ অন্যথা হয় না। নিদ্রার পূর্ব্বে যাহা ছিল না ; জাগিয়া উঠিয়া তাহা হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় (প্রলয়কালে) তথাকথিত অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানসংস্কার বিদ্যমান থাকে বলিয়াই জাগ্রতকালে (সৃষ্টিতে) তাহার হয় স্মৃতি ; পূর্ব্বে যাহা কখনও হয় নাই অনুভূত, তাহার স্মৃতি অসম্ভব। সৃষ্টি এবং লয়ও ঠিক এই ব্যাপার-ভিন্ন আর কিছু নহে। কাল ও দেশগত পরত্বাপরত্ব-ব্যতীত সৃষ্টি ও লয়ের সহিত জাগরণ ও নিদ্রার অন্য কোনরূপ নাই পার্থক্য। শাস্ত্র বলেন সুষুপ্তিই দৈনন্দিন বা নিত্যপ্রলয় ; সুষুপ্তিকালে ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যগুলির হয় লয় বা উপরম (cessation)। ধর্ম্মাধর্ম্ম পূর্ব্বসংস্কারসমূহ নিদ্রাকালে কারণাত্মাতে (= সূক্ষ্মভাবে) হইয়া থাকে লীন।

অতএব সিদ্ধান্ত এই—(ক) জগৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি বা জগৎ পরিবর্ত্তনের ছবি। (খ) রাগদ্বেষই ঐ কর্ম্মোৎপত্তির কারণ, রাগ-দ্বেষ ব্যতীত কোন রূপ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। (গ) রাগ-দ্বেষ মিথ্যাজ্ঞানাধীন। (ঘ) পরিচ্ছিন্ন (= অপূর্ণ) শক্তিই মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ। (ঙ) ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের স্বভাবতঃ ভেদবুদ্ধিযুক্ত সাধক মহলের উপাস্য-

মূর্ত্তির প্রতি আস্থা দৃঢ় করার জন্য পুরাণসকল বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে হইয়াছে বিভক্ত। কোন কোন পুরাণ বৈষ্ণবদের, কোন কোন পুরাণ শৈবদের এবং কোন কোন পুরাণ শাক্তদের বিশেষোপযোগী ইত্যাদি। বৈষ্ণবদের উপযোগী পুরাণসকলে বিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম ও সকলের সারাৎসার এবং অপর সকল তাঁহা হইতে সম্ভূত বলা হ'য়েছে। কোন কোন পুরাণে মহাদেব রুদ্রই পরব্রহ্ম এবং তাঁহা হইতে অপর সকলের সৃষ্টি ও সংহার ব্যাখ্যাত। কোন কোন পুরাণে দেবীকেই পরব্রহ্ম বলিয়া, অপর সকল তাঁহা হইতে সম্ভূত বলা হ'য়েছে। ইহা কেবল তত্তৎ উপাসকদের উপাস্য-বিষয়ে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত করিবার জন্যই। ইহাকে বাস্তবিক **মিথ্যাবাক্য**ও বলা যায় না; কারণ বস্তুতঃই শ্রুতির কথায়ঃ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; তিনিই জীবের একমাত্র উপাস্য। সুতরাং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি ইত্যাদি বাস্তবিকই ব্রহ্মের প্রকাশ; অপ্রকাশ নিরাকার পরব্রহ্মোপাসনা সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব; কারণ, সাধারণ জীবের বুদ্ধি নির্ম্মল নহে। সাধারণতঃ সূক্ষ্ম পরমাণু অথবা বিস্তৃত আকাশ পার হইয়া তদতীত পরব্রহ্ম জীবের ধ্যানের বিষয় হইতে পারে না; কোন প্রকার চিন্তা করিতে গেলেই, চিন্তা কোন না কোন প্রকার আকার ধারণ করে। কেবল সমাধি-প্রজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তিই নিরাকার-ধ্যানে সমর্থ। পরমাত্মা বা আত্মা (পুরুষ) সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহাদেরও ধ্যানগম্য হ'ন না। কেবল যাহা কিছু বুদ্ধিগম্য, তৎ সমস্ত হইতেই আত্মা অতীত জানিয়া **জ্ঞানমার্গ-অবলম্বী** যোগিগণ বুদ্ধিগম্য বস্তুজ্ঞান লয় করিয়া, আত্মস্বরূপ অবগত হইবার জন্য, আত্মার প্রকাশের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, তখন সত্য-স্বরূপ আত্মা হ'ন প্রকাশিত।

এক অখণ্ড জ্ঞানই সর্ব্বজীবে সাধারণ ভাবে অবস্থিত, তথাপি অজ্ঞানপ্রভাবে (বা মিথ্যাজ্ঞানে) সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতঃ উহা বিভিন্ন

ভাবে হয় পরিগৃহীত। একমাত্র **বিষ্ণুর পরমপদ** সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাহা হইতে বিভিন্ন স্পন্দনগুলি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া জীবের সংস্কারপুঞ্জে হয় উপস্থিত এবং তৎ সমজাতীয় সংস্কারকে করে উদ্বুদ্ধ। সংস্কার প্রকাশ পায় বাহিরে বিষয় আকারে। চিদানন্দময় ক্ষেত্ররূপ বিষ্ণুর পরমপদ হইতে স্পন্দন ইন্দ্রিয়পথে আসিয়া দর্শকের মনকে করে উদ্বুদ্ধ, এবং মনটী বস্তুর আকারে আকারিত হয়; এইরূপে দর্শক যে পদার্থ দেখে উহা তাহার সংস্কারাঞ্জনরঞ্জিত একটী স্থূল ভৌতিক পদার্থ মাত্র।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই সত্য; উহাতে নিত্যযুক্ততা উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মীস্থিতি। মহাবাক্যচতুষ্টয়ের প্রথম বাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", শ্রুতির কথায়, "সত্যং জ্ঞানমানন্দম্", "যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্" ইত্যাদি কথা চিন্তা করিলে মনে হয় অনাদি জন্মমৃত্যু হইতেছে সংঘটিত ঐ সত্যজ্ঞানের অঙ্কেই। সত্যজ্ঞানের বক্ষেই সবই সঞ্জাত, সংস্থিত এবং সংশোধিত ও সংলুপ্ত! এই অখণ্ড সত্যজ্ঞানসমুদ্রে ভাসমান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বচরাচর; সর্ব্বজীবে প্রতিনিয়ত উপলব্ধ যে সত্যজ্ঞান, উহা সেই স্বপ্রকাশ জ্ঞান; উপদেশ বা অধ্যয়নজন্য অর্জ্জিত জ্ঞান নহে। ইহা সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ সামান্য সহজ (=জন্মের সাথে সাথেই জাত) জ্ঞান, ইহা অখণ্ড নির্বিবশেষ বোধস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান তাই এই জ্ঞানকে বলা যায় **সত্যসখা**; ইহা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান অর্থাৎ এ জ্ঞান ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে; পক্ষান্তরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের জ্ঞান-বিশিষ্ট জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান।

উন্নতবুদ্ধিশালী লোকের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় দুই প্রকার প্রভেদ। তন্মধ্যে একপ্রকার লোকের বুদ্ধি **অন্বয়ী**; তাঁহারা জগতে নানারকম বিসদৃশ বস্তু ও বিসদৃশ কার্য্যের মধ্যে সূক্ষ্মাংশ বিচার করিয়া সাম্য অবধারণ করিতে, এবং ঐ সাম্য দর্শন করিয়া আপাততঃ বিশ্লিষ্ট বস্তু ও-কার্য্যসকলকে জাতি-সংজ্ঞা দ্বারা একরূপে দর্শন করিতে সমর্থ, এবং জাতিসকলের মধ্যেও সমতা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকেও একরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ। আবার অন্যপ্রকার লোকের বুদ্ধি

হয় **ব্যতিরেকী**; ইঁহারা সাধারণ ভাবে উপলক্ষিত সমতার মধ্যে ব্যতিক্রম নিরূপণ করিতে পটু। যাঁহাদের বুদ্ধি ব্যতিরেকী, তাঁহারাই জ্ঞানযোগের অধিকারী; এই সকল পুরুষরা আত্ম-অনাত্মবিবেক-সম্পন্ন; ইঁহারা অনাত্মদেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক দর্শন করেন; ইহাই তাঁদের প্রকৃতি। আর সাধারণ মনুষ্যগণ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি সুশ্রী-সুন্দর, আমি কুশ্রী, আমি রোগী, আমি সুস্থ ইত্যাদি রূপ দেহাত্মবোধ-বিশিষ্ট; কিন্তু এই বিবেকসম্পন্ন পুরুষগণ বিচার করিয়া দেখেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যে এই সাম্যবুদ্ধি, তাহা বাস্তবিক প্রকৃত নহে। আমি এককালে বালক বলিয়া অভিমান করিতাম, কখন যুবা, কখন প্রৌঢ় কখন বৃদ্ধ বলিয়া অভিমান করিয়াছি, অথবা করিতেছি; কিন্তু বাস্তবিক আমার "আমিত্ব" সকল অবস্থাতেই অপরিবর্ত্তিতরূপে রহিয়াছে বিদ্যমান; বালককালে যে "আমি", যুবাকালে, প্রৌঢ়কালে ও বৃদ্ধকালেও সেই "আমি", বালকাদি অবস্থাসকল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই সকল অবস্থার অন্তরালে এবং ইহাদের সংযোজকরূপে "আমি" নিত্যই সমভাবে বিরাজমান। বাস্তবিক "আমি"-টী উক্ত অবস্থা সকলের দ্রষ্টা ও ভোক্তামাত্র,—রোগ, স্বাস্থ্য, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আমার নানাপ্রকার অবস্থার হইয়াছে পরিবর্ত্তন; পাপ, পুণ্য, নানাবিধ কর্ম্ম এবং নানারূপ চিন্তা-স্রোতে "আমি" হইয়াছি পতিত—ইহা সত্য; কিন্তু এই সর্ব্বপ্রকার ভোগ, চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে "আমি" অপরিবর্ত্তিতরূপে এই সকলের অন্তরালে থাকিয়া ইহাদের সংযোজক ও সাক্ষিস্বরূপে মাত্র রহিয়াছি অবস্থিত। অতীতে যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ ক'রেছি, তাহা এক্ষণে আমার কাছে স্বপ্নবৎ বোধ হয়, অপরের সুখদুঃখের কাহিনী যদ্রূপ, আমারও অতীত সুখদুঃখের কাহিনী আমার নিকট প্রায় তদ্রূপই প্রতিভাত হয়; তবে আমাকে এক্ষণে আর তাহা অভিভূত করিতে পারে না। স্বপ্নকালে যে সকল কর্ম্ম কৃত ও সুখদুঃখাদির ভোগ হয়, জাগ্রদাবস্থায় সে সকল আমার সম্বন্ধে বোধ

হয় অলীক। আমার জীবনের অতীতকালের ভোগসকলও তদপেক্ষা অধিকতররূপে আমার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। স্বপ্নকালে ভোগ সকল অনুভব করিলেও যেমন "আমি" ছিলাম তাহাদের মাত্র দ্রষ্টা, এই সকল ভোগ ও কর্ম্মের অন্তরালে থাকিয়া "আমি" যেমন ইহাদের সংযোজক ও দ্রষ্টা মাত্র হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম, তেমন এক্ষণে বিচার দ্বারা জাগ্রদবস্থার অতীত কর্ম্মগুলি সম্বন্ধেও "আমি" তদ্রূপই দ্রষ্টা মাত্র ছিলাম বলিয়া বুঝিতেছি। সুতরাং ইহসংসারের সুখ, দুঃখ, কর্ম্ম, অকর্ম্ম এই সকল আমার সম্বন্ধে স্বপ্নবৎ অলীক। আমার যে বাল্যাদি অবস্থাভেদ, তাহা বাস্তবিক আমার "আমি"ত্বের ভেদক নহে। পরন্তু তাহা দেহেরই অবস্থান্তর। দেহের সমস্তই দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু "আমি" আছি-ঠিক অচল-অটল সত্য; সুতরাং "আমি" এই স্থূলদেহ হইতে পৃথক। আবার, আমার সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাকালে আমার মন ও ইন্দ্রিয় আমাতে হয় লয়, ইহাদের কোন কার্য্যই থাকে না। এবঞ্চ একটা মানসিক বা ঐন্দ্রিয়িক ব্যাপারের পর অপর একটা ব্যাপার আসিতেছে, তৎপর অপর একটী; এইরূপে এই সকল ব্যাপার পরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বদাই। কিন্তু তাহাতেও আমার "আমিত্বে"র ঘটিতেছে না কোন পরিবর্ত্তন। "আমি"-সত্য এই সকল ব্যাপারের অন্তরালে থাকিয়া, ইহাদের বোদ্ধৃস্বরূপ হইয়া আছে। ঐ অবস্থা সকল ঘটিবার সময়"আমি" ইহাদিগকে "আত্ম" বলিয়া অভিমান ক'রেছিলাম, তাহা এক্ষণে স্বপ্নবৎ অলীক ও ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন। পুনরায় দেখি—আমার অভিমানাত্মক বৃত্তি, যন্নিবন্ধন দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের অবস্থাসকলকে আমি "আমার" বলিয়া বোধ করি, তাহা এই সমুদয় অবস্থার অন্তরালে ইহাদের সংযোজক-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তবে কি এই অভিমানাত্মক বৃত্তিটীই আমার স্বরূপ? না, তাহাও নহে। কারণ, এই যে অভিমানাত্মক বৃত্তি (যাহাকে অহমিকা, অস্মিতা ইত্যাদি শব্দে বলা যায়) তাহাও আমার জ্ঞানগম্য—আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে অবস্থিত; অহমিকাও এক প্রকার জ্ঞান। আমার জ্ঞান

যেমন বাহ্যবস্তুকে করে বিষয়, তেমনি এই অভিমানাত্মক বৃত্তিকেও বিষয় করে জ্ঞান; এবং সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাকালে মন ও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় এই অভিমানাত্মক বৃত্তিরও হয় লয়। তখন থাকে **এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান** ও আনন্দময় অবস্থামাত্র। পরন্তু তাহা অভিমানবুদ্ধিশূন্য; পরে জাগ্রত হইলেই অহংবুদ্ধি হয় উদ্বোধিত। সুতরাং বিশুদ্ধজ্ঞান-মাত্র-বৃত্তিই এই অহংবুদ্ধির অন্তরালে থাকিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংযোজকস্বরূপ হইয়া থাকাই সিদ্ধান্ত। এই বিশুদ্ধ অভিমানবৃত্তি-বিরহিত জ্ঞানবৃত্তিই আমাদের সুপরিচিত **নির্ম্মল-শুদ্ধসত্ত্বগুণ**; ইহাকেই সাংখ্যজ্ঞানী বলেন বুদ্ধি অথবা মহত্তত্ত্ব অথবা মুখ্য অন্তঃকরণ-বৃত্তি। অতএব অভিমানাত্মক যে অহংবৃত্তি এবং মনঃইন্দ্রিয়াদি ও দেহ—এই সমস্তই প্রকৃত "আমি" হইতে ভিন্ন।—এইরূপ বিচারনিষ্ঠ ব্যক্তির, সূক্ষ্ম বিচারের পর, ইহাও হয় প্রতিভাত যে, শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র যে বৃত্তি এই সকলের অন্তরালে আছে, তাহারও দ্রষ্টৃরূপে, তাহা হইতে পৃথক ভাবে "আমি" আছে বর্ত্তমান; কারণ জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না; সুতরাং এই জ্ঞানের বোদ্ধৃস্বরূপ যে পুরুষ, তাহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। শুদ্ধ বুদ্ধি, অহংকার, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও দেহ হইতে পৃথক রূপে এই সত্যপুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্য যে বিচার, তাহাকে শাস্ত্র বলেন **আত্মানাত্মবিবেক**। এই বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করাকেই বলে **জ্ঞানযোগ**। যাঁহার অন্তরে এই জ্ঞান বিচার নিয়ত স্থান পেয়েছে, তিনি সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে নিয়তই স্বভাবতঃ উদাসীন; সাংসারিক সুখদুঃখের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক বোধ জন্মিয়াছে। তিনি আত্মার স্বরূপচিন্তনে সদাই অনুরক্ত, এবং তাঁহার বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মদর্শী হওয়ায়, অনাত্মাংশ হইতে আত্মাংশকে পৃথক করিয়া লইতে তিনি সমর্থ। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানযোগের অধিকারী এবং এইরূপ অনাত্ম হইতে আত্মাকে পৃথকরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা—তাহাই **জ্ঞানযোগ**। ইহাদ্বারা জ্ঞানযোগী অবশেষে দ্রষ্টা-পুরুষকে—সত্যকে

পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানাত্মক বৃত্তি হইতেও পৃথকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বিমুক্ত হন সংসারবন্ধন হইতে। পরন্তু **বিষয়ভোগে আসক্ত ব্যক্তির** এইরূপ বিচার আসেই না। সংসারে জাত অবশ্যম্ভাবী দুঃখ সকল কাহারও কাহারও অন্তরে স্বভাবতঃ আনে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য ; এই বিষয়বৈরাগ্যই জ্ঞানযোগের প্রবর্ত্তক। সকল প্রকার বিষয় ভোগের অনিত্যতা দেখিয়া এবং সংসারকে দুঃখময় দেখিয়া, তাহা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিচার স্বভাবতঃ কাহারও কাহারও অন্তরে জাগে। এইরূপ বৈরাগ্যও বিচারযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগেরই উপযোগী। তাঁহার বুদ্ধি ঐ জ্ঞানযোগেরই অনুকূল। এই ভোগায়তন দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, কি নিমিত্ত আমার সুখদুঃখাদি ভোগ হয়, কিরূপে আমি এই দুঃখ হইতে আত্যন্তিক অব্যাহতি পাইতে পারিব, আমার প্রকৃত স্বরূপ কি ? এইরূপ বিচার স্বভাবতঃই ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে হয় উদয়, এবং ইহাই জ্ঞানযোগের অধিকার লক্ষণ। দুঃখের অনুভব বা দর্শন ব্যতিরেকে শাস্ত্রাদি পাঠেও বুদ্ধি মর্জ্জিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরেকবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী হ'তে পারেন। আত্মনিষ্ঠ হওয়াতে তিনি স্বভাবতঃই ভোগ্য বিষয়ে হ'ন বিরক্ত। বস্তুতঃ যে রূপেই হউক, ভোগ্য-বিষয়ের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্যযুক্ত না হ'লে, জ্ঞানযোগের অধিকারী হওয়া যায় না।

পারমার্থিক ক্ষেত্রের এই সত্যসখা নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বচনীয় গোচরাতীত জ্ঞানের সন্ধান করার আগেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বিষয়গোচর জ্ঞানের করিতে হইবে অনুশীলন। পূর্ব্বকথিত অখণ্ড সত্যজ্ঞান সমুদ্রেরই যেন খণ্ড খণ্ড অসংখ্য বীচিতরঙ্গ এই **বিষয় গোচর জ্ঞান**। পারমার্থিক ক্ষেত্রের অখণ্ড জ্ঞান সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ গুলিই বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয় রূপে প্রতিভাত। শাস্ত্রের কথায়, "বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈব পৃথক পৃথক্"। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই বিষয় ; বন্ধন করা অর্থে স্বাদিগণীয় √ষিঞ বা √সি (to bind) + অন্ ক = বিষয়। বিশেষরূপে বন্ধন করে বলিয়াই ইহার নাম বিষয় ; শব্দ-

স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, এই ৫টী বিষয়। পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ইহারা গৃহীত হয়। গোচর-র "গো"-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় এবং ভ্বাদিগণীয় √চর (to walk) ধাতুর অর্থ বিচরণ করা; অতএব, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়-পথে বিচরণ করিয়া প্রকটিত হয় বিষয়াকারে সেই জ্ঞানকেই বলে বিষয়গোচর জ্ঞান; আহার-নিদ্রা-মৈথুন ভয়-আশা-আত্মরক্ষা বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ পায় বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে, তাই এই জ্ঞানকে বলে বিষয়গোচর জ্ঞান এবং উহা সর্ব্বজীব সাধারণ ও জীবত্বের লক্ষণ। অখণ্ড-নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশই বিষয়গোচরজ্ঞান। জীব মাত্রই সাধারণতঃ এই বিষয়গোচর জ্ঞানেই করে বিচরণ।

জীবের জাগ্রৎ অবস্থাটী যেন কতকগুলি বিশিষ্টজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র; দর্শন-শ্রবণ-আহার-বিহার অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি যাহা কিছু জাগ্রৎকালে করা হয়, সে সবই জ্ঞানমাত্র। রূপবিষয়ক জ্ঞান, স্পর্শ-বিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি। একই জ্ঞান কতকগুলি বিশেষণ যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় বিভিন্ন ভাবে; ঐ বিশেষণ অংশ বাদ দিলে, যে অখণ্ড শুদ্ধ জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই জাগ্রৎকালে জ্ঞানের স্বরূপ। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায়; তখন মাত্র অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মনঃ-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার) থাকে ক্রিয়াশীল; সে অবস্থায়ও দর্শনাদি ব্যাপার জাগ্রৎবৎ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং রূপরসাদি বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়াই জ্ঞান পায় প্রকাশ। তারপর সুষুপ্তি-অবস্থা যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের সহিত হয় লয়, কোনরূপ জ্ঞানের প্রকাশ থাকে না বটে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে থাকে তাহার পূর্ণ পূর্ব্বস্মৃতি। এইরূপে দেখা যায় ত্রিবিধ অবস্থাতেই জীব জ্ঞানে অবস্থিত। কিন্তু এই জ্ঞান বিষয়গোচর, অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত বিশিষ্ট হইয়াই এই জ্ঞান পায় প্রকাশ। জ্ঞানের বিশিষ্টভাবে প্রকাশের নামই বিষয়গোচরজ্ঞান। অসংখ্যভাবে, অসংখ্য বিশেষণে ঐ অখণ্ডৈকরসসমুদ্র পরিচ্ছিন্ন হইলেও, উহার শ্রেণীবিভাগে মাত্র পাঁচটী বিভাগ; পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চবিধ জ্ঞানতরঙ্গ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক জীবের অন্তরে পাইতেছে প্রকাশ ও হইতেছে লয়। তবেই,

একটী মহান অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র, তাহাতে অসংখ্য তরঙ্গ, ঐ তরঙ্গগুলি ধরিবার জন্য জীবের আছে ৫টী ইন্দ্রিয়। সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গে যে প্রভেদ জ্ঞান ও বিশিস্ট-জ্ঞানে সেই প্রভেদ। এই অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের পঞ্চবিধ ভেদ বা খণ্ড কিরূপে হয়? সমুদ্রে যতই উঠুক তরঙ্গ, সকলই যেমন হয় জলরূপে প্রতীত, ঠিক তেমন জ্ঞানসমুদ্রের যে পাঁচ প্রকার তরঙ্গ বিভাগ আছে তাহাও নির্ব্বিশেষজ্ঞানের আকারে প্রতীয়মান হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা না হইয়া রূপরসাদি আকারে তাদের উপলব্ধি হয় কেন? তাহার কারণে বলা যায় এইরূপ:—(ক) অগ্রপশ্চাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তারতম্য, (খ) নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপ বিশেষ্য অংশটী থাকে আচ্ছাদিত ও মাত্র তাহার বিশেষণ অংশটীই সর্ব্বজীবে সাধারণ ভাবে হয় প্রতীত; (গ) পরম ও চরম কারণ লীলাময়ের বৈচিত্র্যময় লীলা-কৈবল্য—"একোঽহম্ বহুস্যাম্"। যে অব্যক্ত শক্তিপ্রভাবে ঐ অখণ্ড জ্ঞান খণ্ডীকৃত হ'য়ে খণ্ড-খণ্ড হয়—বিষয়ের আকারে পায় প্রকাশ তাহাকেই শাস্ত্র বলেন অঘটনসংঘটনপটীয়সী মহামায়া। জ্ঞানেরই অন্য নাম চিৎ;—সৎ-এর কোলেই ইহার স্থান। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বিশিন্ট বিষয়গোচরজ্ঞানের মাধ্যমেই অগ্রসর হওয়া যায় পরমাত্মক্ষেত্রের গোচরাতীত সত্যজ্ঞানসমুদ্রে। যত দিন মানব সহজ-অখণ্ড-জ্ঞানের সন্ধান না পায়, ততদিন সে যত বড় বিদ্বান যত বড় তপস্বী, যত বড় যোগী, যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন, সে অজ্ঞান।

সাধনরাজ্যের ভাষায় ব্যবহৃত এই "সত্যপ্রতিষ্ঠা" শব্দটীর উপর কিছু টীকা-টিপ্পনীতে বলিতে হয় যে, যে বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ—স্বয়ংই প্রতিষ্ঠ ও অনাদি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যাহাকে প্রতিষ্ঠা করার দ্বিতীয় আর কেহই নাই, সেই মহাসত্যের প্রতিষ্ঠার আবার কর্ত্তা কে? কিরূপে, ও কোথায় (?) প্রতিষ্ঠা হবে? ইহার উত্তরে, বলা যায় যে, প্রকৃতির বর্ত্তমান বিকৃতিপ্রাপ্তযুগে—ধর্ম্মগ্লানির যুগে সংসার-সাগরে পতিত রাগ-দ্বেষাদিরূপ বায়ুতে বার-বার আহত ও সংশয়চিত্ত নাস্তিক, অর্দ্ধনাস্তিক, অনাস্তিক এবং জননমরণদোলায় দোদুল্যমান নিরালম্ব কাতর মানবকুল

যাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দিশাহারা হইয়া, তাদেরও দিগদর্শনের জন্য দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্ররূপ (compass) সত্যপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মানুষ্ঠান ব্যবস্থা ভারতীয় বৈদিক ঋষিকুলের !! আধিভৌতিক যন্ত্র কম্পাসের ধর্ম্ম অকুল সমুদ্রে দিক্‌নির্ণয় করা ; কারণ ঐ যন্ত্রের চৌম্বকশলাকাটী থাকে নিয়ত উত্তরাভিমুখী ; আর, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের সত্যপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মনুষ্ঠানটীর শক্তিও উত্তরবাহিনীশক্তির সহায়তা ব্যতীত সত্যপ্রতিষ্ঠা নয় সম্ভব ; অন্তঃশক্তি দক্ষিণবাহিনী হইলে অর্থাৎ নিম্নাভিমুখী হইলে তাহার কার্য্যও হয় বিপরীত অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিষ্ঠা।

ইহা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত যে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে তাহার জন্য চাই একটা ভিত্তি-ভূমি, যাহার উপর প্রোথিত থাকিবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদটী। সত্যসখা শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠাভূমি তাঁর গীতার উপদেশে, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাকে (= সত্যকে) পাওয়া যায় সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি জীবকে আমি। এই শুদ্ধ-বোধক্ষেত্রই উপযুক্ত ক্ষেত্র সত্যপ্রতিষ্ঠার। আজকাল এমনই একটা যুগ এসেছে যে, সাধনা বলিলে মনে হয়, কি যেন একটা কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কত ত্যাগ, কত সংযম, কত কঠোরতা করিতে হইবে। ইহা কিন্তু বৈদিক যুগের কথা নহে ; বৈদিক ঋষিরা সরল সত্যবিশ্বাসে এই বিশ্বরূপে করিতেন উপাসনা ; তাহারই ফলে তাঁদের হইত ঋষিত্বলাভ। যাহা দেখিতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন ভগবদ্‌বোধে। যাঁহারা জল দেখিয়া বলিতেন—"আপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ", "আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তানউর্জ্জে দধাতন, মহেরণায় চক্ষষে" ; অগ্নি দেখিয়া বলিতেন—অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ; বায়ুস্পর্শে বলিতেন, "মধুবাতা ঋতায়তে" ; সূর্য্য দেখিয়া বলিতেন, "যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি" ; পুষ্প দেখিয়া বলিতেন, "শ্রীরসি ময়ি রমস্ব" ; ভূমি দেখিয়া বলিতেন, "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। ভূমি সত্য, জল সত্য, বায়ু সত্য, আকাশ সত্য, মন সত্য, প্রাণ সত্য। এই জগৎ মহাসত্য। এই রূপেই জড় পদার্থ হইতে

আরম্ভ করিতে হয় প্রত্যক্ষ জগৎ-দর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা। এই জগৎই 'সত্যের স্বরূপ'। "জগদ্দর্শনমাত্রেণ নচেৎ আত্মস্মৃতির্ভবেৎ। বিশ্বাতিগং পরং ব্রহ্ম কথং গচ্ছেৎ নিরঞ্জনম্"॥ তাই, প্রথমে বৃক্ষলতা, ফল, ফুল, মাটী পাথর চন্দ্র সূর্য্য আকাশ প্রভৃতি পদার্থ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করিতে হয় সত্যজ্ঞান। সাধনার প্রথম সূত্রপাত এই সত্যপ্রতিষ্ঠা (বা বুদ্ধিযোগ) অর্থাৎ সৎ-উপলব্ধি করা---অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হওয়া। বহুদিন বহুজন্ম ধরিয়া জগদ্ভাবে অভ্যস্ত সাধক জগদ্ভাবে পরিচালিত ও জগদ্ভাবেই বিমুগ্ধ; তাই তিনি করুন জগদ্ভোগ কিন্তু জগদীশ্বর স্মরণে অবশ্য করুন; যা কিছু দেখিবেন, যা কিছু করিবেন, যা কিছু ভাবিবেন, সবই যে জগদীশ্বরের বিভিন্ন মূর্ত্তি—এই বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হউন তিনি। এই সুকৌশল কর্ম্মই বুদ্ধিযোগ, ইহাই পথ দেখায় মোক্ষপন্থার। সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত বেদ, সমস্ত দর্শন এই একটী শিক্ষাই দেন।

সত্যপ্রতিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগই বৈদিকযুগের ব্রহ্মর্ষিদের সরল সত্য সাধনা। ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ—"মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" অর্থাৎ মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার অর্থই সত্যপ্রতিষ্ঠা করা; কারণ, জগৎটা মনের ভাব বা স্বয়ং মনঃই জগৎ; সুতরাং জগতের প্রতিপদার্থে সত্যদর্শন করিলে, বস্তুতঃ মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। বুদ্ধিদ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়ার নামই বুদ্ধিযোগ। অন্যান্য তত্ত্বগুলি অপেক্ষা মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব সমধিক সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ। চৈতন্যের সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি ঘটে এই বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বে; সুতরাং বুদ্ধিদ্বারা যত সহজে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায়, তত সহজে যুক্ত হওয়া যায় না প্রাণ, মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা; কারণ ইহারা বুদ্ধি অপেক্ষা স্থূল ও সমধিক জড়ধর্ম্মী। সমধর্ম্ম পদার্থদ্বয়ের মিলন যত সহজে হয়, তত সহজে অসমানধর্ম্ম পদার্থদ্বয়ের মিলন ঘটে না যথা জল-মাটী, জল-বায়ু, ইত্যাদি; কিন্তু, আকাশের সহিত আকাশের মিলনে কোনরূপ প্রযত্নেরই হয় না প্রয়োজন। ঠিক এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা আত্মায় যুক্ত হওয়া অতি সহজ। সূক্ষ্ম হইতেও

সূক্ষ্ম এই আত্মবস্তু ; সুতরাং সত্যরূপী আত্মার সহিত যুক্ত হইতে হ'লে সাধকের যে অংশটী-সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহা দ্বারাই হইতে হইবে যুক্ত। সাধক যদি প্রথমেই মন কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মবস্তুর সাথে যুক্ত হ'তে যান, তবে হ'তে হবে বিফলমনোরথ ; কারণ, মন অতিশয় চঞ্চল ও সঙ্কল্পবিকল্পময় আর আত্মা নির্ব্বিকল্পা। কিন্তু প্রথমতঃ স্থিরবুদ্ধি দ্বারাই আত্মযুক্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রতি প্রাণীর অন্তরে অন্তরে প্রাণময়ী মূর্ত্তিতে আছেন এই সত্যরূপিণী আত্মা ; তাহারই বহির্লক্ষণ—জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণন ক্রিয়া ; নিশ্বাস বলিয়া—সামান্য বায়ু প্রবাহ বলিয়া যাকে উপেক্ষা করা যায়, উহাই যে সত্যের রূপ ! জীবের নাসাপুট হইতে যে প্রাণন ক্রিয়া ঐ উহাই তো সত্যের সত্তা বলিয়া দিতেছে ; ইহা বুঝিলেই তো সত্যপ্রতিষ্ঠা। নাদে সত্য প্রতিষ্ঠা—সনাতন সত্যের কোলেই আশ্রিত যে চিৎক্ষেত্র সেই আদিশক্তিক্ষেত্র, সেখান হইতে আহ্বান আসিতেছে,—সত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, দিবানিশি অশ্রান্ত অপূর্ব্ব অনাহত নাদরূপে মোহাচ্ছন্ন মানবকুলের হৃদয়মধ্যে ; মূঢ় মানব তাহা শুনেও শোনে না ! জগতের কোলাহল ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় সন্ধানে ছুটোছুটীর গোলমালে সে ডাক তাদের কাণে পৌঁছায় না ! সত্যসন্ধানী সাধক সত্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সত্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, যখন তুলিবে সত্যনাদ তখন যেন সে নাদে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল হইয়া উঠে কম্পিত, সবার জড়দেহ যেন সত্যনাদে হইয়া উঠে সঞ্জীবিত, প্রতি পরমাণু যেন সত্যের সম্বেদনে উদ্বুদ্ধ হইয়া দিয়ে উঠে ঝঙ্কার ! সত্যকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া সমবেত সবাই এমনই উচ্চৈঃস্বরে যুগপৎ সমস্বরে নাদ তুলিলে "জয় সত্য ! জয় আত্মা ! জয় মহাসত্য ! জয় পরমাত্মা !" যেন সমগ্র বিশ্ব—স্থাবর-জঙ্গম সে নাদে হ'য়ে উঠে কম্পিত ! এ জগৎ যেন জড়ত্ব ছাড়িয়া ধারণকরে প্রাণময় ভাব। এমনই ভাবে করিতে হইবে সত্যনামকীর্ত্তন যেন সে কীর্ত্তনে ইন্দ্রিয়বৃত্তির মর্ম্মে হয় ভীতির সঞ্চার ! আরও, মিথ্যা শয়তানকুলের প্রাণে ভীতি উৎপাদন করিয়া

নির্ভয়—নিশ্চিন্ত—সাহসী সত্যসন্তান সমবেত কণ্ঠে সত্যনামকীর্ত্তন করিলে সেই ঘনীভূত ধ্বনি একত্র-করিয়া দিবে স্বর্গমর্ত্ত্য !! জয় সত্যনারায়ণ ! সত্যসন্ধানীদের হউন সহায় !

সত্যানুসন্ধানে সত্যপ্রতিষ্ঠা করার সরল সহজ পন্থা যাহা ভারতীয় বৈদিক ঋষিকুল সেই সত্যাতীত কৃতযুগে দেবভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দপূর্ণ বেদবাক্য সমূহ দ্বারা প্রদর্শন ক'রেছেন, তাহা অধুনা অর্ব্বাচীন বৈদেশিক তথাকথিত পণ্ডিত **Dr Friedrich Max Muller** (১৮২৩-১৯০০ খৃঃ) ইংরাজিতে ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ করিয়া তাঁর দেশ-বাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা ক'রেছেন বেদের অসারত্ব ও অনুপাদেয়ত্ব। এই অভিযোগ-কথার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার অনেক উক্তির মধ্যেই মাত্র একটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল **"The Veda contains a great deal of what is childish and foolish"**।

[Chips fron a German workshop vol I p37]

অর্থাৎ বেদের অধিকাংশই বালকোচিত যুক্তিহীন ও মূর্খোচিত হাস্যাস্পদ—এবম্প্রকার মত প্রকাশকরা জ্ঞানবৃদ্ধোচিত হয় নাই; সুধী পাঠকের বিচার্য্য। সর্ব্ববিজ্ঞানের বিজ্ঞান বেদ; সর্ব্ববিজ্ঞানাভিজ্ঞ ঋষিকুল তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সরল ভাষায় সত্যের গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটন ক'রেছেন—যেমন সর্ব্বভূতে ভগবান্ এবং ভগবানে সর্ব্বভূত ইত্যাদি। বেদে অনভিজ্ঞ বাচাল ম্যাক্সমূলার সাহবের মতে, যেহেতু ঋষিরা জড়কেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন তাই তাঁহারা ছিলেন নির্বোধ বালক। ইহার উপযুক্ত উত্তর জানিতে হইলে পাঠককে পড়িতে হইবে এই পুস্তকলেখকের লিখিত অন্য পুস্তক "অবসরে "আমার" খোঁজ" পঃ ৩৯৮-৪১৩-৪২২ যেখানে বিশদভাবে আলোচিত হ'য়েছে আত্মবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যে জড় ও জীবের যোগসূত্র।

বস্তুতঃ বর্ত্তমানের বালকবৈজ্ঞানিকবৃন্দ বৈদিকঋষিদের আত্মবিজ্ঞান সূত্রের বচনগুলির করিতেছেন পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যবিজ্ঞানে শরীরতত্ত্ব ("গর্ভোপনিষৎ"-এ), শব্দতত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব,

তড়িৎ, চৌম্বক, তাপ, আহারনির্ব্বাচন, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সূর্য্য-চন্দ্র-পৃথিবী-সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবেই আলোচিত। বেদোত্তর যুগের কপিলমুনিই প্রথম ঘোষণা করেন—"বস্তুর নাই বিনাশ, বস্তুর নাই উৎপত্তি"—বর্ত্তমানের **"Indestructibility of Matter"**; তাঁর প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শনে স্থান নাই "ঈশ্বরের"। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১২শ শতাব্দিতে বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা উলুকমুনি—পরে সুপরিচিত মহর্ষি কণাদমুনি নামে সর্ব্বপ্রথমই প্রচার করেন বর্ত্তমানের পরমাণুবাদ **(Atomic theory)**। ম্যাক্সমূলার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা-উক্তির—অপবাদের পাশে ঐতিহাসিক সত্যকথার উল্লেখ করিয়া লেখক যেন আর একটী সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে এতদ্বারা প্রয়াস পাইল।

সত্যপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মের উপসংহারে লেখক বলিতে চায়—ক্ষুদ্র-ব্যাপক সব কর্ম্ম তথা ব্রহ্মকর্ম্মের নামান্তরই সত্যপ্রতিষ্ঠা। কর্ম্মের প্রত্যেক অঙ্গ ব্রহ্মময় করিয়া লইলে, তবেই কর্ম্ম হয় সার্থক। গীতার উপদেশে ব্রহ্মবুদ্ধিতে যথা, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং"—রূপে কর্ম্মের করিতে হয় অনুষ্ঠান। কর্ম্মের সর্ব্বাবয়বেই করিতে হয় ব্রহ্ম-সত্তার উপলব্ধি, তবে কর্ম্ম হয় জ্ঞানময়। সুষ্টু ও ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধক ধ্যান করিতে বসিয়া দেখেন—ব্রহ্মই ধ্যান করিতেছেন ব্রহ্মের; পূজা করিতে বসিয়া দেখেন—ব্রহ্মই পূজা করিতেছেন ব্রহ্মের; পূজার উপচাররূপেও বিরাজ করিতেছেন ব্রহ্ম; হোম করিতে বসিয়া দেখেন সাধক—অগ্নিরূপে ব্রহ্ম, হবিরূপে ব্রহ্ম, হোতারূপে ব্রহ্ম. অর্পণরূপেও ব্রহ্ম! কাতর স্বরে "মা"-বলিয়া ডাকিলে বোঝা যায়—শব্দরূপে মা-ব্রহ্ম এবং কাতরতারূপেও মা-ব্রহ্ম! যেন ব্রহ্মই ডাকিতেছেন ব্রহ্মকে। এইরূপে কর্ম্মের সর্ব্বাবয়বে ব্রহ্ম দেখিতে অভ্যাস করা চাই শিক্ষানবিশ সাধকের। কর্ম্ম অজ্ঞান নহে, জ্ঞানের ঘনীভূত বিকাশ মাত্র। যে সত্যের সন্ধানে সাধক ছুটিতেছে, যে সত্য অমৃতের নিদান, সেই সত্যজ্ঞানই কর্ম্মের আকারে সাধকের নিকট পাইতেছে প্রকাশ—ইহা বুঝিতে পারিলেই "ব্রহ্মার্পণং" মন্ত্রটি হইবে সিদ্ধ—মন্ত্রটি হবে চৈতন্যময়; তখন লাভ হবে

"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্‌" অর্থাৎ সাধক।কর্ম্মী উপনীত হইতে পারিবে ব্রহ্মত্বে—জীবত্বের গ্রন্থি হবে ছিন্ন। যতদিন কর্ম্মের মধ্যে এই শাশ্বত সত্যজ্ঞানকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিন কর্ম্ম কেবল পার্থিব ভাবেরই করিবে আনুগত্য ; এবম্প্রকার উপাদেয় উপদেশ ভারতীয় বৈদিক ঋষিকুলের সেবা ব্যতীত ম্যাক্সমূলার সাহেবের ইংরাজি অনুবাদ পাঠে মিলিবে না—ইহা সুনিশ্চিত।

সমাপ্তিতে বলা যায়—ব্যাকরণানুশাসনানুসারে সত্যপ্রতিষ্ঠা শব্দটীর ব্যাসবাক্য (সত্যে প্রতিষ্ঠা) এইরূপ করিলে অর্থাৎ (অধিকরণে) ৭মী তৎপুরুষ সমাস করিলেও শব্দটীর তত্ত্বার্থ দাঁড়ায় একই যথা—সত্যই (=সৎ) পরম—চরম সর্ব্বাধার ও মূলাধার ; এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতিটী পদার্থকে ধ'রে ধ'রে ঐ আধারস্থ করাই সত্যপ্রতিষ্ঠা।

GOD IN EVERYTHING! EVERYTHING IN GOD!!

৭। সত্যানুসন্ধানে দিগ্‌ভ্রম

"পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বহিল বেগের আবেগ"—

এই নৈসর্গিক নিয়মেই স্থির-নিশ্চল-নিশ্চিত সত্যক্ষেত্রে বেগরূপিণী মহামায়ার আবেগে সৃষ্ট্যারম্ভে ইতস্ততঃ বিচরণশীল মোহাচ্ছন্ন সত্যসন্তান সমূহ যেন দিশাহারা বা দিগ্‌ভ্রান্ত; সত্যের অচ্যুত-অনন্ত-গোবিন্দ সমুদ্রের অপরিচ্ছিন্নতা হইতে মাত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহারা নিজদিগকে ভাবিল **"পরিচ্ছিন্ন"**। এইরূপে বিভ্রান্ত অপত্যগুলি তথা সত্যের সন্তানসন্ততি গুলির ধারণা—ভগবানের উর্দ্ধস্থ অপত্যপথ হইতে ঘটিয়াছে তাহাদের অধঃপতন ; ভগবানের শ্রেষ্ঠসন্তান মনুষ্যকুল উত্তরকালে ঐ উর্দ্ধস্থ অপত্যপথ স্থানকেই নির্দ্ধারণ করিল **"উত্তর দিক্‌"** বলিয়া; এবং অধুনা বোধ হয় সেইমত ভুগোলের মানচিত্রের উপরভাগই

"উত্তর-দিক্" বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত; বলা বাহুল্য ইহার বিপরীত অধঃদিক নিম্নদিক দক্ষিণদিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে মনুষ্য ব্যবস্থায় সর্ব্বজনবিদিত দশ-দিক; অদ্ভুত প্রাকৃতিক নিয়মেই চৌম্বক শলাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই থাকে নিয়ত **উত্তরাভিমুখী**—এই নিয়মের সুযোগ লইয়া বুদ্ধিমান মানব নির্ম্মাণ ক'রেছে দিগদর্শনযন্ত্র (compass) যাহার সাহায্যে অকূল সমুদ্রাদিতে করিতে পারা যায় দিঙ্‌নির্ণয়। ব্যবহারিক জগতের দিঙ্‌নির্ণয়ে যেমন নিয়ত-**উত্তরাভিমুখী** চৌম্বকশলাকা করে সহায়তা পথপ্রদর্শনে, তেমন পারমার্থিক পথেও প্রভূত সহায়তা করে ঊর্দ্ধগতি সাধনা অর্থাৎ সত্যাভিমুখী মতিগতি। কিন্তু কুহকিনী ও জগতবিমোহিনী মায়াদেবীর লীলাকৈবল্যবশতঃ তাঁর সন্তানদের দৃষ্টিতে **সত্য** হয় আবৃত-আচ্ছাদিত ও প্রহেলিকাময় এবং তাই তাঁদের হয় বহুলশঃ দিগ্‌ভ্রম। এখানে মহামায়ার পরিচয়ে সংক্ষেপে বলা যায়, যে অনির্ব্বচনীয় মহতী আদ্যাশক্তি মহাসত্যের সত্তার সাথে ওতপ্রোত সংলগ্না হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মসত্তাকে খণ্ড-খণ্ড আকারে বিভাগ করেন, এবং অসীমকে করেন সসীম, নিরঞ্জনকে করেন রঞ্জিত, নির্বিবশেষকে করেন বিশিষ্ট এবং শক্তিকে বিষয়াকারে প্রকটিত করেন অর্থাৎ প্রকটিত হ'ন স্বয়ং বিষয়াকারে. সেই আদ্যাশক্তিই শাস্ত্রকথিত **মহামায়া**; জীবের হৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় যাইতেছে অনন্ত ভাবরাশি! সবই সেই মহামায়ার **অনুভাবমাত্র** (মহিমা); তাঁর কৃপা ব্যতীত কাটে না দিগ্‌ভ্রম সংসারলীলার অভিনয় করাই মহামায়ার উদ্দেশ্য; তাই ইচ্ছাময়ীব ইচ্ছায় তাঁর অভিনয়শালায় আবির্ভাব হো'ল **মোহের**। মোহ না হ'লে এই সংসারখেলা চলে না; চোখ্ না বাঁধিলে কি লুকোচুরি খেলা চলে? সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপটী প্রতিনিয়ত প্রতিমুহূর্ত্তে বোধে প্রকাশ পাইলে (অর্থাৎ "একোঽহম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্! নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই ভাব মানবহৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমান থাকিলে), আর এই বহুত্ব অর্থাৎ সংসারলীলা থাকে না তাঁহার।

আবার, আর একদল আছেন যাঁরা "জগৎ মিথ্যা"- এই বাদের বাদী ; যেহেতু তাঁহারা সত্য (=পরমার্থ) জ্ঞান লাভ করার আগেই মুখে বলেন—অখণ্ড অসীম ব্রহ্ম সমুদ্রে তরঙ্গরূপে ঐ যে সব বিষয়রূপিণী শক্তি প্রতিনিয়ত পাইতেছে প্রকাশ, উহা ভ্রান্তি বা মিথ্যা ! সুতরাং দর্শনের অযোগ্য, ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-অংশ তাঁদের কাছে থাকে অজ্ঞাত। বিশেষ কথা এই যে ইঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিতে গিয়া, কার্য্যতঃ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান জগদীশ্বরকেও ; অথচ স্বয়ং কিন্তু সতত জগৎজ্ঞানেই বিচরণ করিতে হ'ন বাধ্য। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর।

এখানে উল্লেখ থাকে পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্নপ্রায় মূঢ় জীব, অপরিচ্ছিন্ন সত্যের সাথে (=**পরমাত্মার সাথে**) যে তাহার নিকট-নিত্য-সম্পর্ক আছে স্বকীয় অস্মিতারক্ষেত্রে তাহা যায় ভুলে ; দিগ্‌-ভ্রমের ফলে গন্তব্যস্থলে গমনপথে ঘটে দুর্গতি-দুর্দ্দশার ক্লেশ এবং প্রতিনিয়ত ছুটাছুটি করে রূপরসাদি বিষয়ের পিছু, তাহার ফলেও হয় ক্লেশ ; ঐ ক্লেশ হইতে অব্যাহতির আশায় তাহাকে করিতে হয় কর্ম্ম বা পুনঃ পুনঃ বিষয়-ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। কর্ম্মগুলি ক্রমে বিপাক বা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রস্তুত করে ক্লেশের বীজ ; বীজগুলি আবার সূক্ষ্মভাবে গঠন করে কর্ম্মাশয়। ইহাই জীবত্বের লক্ষণ ; একবার যদি এই চতুর্চক্র (ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয়) হইতে জীব সাধনবলে স'রে পড়িতে পারে তবেই জীবত্বের হাত হইতে পায় পরিত্রাণ। এই অনন্ত-অসীম দিঙ্‌মণ্ডলে সদ্যোজাত দিঙ্‌মূঢ় সত্যসন্তানকে সত্য-ন্যায়-ধর্ম্ম পথে দিগদর্শন দ্বারা সহায়তা করাই সমস্ত দর্শনশাস্ত্রাদির লক্ষ্য ; আস্তিক্যবুদ্ধি সম্পন্ন সজ্জন-গণই শাস্ত্রানুমোদিত পথে চলিয়া দিগ্বিজয়ী হ'য়ে কাল-দিকের পরপার যে সত্যক্ষেত্র সেখানে হ'ন উপনীত ; আর, নাস্তিক চার্ব্বাক্‌পন্থীগণ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পান্ কষ্ট ও পূর্ব্বকথিত চতুর্চক্রে খান ঘুরপাক্।

সত্যানুসন্ধানে সত্যবিজ্ঞান

এই প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই যথাসাধ্য ব্যাখ্যাত হ'য়েছে সত্যসংবাদে সত্যের কার্য্যাত্মভাব ও কারণাত্মভাব, সত্যের ব্যাকরণ ও শব্দবিজ্ঞান ইত্যাদি ; সুধী পাঠক একবার উহার সমীপবর্ত্তী হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কথিত কথাগুলি ধৈর্য্যসহকারে করুন পাঠ।

সত্যের একমাত্র ভিত্তি যে সৎ-বস্তু (= সন্মাত্র) তাহা স্থির-নিশ্চল-লঘুতম অস্তিত্ব **(Existence)**; ইহার সূক্ষ্মাতীতসূক্ষ্মাবস্থায় ইহাই সর্ব্ব-কারণ **কারণ** এবং ইহার ক্রমবিস্তারশীল ব্যাপ্তি-অবস্থাই **সূক্ষ্মাবস্থা শক্তি** (= **Energy**) ; আর, ইহার ক্রমঘনীভূতাবস্থা—জমাটবাঁধায় বন্ধনদশাটাই ইহার **স্থূলাবস্থা ভূত** (—**matter**)। একই বস্তু! মাত্র দশার ফের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। সবই সদ্বস্তু, একই সত্য সূত্রে গাঁথা "ভূত" ও "শক্তি" রূপে (**conservation of Energy and Matter**); **according to Law of transference conversion of one to the other** অর্থাৎ স্থানান্তরের গতিবিধির নিয়মে একটীর রূপান্তর—আকার পরিবর্ত্তন ঘটে অপরটীতে।

"ভূত" ও "শক্তি"—এই পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধবিষয়ক সিদ্ধান্ত হ'তে পারে চতুর্বিধ যথা ঃ—(ক) ভূত ও শক্তি পরস্পর ভিন্ন পদার্থ ; শক্তি ভূতের বহিঃস্থিত—ভূতের বাহিরে থাকিয়া ইহা ভূত ও ভৌতিক বস্তুর উপর করে ক্রিয়া ; (খ) শক্তি ভূত-ব্যতিরিক্ত—ভূত বিজাতীয় পদার্থ বটে, কিন্তু ইহা ভূতের অন্তর্ব্বর্ত্তী অর্থাৎ ভূতের অন্তরে থাকিয়া নিয়ামিত করে ভূতকে—ভূতের উপর করে কর্ত্তৃত্ব ; (গ) শক্তি ভূত-ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা ভূতের নৈসর্গিক ধর্ম্ম (**an innate power of matter**); (ঘ) ভূতের ক্রিয়াকারিত্বই (**function**) শক্তি। ভূত ও ভৌতিকশক্তি নহে ভিন্ন পদার্থ ; ভূতই ভৌতিকশক্তি, এবং

ভৌতিকশক্তিই ভূত। ভূত ও ভৌতিকশক্তি, এই দু'টীর স্বরূপ চিন্তা করিলে মনে হয়—ত্রিগুণের স্বরূপদর্শন ব্যতিরেকে "ভূত" ও "শক্তি" পদার্থদ্বয়ের তত্ব যথাযথভাবে নির্ণীত হয় না। "শক্তি"—এই শব্দদ্বারা সাধারণতঃ যৎপদার্থকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা রজোগুণপ্রধান ত্রিগুণ-পরিণাম; এবং তমোগুণপ্রধান ত্রিগুণ-পরিণামই "ভূত"। গুণত্রয় অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, ইহাদের কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। অতএব "ভূত" ও "শক্তি" বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে; মাত্র ব্যবহারিক বুদ্ধিতে ইহারা দেখায় ভিন্নরূপ। শক্তিমান ভূত হইতে শক্তির ভেদ নহে বাস্তব; মায়া বা অনাদি কর্ম্মই শক্তিভেদের কারণ, মায়া স্বরূপতঃ অনন্ত শিবাখ্য পরব্রহ্মের গুণতঃ, শক্তিতঃ ও কার্য্যতঃ আনন্ত্যই করে খ্যাপন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কথায়—পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন সত্তাই শক্তি শব্দের অর্থ, পদার্থ মাত্রই শক্তি, শক্তিই দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি বিবিধ নামে কথিত; শক্তিই আকাশ, দেশ, কাল, মনঃ, বুদ্ধি, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়, প্রাণ। ফল কথা পরিচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন **সত্তাই শক্তি** অথবা সত্যবস্তুই শক্তি।

সত্যের সার্ব্বভৌমত্ব বিচার—শক্তিসাতত্যের পূর্ণরূপ (=The Conservation or Persistence of force) দেখিতে ভারতীয় ঋষিকুল ছিলেন সম্যক্ পারগ। শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবই হয়; শক্তির নাই কখন অত্যন্ত নিবৃত্তি। যাহার যাহা স্বভাব, তাহা কখনও একেবারে যায় না; অর্থাৎ স্বভাব অনপায়ী (নাই অপায় বা বিনাশ যাহার)। ইহার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—(i) শ্বেত বস্ত্রের স্বাভাবিক শ্বেতত্ব নষ্ট হয় রঞ্জন দ্বারা (colouring agent) এবং (ii) বীজের স্বাভাবিকী অঙ্কুরোৎপদিকা শক্তি নষ্ট হয় অগ্নিদ্বারা; এই আশঙ্কা নিরস্ত করিয়া সাংখ্যকার কপিলমুনি বলেছেন—কৃত্রিম রঞ্জন দ্বারা স্বভাবতঃ শ্বেতবস্ত্রের শ্বেতত্ব দূর করা এবং অগ্নিদ্বারা বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ, এই দৃষ্টান্তদ্বারা

শক্তির একেবারে ধ্বংস প্রতিপন্ন হয় না, স্বভাবের একেবারে অভাব হওয়া সপ্রমাণ হয় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষদ্বারা রঞ্জিত শ্বেতবস্ত্রকে পুনর্ব্বার শ্বেত করিতে—স্বভাবে আনিতে পারা যায়; এবং যোগি পতঞ্জলি মুনিরও উপদেশ—যোগিগণের দৃঢ় সংকল্পশক্তি প্রভাবে দগ্ধবীজে পুনর্ব্বার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। অবশ্য বর্ত্তমানের সভ্যজগতবাসীর অপ্রশস্ত মস্তিষ্কে এ সব কথা অলীক বলে মনে হ'তে পারে; কিন্তু প্রাচীন আর্যঋষিরা যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন, তাঁহারা যে রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক (**Chemical and Physical**) এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনের স্বরূপ যথাযথভাবে বিদিত ছিলেন, অপিচ শক্তি-সাতত্যের পূর্ণরূপ যে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মাত্র উদ্ধৃত করা যায় কপিলমুনির উপদেশ যথা—

"ন তু শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যোরভাবো ভবতি।
রজকব্যাপারৈর্যোগিসংকল্পাদিভিশ্চ রক্তপটভৃষ্টবীজয়োঃ পুনঃ
শৌক্ল্যাঙ্কুরশক্ত্যাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ।" [সাং, প্র, ভা]

বীজকে অব্যয় বলা হ'য়েছে শাস্ত্রে বহুলশঃ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহার ব্যাখ্যায় বলা যায়—ভৃষ্ট বা দগ্ধ বীজ আপাতদৃষ্টিতে মৃত অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তিহীন প্রতীয়মান হ'লেও সুধী বিজ্ঞানবিৎ বেশই অনুমান করিতে পারেন যে দগ্ধ ব্যষ্টিবীজটীর ভূতাংশ (**matter**) ও শক্তি-অংশ (**energy**) কোন-না-কোন উপায়েই সমষ্টি ভূতে ও সমষ্টি শক্তিতে মিলিত হইল (বা অদৃশ্য হইল) এবং তাহার এই অবদানে সমষ্টির অঙ্কুরোৎ-পাদন শক্তি, নগণ্য ভাবে হ'লেও, পাইল বৃদ্ধি; এইরূপে ভবিষ্যতে আবশ্যকমত পুনরাবির্ভাবের জন্য কারণসলিলে রহিল লুক্কায়িত। অপ্রমেয়-শান্ত-চিন্মাত্র-নিরাকার মঙ্গলময় পরমাত্মার প্রথমে ইচ্ছা-সত্তার হয় অভিব্যক্তি, তৎপরে ব্যোম-সত্তার, তৎপরে কালসত্তার, তদনন্তর নিয়তিসত্তার হয় অভিব্যক্তি;

ইচ্ছাসত্তাসকলের অনুগতা সত্তার নাম **"মহাসত্তা"**। ইচ্ছাদি সত্তা-সমূহ, অসাধারণী ঐশীশক্তি। ফলতঃ জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃত্ব (প্রবৃত্তি) শক্তি, অকর্তৃত্ব (নিবৃত্তি)-শক্তি ইত্যাদি পরমেশশক্তির নাই সীমা; পরমেশশক্তি সমূহ সামান্যতঃ ইচ্ছাদি নামে পরিগণিত হইলেও, ব্যক্তিগত ভেদানুসারে অগণনীয়।

বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপরি রজঃ ও তমঃ এই গুণ বা শক্তিদ্বয়কৃত বিকারই জগৎ। ইহজগতের ত্রিগুণের পরিণামই পঞ্চভূত। জগতের স্থান-ব্যাপকতার (Extension-র রূপ চিন্তা করিলে, আকাশ ও বায়ু এই ভূতদ্বয়ের রূপই দেখা যায় বা বোঝা যায়; এইরূপে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা পঞ্চভূতেরই অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। "ভূত"-শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে জানা যায়, যাহা "সৎ" অথবা "যাহা জন্মাদি বিকার প্রাপ্ত হয় তাহা ভূত। "পঞ্চভূত", এখানে যে "ভূত" শব্দ তাহা "বিকারাত্মক সৎ" —এই অর্থের বাচক। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে-যে সৎর উপলব্ধি করা যায়, তাহারাই "ভূত"-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ। মানুষের ইন্দ্রিয় পাঁচের অধিক নহে; অতএব ইন্দ্রিয়গম্য "সৎ"কে সামান্যতঃ পাঁচের অধিক বলা যায় না।

মানুষের ইন্দ্রিয় (=জ্ঞানের দ্বার, অবশ্য বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়) পাঁচের অধিক বা ন্যূন নহে; তাহার কারণে বলা যায়, (**Necessity is the mother of invention**) অর্থ বা প্রয়োজনানুসারেই কার্য্য হয় নিষ্পত্তি। যৎকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, কেহ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে বলে "প্রয়োজন"। বিষয়গ্রহণ ইন্দ্রিয়দের প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চবিধ। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ গৃহীত হয়, তদ্দ্বারা স্পর্শ বা অন্য বিষয়ের গ্রহণ হয় না: এইরূপ যদ্দ্বারা স্পর্শ গৃহীত হয়, তদ্দ্বারা শব্দ বা বিষয়ান্তরের গ্রহণ হয় না। অতএব পঞ্চবিষয়ের গ্রহণরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়েব প্রয়োজন। মানুষের যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, ইহাই তাহার কারণ। রূপ-রস-গন্ধ-

স্পর্শ ও শব্দ, ইহারা গন্ধত্বাদি সামান্যের বাচক (**Genus entity**); অতএব শব্দাদি অর্থ বা বিষয়সমূহের প্রত্যেকের বহু অবান্তর ভেদ থাকিলেও, সামান্যতঃ উহারা পঞ্চাধিক নহে; এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপত্বাদির গ্রাহক বলিয়া মানুষের ইন্দ্রিয় সংখ্যাও পাঁচের অধিক নহে। বিষয় সামান্যতঃ পাঁচের অধিক নহে; বিষয়গ্রহণ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, বাহ্যবিষয় গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি তাই মানুষের ইন্দ্রিয় সংখ্যাও প্রয়োজনাভাব বশতঃ পাঁচের অধিক হয় নাই—এই কথায় জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে গন্ধত্ব, রূপত্ব, রসত্ব ইত্যাদি, ইহারা তো বিষয়ত্বের অন্তর্ভূ'ত, বিষয়ত্ব তো ইহাদের ব্যাপকতর সামান্য, অতএব বিষয়ত্বের সংগ্রাহক বলিয়া, ইন্দ্রিয়সংখ্যা এক না হইল কেন? উত্তরে বলা যায়—(ক) বুদ্ধিলক্ষণ, (খ) অধিষ্ঠান, (গ) গতি, (ঘ) আকৃতি ও (ঙ) জাতিগত ভেদ নিবন্ধন, ইন্দ্রিয়ের একত্ব সিদ্ধ না হইয়া, পঞ্চত্বই হয় সিদ্ধ। শব্দের অনুভব ও স্পর্শাদির অনুভব যে, এক নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ৫টী বিষয়ের (ক) বুদ্ধি লক্ষণের পঞ্চ প্রকারত্ব বশতঃ শব্দাদি বিষয়সমূহের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও যে পঞ্চসংখ্যক—তাহা বেশ বোঝা যায়। (খ) অধিষ্ঠানের পঞ্চ প্রকারত্বও পঞ্চ ইন্দ্রিয়সিদ্ধি পক্ষে অন্য সাধন; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠান (seat) পৃথক্ পৃথক: স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান সর্ব্বশরীর, দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান চক্ষুঃ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান নাসিকা, রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান জিহ্বা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান কর্ণ। শরীরের যে স্থান যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, সেই স্থানেই সেই ইন্দ্রিয়ের কাজ হয়, অন্যত্র হয় না। অতএব অধিষ্ঠান-ভেদে ইন্দ্রিয়ের ভেদ। (গ) গতিভেদও ইন্দ্রিয়ভেদের অনুমাপক। (ঘ) আকৃতি বা সংস্থানগত ভেদও ইন্দ্রিয়গণের ভেদসিদ্ধির সাধন; ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বশরীর ব্যাপক, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহা নহে। (ঙ) জাতি (=উৎপত্তি বা জন্ম)-ভেদও ইন্দ্রিয়গণের পঞ্চত্ব সিদ্ধির অন্যতম কারণ। ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূতের কার্য্য, কারণের পঞ্চাবধত্ব নিবন্ধন ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব।

কারণ—পঞ্চভূত, তাদের কার্য্য পঞ্চেন্দ্রিয় :—

পৃথিবী, জল প্রভৃতি **ভূতগণের** যে, গুণবিশেষের অভিব্যক্তির নিয়ম আছে তাহা জানা যায়। বায়ু স্পর্শগুণের ব্যঞ্জক, তেজঃ রূপের ব্যঞ্জক, পৃথিবী গন্ধের ব্যঞ্জক। বায়ু ভিন্ন অন্য কোন ভূত স্পর্শগুণের অভিব্যক্তির হেতু হইতে পারে না, অন্যান্য গুণেরও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম। আবার **ইন্দ্রিয়গণেরও** বিশেষ বিশেষ গুণোপ-লব্ধির নিয়ম আছে। দর্শনেন্দ্রিয় রূপেরই গ্রাহক, শব্দ-স্পর্শাদির গ্রাহক নহে। এমতে অনুমান সিদ্ধ হয় যে পঞ্চভূতের কার্য্যই পঞ্চেন্দ্রিয়।

বুদ্ধিলক্ষণ, অধিষ্ঠান, গতি, আকৃতি ও জাতিগত ভেদবশতঃই এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে ভিন্নরূপে লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সম্বন্ধ জনিত ক্রিয়ার মস্তিষ্কবাসিত উপরাগ (Impressions) সকল যখন প্রজ্ঞা সাহায্যে বিশিস্টরূপে অবধারিত হয়, তখনই বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানের হয় উদয়। তাই ইহা বেশ সুখবোধ্য যে বুদ্ধিলক্ষণ ভেদকে ইন্দ্রিয়ভেদের প্রতীতির কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কেন। সংজ্ঞা বা সংবেদনকারী স্নায়ুসকল (Sensory nerve Fibres) সকল শরীরের সর্ব্বত্র আছে বিদ্যমান ; কিন্তু সকল স্নায়ুদ্বারা যে, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য-নোদনের প্রবাহ বহে না, চাক্ষুস স্নায়ু (Optic nerve) দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদিবিষয়ের গ্রহণ হয় না—তাহার কারণ নির্ণয়ে পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞান (Human Physiology) মূক। স্থূলদৃষ্টিতে অনুভূত না হইলেও, অনুবীক্ষণযন্ত্র নির্ণয় করিতে না পারিলেও, সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু সমূহের মধ্যে আছে যে **পার্থক্য** তাহা বেশ অনুমান করা যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানগত ভেদ সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু, ঐ অধিষ্ঠানগত ভেদের কারণ কি? তাহা নির্ণয়ে বিজ্ঞান মূক (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৭৯ পুস্তক ২য় সংস্করণ Principles of Human Physiology by prof E. H. STarling M. D)। ইহা

অবশ্য বক্তব্য যে যাবৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানগত ভেদের কারণ নির্ণীত না হইবে তাবৎ ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়াতত্ত্বের রহস্য পূর্ণভাবে হইবে না উদ্ঘাটিত।

একটী বস্তু অন্য একটী বস্তু হইতে ভিন্নরূপে দেখায় তাহার কারণ তাদের গুণগত বা ধর্ম্মগত ভেদ। Hydrogen হইতে Oxygen কে ভিন্ন বস্তু বলা হয় তাহার কারণ তাদের প্রাকৃতিক (physical) ও রাসায়নিক (Chemical) ভেদ। **প্রাকৃতিক**শাস্ত্র বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণসমূহেরই বর্ণনা দেন যথা বস্তুর মূর্ত্তত্ব বা আকৃতির (crystalline), উহার আলোক সম্বন্ধাত্মক গুণ বা ধর্ম্মসকল (optical properties) উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity), উহার কাঠিন্য, তান্তবতা (texture), উহার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) প্রভৃতি গুণসমূহের, উহার সৃষ্টিস্থিতিনাশধর্ম্মসমূহের, উহার তাপসম্বন্ধাত্মক গুণসমূহের, উহার তাড়িতগুণ সমূহের এবং উহার রাসায়নিক সম্বন্ধাত্মক গুণসকলেরই দেয় বর্ণনা। এই সকল গুণগত ভেদানুসারে বস্তুসকলের জাতিভেদ করা হয়—একটী দ্রব্যকে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথগ্‌রূপে পরিগণিত করা হয়। কাঠিন্য তান্তবতা তরলতা প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম্ম সমূহের তত্ত্ব চিন্তা করিলে, মনে হয় ইহারা তমোগুণের বা সংসর্গবৃত্তিসক্তি (Aggregative Power)র মাত্রাভেদ (As different degrees of resistence), ইহারা তদরিক্ত পদার্থ নহে। অতএব ইহাদিগকে সংসর্গবৃত্তিশক্তি বা তমোগুণ হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে ধরা যায় না। গুরুত্ব, সংসর্গবৃত্তি-শক্তির বা আকর্ষণের ফল ; অতএব ইহাকে জড়বস্তুনিষ্ঠ স্বতন্ত্র গুণ বলা নহে সঙ্গত।

হিমশিলা সন্তপ্ত হইলে পরিণত হয় জলরূপে, জল সন্তপ্ত হইলে বাষ্পাকার করে ধারণ ; বাষ্প আবার শৈত্যসংযোগে হয় জলাকার, জল যথাপ্রয়োজন শীতল হইলে হয় হিমশিলা। যাঁদের দৃষ্টিতে তাপ (= Heat) গতি-বিশেষ—Motion, তাঁহারা স্বীকার করেন;—**কঠিন (solid) ; তরল (liquid) ও বায়বীয় (gaseous)**—জড়বস্তুর

এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক অবস্থা যে অণুনিষ্ঠ গতির ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রাপেক্ষ তাহা। রসায়নশাস্ত্রের Hydrogen আদি অমিশ্র বা রূঢ় পদার্থসমূহের মধ্যে কতিপয়ের কঠিনাদি ত্রিবিধাবস্থায় অবস্থানযোগ্যতা সুবিদিত। যে সমস্ত ভূত কঠিন-অবস্থায় বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই সম্ভবতঃ যথা-প্রয়োজন তাপসংযোগে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হ'তে পারে। জড়বস্তুসমূহের কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থার তত্ত্ব ভাবিলে মনে হয়—ভেদবৃত্তিক (Separative) ও সংসর্গবৃত্তিক (Aggregative), এই দ্বিবিধ শক্তিই কঠিনাদি অবস্থাত্রয়ের কারণ, এই শক্তিদ্বয়ের মাত্রাভেদে অর্থাৎ ইহাদের তারতম্যানুসারে জড়বস্তুজাতের কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থা হয়। সংসর্গবৃত্তিক শক্তির আধিক্যে বস্তুসকল তরল ও কঠিন অবস্থায় আসে, এবং ভেদবৃত্তিক শক্তির প্রাবল্যে উহারা কঠিনাবস্থা হইতে তরলাবস্থায় ও তরলাবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায় আসে। বিজ্ঞান (Science) বর্ণিত "সংহতি" (Cohesion), সংসক্তি (Adhesion) ও রাসায়নিক সম্বন্ধ (chemical affinity or attraction) ইহারা সংসর্গশক্তিরই রূপভেদ। যে শক্তিদ্বারা সজাতীয় অণু সকল পরস্পর হয় আকৃষ্ট, যে শক্তির প্রবলতাবশতঃ সংঘাতের (Mass) হয় উৎপত্তি, তাহাকে বলে "সংহতি" (Cohesion) শক্তি। যে শক্তি দ্বারা বিজাতীয় অণুসকল আকৃষ্ট হইয়া হয় সম্মিলিত তাহাকে বলে "সংসক্তি" (Adhesion)। কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, সকল অবস্থাতেই ভিন্ন ভিন্ন জড়দ্রব্যের অণুসকল এই শক্তিপ্রভাবে পরস্পর হয় মিলিত। কৈশিক আকর্ষণ (capillary attraction), অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ, ইহারা সংসক্তি শক্তির কার্য্য। যে শক্তিদ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইলে, ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাকে বলে রাসায়নিক আকর্ষণশক্তি। সংসক্তিও (Adhesion) ভিন্ন জাতীয় অণু সকলকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু এতদ্বারা উহাদের

ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তন হয় না। "সংহতি" ও "সংসক্তি"—এই দ্বিবিধ শক্তিদ্বারা বস্তুর গুণগত পরিবর্ত্তন ঘটে না—ইহার তাৎপর্য্য এই—ভৌতিক বা প্রাকৃতিক (=physical) ও রাসায়নিক (Chemical) বিজ্ঞান (Science) বলেন জড় দ্রব্যের এই দ্বিবিধ গুণের কথা (Cohesion and Adhesion). সাধারণ ও অসাধারণ বা মুখ্য ও গৌণ ভেদেও গুণসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। স্থানব্যাপকতা (Extension), স্থানাবরোধকতা (Impenetrability), সান্তরতা (porosity), আকুঞ্চনীয়তা (compressibility), ইত্যাদি ইহারা জড়দ্রব্যের সাধারণ প্রাকৃতিক গুণ। "Cxygen" ও "Hydrogen"—এই দুইটী—বায়বীয় পদার্থের পরস্পর সংযোগে জন্মে জলীয় বাষ্প, এবং এই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া হয় **"জল"**; "Hydrogen" হয় দাহ্য—জ্বলনশীল বায়ু-(Inflammable air), Oxygen দাহক; পরন্তু উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প না-দাহক না-দাহ্য, প্রত্যুত অগ্নি নির্ব্বাপক। Carbon, Oxygen ও Hydrogen—এই তিনটী রূঢ় পদার্থ নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় পরস্পর সংযুক্ত হইলে শর্করা (ɔugar) হয় উৎপন্ন। Carb "—অঙ্গার (charcoal) নামে প্রসিদ্ধ, Oxygen বর্ণহীন, গন্ধহীন বায়বীয় পদার্থ, Hydrogenও তাই, তবে ইহা Oxygen হইতে অনেকতঃ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত। কাষ্ঠ শর্করার মত Carbon, Oxygen ও Hydrogen এই তিনটী রূঢ় পদার্থেরই সাংযৌগিক।

H ও O এই দু'টী পদার্থের সংযোগে জাত জলীয়বাষ্প H ও O হইতে ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত; C, H ও O এই তিনটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে সম্ভূত শর্করা ও কাষ্ঠে কার্ব্বনাদির ধর্ম্ম স্পষ্টও হয় না লক্ষিত; শর্করা ও কাষ্ঠ, এই উভয় পদার্থের ঘটকাবয়ব সমূহ সমান হইলেও, উহারা ধর্ম্মতঃ সম্পূর্ণ বিসদৃশ; যদ্দ্বারা এইরূপ ঘটে তাকে বলে রাসায়নিকশক্তি। দাহক ও দাহ্য পদার্থের সংযোগে এই উভয়ের

বিলক্ষণ অগ্নি-নির্ব্বাপক বস্তুর হয় উদ্ভব ; বর্ণ ও স্বাদহীন পদার্থজাতের সম্মিলনে বর্ণবিশিষ্ট, মধুররসযুক্ত শর্করা জন্মায় ; অপিচ সমান ঘটকাবয়ব সমূহও ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর উৎপাদক হয়।

কাষ্ঠ ও শর্করা, এই দ্বিবিধ পদার্থের ঘটকাবয়ব (C, H, O) সমান হইলেও, ইহাদের ঘটকাবয়ব সমূহের আছে মাত্রাগত ভেদ, এবং এই জন্যই হয় উহাদের গুণগত ভেদ।

জল সমধিক উত্তপ্ত হইলে হয় বাষ্প, বাষ্প শৈত্য সংযোগে পুনর্ব্বার পরিণত হয় জলরূপে—ইহা হয় প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন।

রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক, এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনের স্বরূপ চিন্তা করিলে বোঝা যায় এই উভয়বিধ পরিবর্ত্তনই ত্রিগুণ পরিণাম। যাহাতে যাহা সূক্ষ্মভাবে (= শক্তিরূপে) বিদ্যমান নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না।

জড় বস্তুর সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক (physical) ও রাসায়নিক (chemical) ধর্ম্মগত ভেদের কারণ বর্ত্তমানে "আণবিক গুরুত্ব" (atomic weights) বলিয়াই অবধারণ ক'রেছেন রাসায়নিক মনে হয় ভবিষ্যতে বুঝিবেন তিনি পঞ্চভূতের স্বরূপসম্বন্ধে শাস্ত্রোপদিষ্ট সংসর্গবৃত্তিকশক্তির প্রাবল্য। শাস্ত্র পৃথিবীত্ব ও জলত্ব বলিতে সংসর্গ-বৃত্তিক (Aggregative power) শক্তির প্রবলতাকেই লক্ষ্য ক'রেছেন ; ভেদবৃত্তিক শক্তির (Separative power) প্রবলতাই তেজঃ বা বায়ু পদার্থ। আরও, শাস্ত্রমতে ভূত (matter) ও শক্তি (Energy) এই দুইটী বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। রাসায়নিক ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের যে সকল ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, তাহারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতেরই ধর্ম্ম।

Sir William Crooks (the English physicist born 1832) মহাশয়ের "PROTYLE" নামে এক অবিশেষ পদার্থই Hydrogen প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের কারণ। এই "Protyle"

পদার্থে **গতি** (motion) উৎপন্ন হইলে, তেজঃ বা তড়িৎনামে শক্তি বিশেষের হয় অভিব্যক্তি (force allied to electricity)। তদনন্তর উহার চক্রগতি বা আবর্ত্ত হইতে হাইড্রজেনাদি পরমাণু সমূহের হয় বিকাশ।

"আকাশ হইতে বায়ুর (**গতিই** বায়ুর ধর্ম্ম), বায়ু হইতে তেজের, তেজঃ হইতে জলের, জল হইতে পৃথিবীর হইয়াছে উৎপত্তি"—এই শাস্ত্রকথার সহিত Crookes সাহেবের কথার প্রায় মিল আছে।

শাস্ত্রকথার সুরে সুর মিলিয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও বলেছেন, "But, while we recognise in our last analysis mass and energy as the only fundamental elements of NATURE, let us not forget that there must be a directive faculty by wihch the atoms are arranged and controlled."

[The New Chemistry p.393]

H, O, N, C ইত্যাদি ইহারা যেহেতু ক্রমাভিব্যক্ত পদার্থ, সেহেতু ইহাদিগকে "মূল ভূত" বলা যাইতে পারে না। Mass ও Energy —এই দুইটীই জড়পদার্থসমূহের মূলতত্ত্ব ; পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তিকর্ত্তৃক সন্নিবেশিত ও নিয়ামিত হয় ; ইহারা তাঁহা হইতে নহে স্বতন্ত্র। ইদানীন্তন বহু প্রসিদ্ধ ভূততন্ত্রবিৎ পণ্ডিত একজাতীয় ভূতেরই ও একজাতীয় শক্তিরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন ; ইহাদের মতে এক **সত্ত্বের** উপরই ভেদবৃত্তিক ও সংসর্গবৃত্তিক, এই দ্বিবিধশক্তিকৃত বিবিধ উপরাগই (impressions) বিবিধ গুণ। জলীয় অণুসকল সম্পূর্ণতঃ একজাতীয়।

পরমাণুবাদের উপর রসায়নশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ; পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতর প্রাকৃতিক পর্ব্বসমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করেন না রসায়ন। রসায়নের যাহা প্রয়োজন, পরমাণুবাদ দ্বারা তাহা কথঞ্চিৎ সাধিত হইলেও,

মনুষ্যজীবনের মুখ্য প্রয়োজন এতদ্দ্বারা সংসাধিত হ'তে পারে না। তবে অবশ্য জীর্ণসৌধসংস্কারকালে যেমন অল্পদিনের জন্য মঞ্চগঠন (=মাঁচা বাঁধা) করিতে হয় এবং যাবৎ সংস্কারকর্ম্ম শেষ না হয় তাবৎ যেমন মঞ্চকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষাকরা কর্ত্তব্য, সেই প্রকার যাবৎ সূক্ষ্ম বা ব্যাপক রসায়নশাস্ত্রের উদয় না হইতেছে ("রসো বৈ সঃ"), তাবৎ মঞ্চস্থানীয় যথোক্ত পরমাণুবাদের আছে প্রয়োজন এবং তাবৎ উহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা চাই, সূক্ষ্মরসায়নশাস্ত্রের উদয় হইলেই, অচিরস্থায়ী পরমাণুবাদরূপ মঞ্চ হইবে অপসারিত, তখন আর ইহার এতাদৃশ গুরুত্ব হইবে না উপলব্ধ।

পঞ্চভূত প্রকৃতপ্রস্তাবে ত্রিগুণপরিণাম: স্থানব্যাপকতার (Extension) কথা ভাবিলে, আকাশ ও বায়ু এই ভূতদ্বয়ই আসে বুদ্ধিতে; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পঞ্চভূতেরই হয় উপলব্ধি। বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপরি রজঃ ও তমঃ,এইগুণ বা শক্তিদ্বয়কৃত বিকারই এইজগৎ।

বেদাদি শাস্ত্র দৃশ্যমান্ ক্ষিত্যাদিকেই মূলভূতরূপে অবধারণ করেন নাই; "অগ্নি", 'বায়ু', 'জল', ও "পৃথিবী"—এই শব্দ চতুষ্টয়কে প্রাচীনেরা যে, ইহাদের সাধারণতঃ পরিচিত অর্থে প্রয়োগ করেন নাই, অগ্ন্যাদি শব্দদ্বারা তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গম্য অর্থসমূহের জাতিশঃ গণীকরণ করিয়াছেন, তাহা স্থির।

যাহা কঠিন, তরল, বায়বীয়, আকাশীয় ইত্যাদি সর্ব্বপদার্থের মূর্ত্তিহেতু (=সংহতিকারণ), তৎপদার্থকেই প্রাচীনেরা "ক্ষিতি" পৃথিবী" —এই নামে, যাহা সর্ব্বপদার্থের স্নেহ-হেতু গতি-কারণ, তৎ পদার্থকেই প্রাচীনেরা 'অপ'—এই নামে, ভেদবৃত্তিক শক্তিকে (Energy) 'তেজঃ' এই নামে, স্থানব্যাপকত্বকে "বায়ু"—এই নামে, এবং সর্ব্বভূতযোনি—সর্ব্বভূতাধার শব্দকে (Sound) 'আকাশ'— এই নামে করিয়াছেন লক্ষ্য।

প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থ পাঞ্চভৌতিক, প্রত্যেক প্রাকৃতিক

পদার্থে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের গুণ আছে, কারণ প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থ যে **একটী মূলপদার্থের** বিকার, যে **একটী** মূলপদার্থের স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত, সেই মূলপদার্থে শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চগুণ সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে আছে বিদ্যমান্।

তন্মাত্র—বেদাদি শাস্ত্রে বহুলশঃ কথিত যে তন্মাত্র, সেই পঞ্চ তন্মাত্রের স্বরূপবিচার—তদ্-মাত্রা = "তন্মাত্রা" ; মাত্র = √মা (to measure) + ত্রন্ (ভাববাচ্যে) ; মাত্রা = মাত্র + স্ত্রিয়াং আপ্। এইরূপে নিষ্পন্ন "মাত্রা" শব্দের অর্থ সাকল্য, অবধারণ বা অবিচ্ছেদ। তাহাই, তদতিরিক্ত বা তন্ন্যূন নহে, অথবা তাহাই হইয়াছে মাত্রা যাহাতে, তাহা 'তন্মাত্র'। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে বিকাশ হইয়াছে এক-একটী গুণবিশেষের প্রাদুর্ভাবে আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূত। শব্দাদি পাঁচটী গুণের প্রত্যেকেরই মৃদু, মধ্য, ও তীব্র এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়,শব্দাদি গুণগুলির তারতম্য, ইহাদের বৈশিষ্ট্য, মানুষ অনুভব করে। শব্দাদির বিশিষ্টভাব বাদ দিলে, যাহা থাকে, তাহাই "তন্মাত্র" শব্দে লক্ষিত, অর্থাৎ মৃদু-মধ্য-তীব্রভাব বর্জ্জিত অবিশেষ শব্দাদিই "তন্মাত্র" পদবাচ্য।

রসায়নশাস্ত্রের আদিম অবস্থার অপরসায়নবিদ্যাকে ইংরাজিতে বলে "এ্যাল্‌কেমী" ; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসায়নবিদ্যা (যেমন বৃক্ষলতাদির রস হইতে পারদধাতু প্রস্তুত অথবা তামা লোহাদি হইতে সোণা প্রস্তুত ইত্যাদি) যাদুবিদ্যাপ্রায়ের প্রক্রিয়াগুলিকেই বলে "এ্যাল্‌কেমী"।

খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর **Paracelsus** নামে একজন **Swiss** চিকিৎসক ছিলেন "এ্যালকেমিস্ট্"। খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীয় জার্ম্মান কেমিষ্ট Liebig বলেছেন, **"Alchemy was never anything different from Chemistry"**। আরও, খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান ডাঃ হার্টম্যান ব'লেছেন,—"এ্যাল্‌কেমী" ও কেমিষ্ট্রী উভয়ই প্রাকৃতিক পদার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, আমরা এই নিমিত্ত এই

দুইটাকে এক পদার্থ বলিতে সম্মত আছি, কিন্তু কেমিষ্ট্রী কোন নূতন দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া, কেবল স্থূলভৌতিক পদার্থের সংযোগ-বিভাগের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জড়শক্তির ব্যবহার করেন; "এ্যাল্‌কেমী" ব্যবহার করেন সজীব শক্তির।

যে সকল ব্যবস্থাদ্বারা কোন অব্যক্ত পদার্থ ব্যক্ত অবস্থায় আসে, "এ্যাল্‌কেমী" সেই সকল ব্যবস্থা করিয়া নূতন পদার্থ উৎপাদন করেন। অতএব কেমিষ্ট্রী ও এ্যালকেমী এক সত্যবিজ্ঞানেরই দুই পর্ব্ব—দ্বিবিধ অবস্থা। কেমিষ্ট্রী নিম্নপর্ব্ব, "এ্যাল্‌কেমী" উচ্চপর্ব্ব। পূর্ব্বোক্ত **Paracelsus** সাহেব এ্যালকেমীর স্বরূপ দেখাতে বলেছেন—সূক্ষ্মতত্ত্ব-সকলের ধারণ, উহাদের আকর্ষণ, আত্মার সজীবশক্তিদ্বারা উহাদের বশীকরণ, বিশোধন এবং রূপান্তর বিধানই প্রকৃত "এ্যাল্‌কেমী"।

প্রকৃতির সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়াব্যতীত জৈব রাসায়নিক পরিণাম সংঘটিত হয় না। বীজবিন্দু হইতে ভ্রূণের উৎপত্তি, ভ্রূণের মনুষ্যাকারে পরিণতি, অবোধ ক্ষুদ্র শিশুর জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশিষ্ট মানবত্বপ্রাপ্তি, বিশ্বব্যাপক প্রাণতত্ত্বের ক্রিয়া ব্যতিরেকে অসম্ভবপর। মনুষ্যের পাকাশয়রূপ রসক্রিয়াগৃহে যে সকল বিস্ময়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হয়, নবীন রাসায়নিকবৃন্দ শুধু তাঁদের স্থূল রাসায়নিক সাধনদ্বারা সেই সকল ব্যাপারের অনুকরণ করিতে অসমর্থ। দুগ্ধাদি ভুক্ত দ্রব্য সজীব শারীরযন্ত্রে রক্তাদিতে পরিণত হয়, কত বিস্ময়াবহ কার্য্য সম্পাদন করে, প্রকৃষ্ট উন্নতির অভাব বশতঃ জীবনীশক্তির সংবিধান-ধর্ম্মোপরি প্রভুত্ব নাই বলিয়া নবীন রাসায়নিক দ্বারা ঐ সকল বিচিত্র ব্যাপার সাধিত হয় না। প্রাচীন রাসায়নিকগণ ("এ্যাল্‌কেমিষ্ট") যাহা করিতে পারিতেন, যাহা করা সম্ভব বলিয়াছেন, নবীন রাসায়নিক সমীপে কল্পনার বিজৃম্ভন (pastime sport) জ্ঞানে তাহা উপেক্ষিত হয় বটে, নবীন রাসায়নিক প্রাচীনদিগ হইতে আপনাদিগকে সমধিক উন্নত ও গৌরবান্বিত মনে করেন সত্য, তথাপি

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রাচীন রাসায়নিকগণ কল্পনাতুলিকা দ্বারা রসায়নশাস্ত্রের যাদৃশী উন্নতির চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, রসায়নশাস্ত্রের তাদৃশ কল্পিত উন্নতির ছবি পরমপুরুষার্থ সাধনেচ্ছু মানববৃন্দের চিত্তকে চিরদিন সমভাবে করিবে আকর্ষণ, চিরদিন পরমকমনীয়ের ন্যায় উহা তাঁহাদিগ দ্বারা হইবে নিরীক্ষিত। যোগীর সংকল্পশক্তি দগ্ধবীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তিকে পুনর্ব্বার আবির্ভূত করিতে পারে—এ কথা এদিনে উপহাসাস্পদ বটে! কিন্তু সেকালে ভারতে ঋষিকল্প যোগিগণ শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে যোগবলে ঐ সব অলৌকিক কর্ম্ম সাধনের অধিকারী ছিলেন। আরও, পঞ্চভূতবাদী এ্যাল্‌কেমিষ্টগণ সত্ত্বগুণপ্রধান স্থূল পদার্থকে **mercury,** রাজস বা ক্রিয়াপ্রধান-রজোগুণ-প্রধান স্থূলপদার্থকে **Sulphur** ও তামস বা তমোগুণপ্রধান স্থূলপদার্থকে **Salt** এইরূপ নামে বিভাগ করিতেন।

বৈদিক আর্য্যজাতিও নবীন রাসায়নিকদের সাংযৌগিক সংখ্যা ও গুরুত্বের তত্ত্ব ছিলেন সম্যগ্‌রূপে বিদিত। ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকের ১৩০ সূক্তে উক্ত হইয়াছে—ব্যক্ত জগৎ পঞ্চভূতরূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত যজ্ঞাত্মক পট স্বরূপ। ওতপ্রোতভাবে সন্নিবেশিত (=যথাক্রমে বিন্যস্ত—**arranged**) পাঞ্চভৌতিক পরমাণুসমূহই ব্যক্তজগতের শরীর। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা পৃথিব্যাদি সর্ব্ব পদার্থকে ব'লেছেন ছন্দঃ এবং ব্যক্ত জগৎকে ব'লেছেন পঞ্চভূতের অঙ্কপাশ। ঋগ্বেদের কথা—প্রজাপতি হইতে প্রথমে গায়ত্রী ছন্দের সহিত অগ্নির, তৎপরে উষ্ণিক্ ছন্দের সহিত সবিতার, তৎপরে অনুষ্টুভ্ ছন্দের সহিত সোমের, তদনন্তর বৃহতী ছন্দের সহিত বৃহস্পতি, তদনন্তর বিরাট্ ছন্দের সহিত মিত্রা-বরুণের বিকাশ। বেদের এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, মানবের পরমলাভ হয়। আত্মকল্যাণার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য ছন্দঃ কাহাকে বলে। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী—এই সপ্তছন্দঃ হইতেই বিশ্বজগতের

নানাত্ব। গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দের প্রত্যেকের অষ্টরূপ দেখানো হ'য়েছে যথা, আর্ষ, **দৈব**, আসুর, প্রাজাপত্য যাজুষ, সাম্ন, আর্চ ও ব্রাহ্ম। **দৈবী** গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দের পরস্পর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এই অনুপাত। বৈদিক আর্য্যজাতির পঞ্চভূতবাদকে সাধারণতঃ যেরূপ নিষ্প্রয়োজন মনে করা যায়, ইহা বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাচীনের এ্যাল্‌কেমিস্টগণ (Alchemy) ব্যাপৃত ছিলেন সূক্ষ্ম রসায়নশাস্ত্রের সারতম সামগ্রীর (Essence) অনুশীলনে; আর নবীন রাসায়নিক মুগ্ধ মাত্র স্থূলের উপাদানে (Elements)। সূক্ষের প্রতি নবীনের নজর না থাকায় সত্যবিজ্ঞান ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা!

ন্যায়দর্শন শাস্ত্র বলেন "পরমাণু" সেই বস্তুকে যাহা অকার্য্য বা নিরবয়ব—যাহাকে আর ভাগ করা যায় না; পরমাণু জন্য-বা-কার্য্যদ্রব্য সমূহের অবয়ব, ইহা স্বয়ং নিরবয়ব, ইহা অতীন্দ্রিয় ও নিত্য। সকল দৃশ্যমান বস্তুর সমবায়ি-কারণই পরমাণু। ক্ষিতি-অপ্‌-তেজঃ-মরুৎ এই চতুর্ব্বিধ সাবয়ব বা কার্য্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষতা হয় এই পরমাণুরই জন্য। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনে এই জন্য "পৃথিবীপরমাণু", "জলপরমাণু", "তেজঃ-পরমাণু" ও "বায়ুপরমাণু এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু কল্পিত হইয়াছে।

পাতঞ্জল দর্শনের পরমাণু—শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূল ভূতের বিকাশ হইয়াছে, পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চভূতের পূর্ব্বভাব। প্রকাশ-রূপ সত্ত্ব, ক্রিয়ারূপ রজঃ ও স্থিতিশীলরূপ তমঃ এই গুণত্রয় ছাড়া ভূত সকলের চতুর্থরূপ "অন্বয়" [বিঃ দ্রঃ—অন্বয় = অনু (পশ্চাৎ) + গমনার্থে √ই + অল্‌ ভা], অর্থাৎ ধারাবাহিক ভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া যথারীতি বিন্যাস পূর্ব্বক বিদ্যমানতা। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রে আছে কাঠিন্যাদি-লক্ষণ পৃথিবীত্বাদি জাতি (= সামান্য—(Cmmon factor) বিদ্যমান (Potentially Contained)। পৃথিবীজাতীয় শব্দাদি গন্ধান্ত (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা "পৃথিবী-পয়মাণু"; জলজাতীয় শব্দাদি রস পর্য্যন্ত ৪টী তন্মাত্র দ্বারা 'জল-পরমাণু'; তেজো

জাতীয় শব্দাদি রূপান্ত তিনটী তন্মাত্র দ্বারা তেজঃ-পরমাণু; বায়ুজাতীয় শব্দাদি স্পর্শান্ত দু'টী তন্মাত্র দ্বারা "বায়ু-পরমাণু" এবং আকাশজাতীয় অহঙ্কারসহকৃত শব্দতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হয় "আকাশ-পরমাণু"। পরমাণুগণের উৎপত্তির পর আকাশাদি ক্রমে পঞ্চমহাভূতের হয় উৎপত্তি। 'পৃথিবী পরমাণু'-কে ত্রসরেণুও বলা হয়। এই ত্রসরেণু নিরবয়ব নহে, পঞ্চতন্মাত্র ইহার অবয়ব। সুশ্রুতসংহিতার কথায়—আকাশ সত্ত্বগুণবহুল, বায়ু রজোগুণবহুল, তেজঃ সত্ত্ব-রজঃ বহুল, অপ্ সত্ত্ব-তমোবহুল এবং ক্ষিতি তমোবহুল।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের পরমাণুবাদের সহিত শাস্ত্রোক্ত পরমাণুবাদ তুলিত হইলে অবশ্যই উপলব্ধি হয়—শাস্ত্রোক্ত পরমাণুবাদই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

নবীন রসায়নশাস্ত্রের রূঢ় পদার্থ (Elements) শাস্ত্রের পঞ্চভূতেরই বিকার; অপিচ পঞ্চভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়েরই কার্য্য। পতঞ্জলি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পঞ্চবিধ অবস্থার স্বরূপ দেখাইবার জন্য যাহা বলেছেন তাহা হইতে পঞ্চভূত যে ত্রিগুণের কার্য্য, গুণত্রয়ের তারতম্যেই—যে পঞ্চভূতের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি—তাহা সপ্রমাণ হয়। বৈদিক আর্য্যজাতি যখন রোগনিবারণ এবং অন্যান্য ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবিধ সাংযোগিক বস্তু প্রস্তুত করিতেন, তখন তাঁহারা যে, পঞ্চভূত বলিতে স্থূল মাটী, কাদা, জল, আগুন ইত্যাদিকে বুঝিতেন না, তাঁহাদের যে কিয়ৎপরিমাণে গণিতের জ্ঞান ছিল তাহা স্বীকার্য্য। যোগী পতঞ্জলিদেব বলেছেন, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থার তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে জানিয়া, যিনি ইহাদের উপর যোগশাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মে সংযম করিতে পারেন, তিনি হন ভূতজয়ী, তাঁহার অণিমাদি অষ্টবিভূতির হয় বিকাশ।

যাঁহারা বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের উপদেশানুসারে ভগবানের উপাসনা করেন তাঁহাদিগকে করিতে হয় ভূতশুদ্ধি; ভূতের হাত হইতে এড়াইতে

না পারিলে, ভগবানের সর্ব্বব্যাপক, পরমানন্দময়রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমাত্মার সহিত ভূতবিশেষের সম্বন্ধ-সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুধাবন করাই প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করেন, বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া, তাঁদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয় আনন্দরসে। শাস্ত্রোপদিষ্ট উপাসনা ও বিজ্ঞানের প্রকৃত অনুশীলন বস্তুতঃ এক সামগ্রী।

এই উপাসনা বা বিজ্ঞান (=বিশিষ্টের জ্ঞান) পরিচালিত হয় দর্শনজ্ঞান দ্বারা—সত্যজ্ঞান দ্বারা। সত্যসন্ধানী সন্মাত্রে পৌঁছাবার জন্য উর্দ্ধগতিসাধনা দ্বারা চেষ্টা করেন আপ্রাণ। এই উর্দ্ধগতি সাধনায় তাঁকে সম্মুখীন হ'তে হবে দুই তথাকথিত বিরুদ্ধ শক্তির—সত্য-মিথ্যা বা সৎ-অসৎ। তাই শাস্ত্রের মূল্যবান উপদেশ, "সৎ অসৎ তৎ পরং যৎ—"এই সূত্র ধরিয়া বলা যায়, সৎস্বরূপ পরমাত্মা যখন লীলাবশতঃ ঈষৎ ভাবাপন্ন হইয়া হ'ন প্রকাশিত, তখনই তিনি অসৎ পদবাচ্য হইয়া থাকেন। অসৎ শব্দের অর্থ—সৎবিরোধী কোনও বস্তু-বিশেষ নহে; কারণ, এক সৎ-বস্তু ব্যতীত অপর কোন সত্তাই নাই; অসৎ নামে কোন বস্তু নাই, এখানে অল্পার্থে প্রযুক্ত নঞ্‌টী। সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান এক অখণ্ড সৎ-বস্তু যখন প্রকাশিত হন ঈষৎভাবে বা অল্পভাবে, তখনই তাঁকে বলা হয় অসৎ। নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া পরিচ্ছিন্ন-ভাব সৎ-এর যে একরূপ বিকাশ বা লীলা, তাহাই "অসৎ"-পদবাচ্য। অসৎকে সৎ বলিয়া গ্রহণ বা মনে না করিলে "সৎ"-এর সন্ধান মেলে না; আবার সৎ-এর সন্ধান না পেলে, জীবের নশ্বরতা-বোধ হয় না অপনীত এবং যায় না মৃত্যুভয়।

গীতার কথায় (২-১৬)—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥"

মর্ম্ম—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হইলেও, শীতোষ্ণাদি অসৎ, যেহেতু উৎপত্তিবিনাশশীল। ইহাদের নাই পারমার্থিক অস্তিত্ব অর্থাৎ

কোন তাত্ত্বিকতা ; কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই সত্য বিধায় সত্যের আছে পারমার্থিক সত্তা। অজ্ঞজনের অবিজ্ঞাত হইলেও আত্মার কখনও হয় না অনস্তিত্ব। তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎ উভয়েরই যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি ক'রেছেন। সৎ (=আত্মা বা ব্রহ্ম) সৎই ; ইঁহার কখনও হয় না বিনাশ। কারণ আত্মার সত্তা ত্রিকাল-অবাধিত অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে অবাধিত। অসৎ (= অনন্ত, আত্মা ব্যতীত অন্য সব কিছুই) অসৎই ; অর্থাৎ কখনও হয় না সৎ। কারণ, তাদের নাই কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। ব্রহ্মবস্তুই—সত্যই একমাত্র সৎ ; তিনিই উৎপত্তিবিনাশাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অবিদ্যার দৃষ্টিতে বিকল্পিত হন মাত্র। সর্ব্ববস্তুর সারাৎসার—সারতম সামগ্রী এই সত্য। সর্ব্বোচ্চপরিমাণ সৎ-বস্তু যাঁহাতে, তিনি সত্তম ; সত্তম শব্দের অর্থ সত্যপ্রতিষ্ঠা। যাঁর আস্তিক্যবুদ্ধি কখনও সন্দেহবাত্যায় হয় না আন্দোলিত ; এবং তিনিই সত্তম—সত্যপ্রতিষ্ঠ। একমাত্র আস্তিক্য-বুদ্ধিই সাধনার যথার্থ মূলধন। যাহাকে জল-মাটী-বৃক্ষ-পর্ব্বত-জীব-জন্তু বলিয়া অতি স্থূল জড় পদার্থরূপে দেখা যায়, উহার বাস্তব সত্তা যে বোধ বা প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে এইরূপ উপলব্ধিতে হইতে হইবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ; যাবতীয় স্থূল জ্ঞানকেও বোধময় সত্তায় লইয়া যাওয়াই যেন উদ্দেশ্য হয় সত্যসন্ধানীর। পার্থিব ভাবগুলি বহুদিন হইতে মানুষের চিত্তে যে ঘন স্থূল সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে, সেই সংস্কারের বিলয় সাধন করিতে হইলে, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বোধময় সত্তায় লইয়া আসিতে হয়। সত্যসন্ধানী যখন তাঁহার ঊর্দ্ধগতি সাধনায় সূক্ষ্ম উত্তরবাহিনীশক্তির সাহায্যে স্বীয় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ উভয় চিত্তবৃত্তিদ্বারা অন্তরের বৈষয়িক স্পন্দনগুলিকে মিলাইয়া দিতে থাকেন বিরাট্ ব্রহ্মে তথা মহাপ্রাণময়ী সমষ্টি চৈতন্যে, অর্থাৎ আপনচিত্তস্থ অনাত্মবস্তুর ভাণকে পূর্ণরূপে বিলয় করিয়া বিশুদ্ধ আত্মবোধে আরূঢ় থাকিতে চান যখন, তখন এক একবার সেই বন্ধন-

মুক্তির মধ্যবিন্দু সেই উত্তরক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে করিতে হয় অবতরণ ; সেই উত্তরের সূক্ষ্ম বোধময় অবস্থা হইতে স্থূলে অবতরণের উদ্দেশ্য—যাবতীয় স্থূল জ্ঞানকেও সূক্ষ্ম বোধময় নিরঞ্জন অবস্থায় লইয়া যাওয়ারূপ কর্ম্ম করা। কর্ম্ম না করিলে হয় না দীক্ষা, দীক্ষাব্যতিরেকে পাওয়া যায় না দক্ষিণা এবং দক্ষিণা না পাইলে হয় না শ্রদ্ধা। কর্ম্ম বা ব্রত করিতে করিতে হয় যোগ্যতা বা দীক্ষা, দীক্ষা বা যোগ্যতা হইলে কৃতকর্ম্মের ফল-লাভ (দক্ষিণা লাভ) হয়, কৃতকর্ম্মের ফল পাইলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মাইলে, **সত্যজ্ঞানরূপ** অনন্তব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ—

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥"
(শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ১৯।৩০)

আরও, সত্যজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানময়স্বরূপের সন্ধান পাইতে হইলে বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে হইলে সত্যসন্ধানীকে উপলব্ধি করিতে হইবে—জড়ত্বজ্ঞানই অজ্ঞান ; জড় বলিতে, দৃশ্য বলিতে কিছুই নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিতে পারে না এবং আছে মাত্র একটা জড়ত্বপ্রতীতি। আর চৈতন্যমাত্র উপলব্ধির নামই সত্যজ্ঞান।

এই সত্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে শরণ লইতে হইবে সদাখ্য প্রাণের। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে প্রদত্ত "সত্যাদি শব্দসমূহের শব্দ-বিজ্ঞান"-শীর্ষক অণুচ্ছেদটী স্মর্ত্তব্য আবার এখানে। পশ্চাৎ চিন্তনীয় যে, এক ভাব-বা-সত্তাই পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে যথাক্রমে কথিত শক্তি ও কার্য্য এই নামে ; কার্য্যের পূর্ব্বভাব শক্তি, এবং শক্তিরই অপরভাব কার্য্য। **জলবিম্ব** মিশিয়া যায় জলে এবং **নদী** নদীপতিকে প্রাপ্ত হইয়া নদীনাম-নদীরূপ করে ত্যাগ ও বিদ্যমান থাকে নদীপতি হইতে অভিন্ন ভাবে! এতদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে গতির লক্ষ্যই স্থিতি,

গতিমাত্রই যেন ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই হয় প্রবর্ত্তিত। কেবল তাহাই নহে, গত্যর্থক ধাতুসকল জ্ঞানার্থকও হয়; তাই ব্যাকরণশাস্ত্র বোধহয় বাধ্য হইয়াই বলেন যে, গত্যর্থক ধাতুসকল জ্ঞানার্থক ও প্রাপ্ত্যর্থক। যাই হোক, ঈপ্সিততমের সমাগম যে কেবল জ্ঞানসাধ্য—সত্যজ্ঞানসাধ্য তাহা নিশ্চিত। ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্য কথান্তরে আপন-অভাবমোচনের জন্যই হয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থিত বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ চঞ্চলতা। স্বভাব-বা-স্বরূপচ্যুতিই তথাকথিত "অভাব"; স্বভাব-বা-সদ্ভাব স্বপদের অন্যথাভাবের নাম 'বিপদ'। জীবের স্বভাব—স্বপদ তথা সম্পদ্ই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ—ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ। চিদচিদ্ভাব জীবের বিকৃতভাব। সদ্ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ণ হইবার জন্যই জীবের চঞ্চলতারূপ চিদ্ভাব! পূর্ণসনাতনীর সন্তান ত্রিতাপহারিণী বিশ্বজননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত। উদ্দেশ্য যে দিন সিদ্ধ হইবে, অভাব যে দিন পূর্ণ হইবে, গন্তব্যস্থান যে দিন প্রাপ্ত হইবে, জননীর অঙ্কচ্যুত, স্বপদভ্রষ্ট সন্তান যে দিন পাইবে আবার মা'র কোল, জীবের গতি সেইদিন হইবে স্থগিত, সেই দিন বিদূরিত হইবে ইহার চঞ্চলতা, পরিণামস্রোত নিরুদ্ধ হইবে সেই দিন—সেই দিন।

পূর্ণানন্দের দিন! ওঁ সচ্চিদানন্দস্বরূপ !!

৯। সত্যানুসন্ধানে সত্যবান্

মুণ্ডকোপনিষৎ-এর উপদেশ—"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" অর্থাৎ যিনি সত্যবান্—সত্যাশ্রয়ী, তাঁহারই জয়লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি; মিথ্যাবাদীর জয় হয় না কদাপি। আরও, "সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে

সর্ব্বপ্রতিষ্ঠিতম্" অর্থাৎ সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা, প্রামাণিক ব্যবহারজাত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সচ্চিদানন্দময় আত্মাই জীবের ঈপ্সিততম; অনন্তজীবন অর্থাৎ অখণ্ডস্থিতি, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান এবং অপার আনন্দ ছাড়া জীব আর কিছু চায় না। ইহা লাভের উপায়ঃ—(১) সর্ব্বদা সত্যকথন, (২) নিত্য তপশ্চরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন; শ্রুতির উপদেশে ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতাই পরমতপঃ, চান্দ্রায়ণাদি নহে। (৩) সম্যগ্‌জ্ঞান—স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার পদার্থ-তত্ত্বের অবধারণ। (৪) অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য।

পরিবর্ত্তনশীল পদার্থেরও বস্তুতত্ত্ব বা সত্তার (**Principle of Continuity**) ধ্বংস হয় না কদাচ; সূক্ষ্মদর্শীর নিকটে অতীত ও অনাগতও বস্তুতঃ বর্ত্তমান। পরিবর্ত্তনশীল জগতের স্বরূপ—বিশুদ্ধসত্ত্বের একপাশে রাগাত্মক রজঃ (**Attractive force**) অপরপাশে দ্বেষাত্মক তমঃ (**Repulsive force**)। অতএব আছেন সত্যপদার্থ, জগৎ প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অপরিচ্ছিন্নভাবে; অব্যভি-চারিণী সত্তা (**Unconditioned, Absolute Reality**) মূলে না থাকিলে, পরিচ্ছিন্ন ভাব থাকিতে পারে না, অপরিচ্ছিন্নভাব মূলে না থাকিলে জগতের প্রবাহনিত্যতা (**Principle of Continuity**) সিদ্ধ হয় না, তাহা হইলে জাত্যন্তর পরিণামবাদ (**Evolution theory**) হইয়া পড়ে অসিদ্ধ এবং তাহা হইলে অঙ্গীকার করিতে হয় অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি। জগতে অপরিণামী, অব্যভিচারী বা সত্যপদার্থ যে আছেন তাহা নিশ্চিত।

রাগদ্বেষবশবর্ত্তী মানব সেই সত্যপদার্থের সাক্ষাতলাভে সমর্থ কি না ইহাই বিচার্য্য—ঘরের ভিতরের মানুষ **জানালা দিয়া** বাহিরের বস্তুসব নিরীক্ষণে নিরত থাকিলে যেমন ঘরের ভিতরের দ্রব্যসম্ভার তখন পায় না দেখিতে[বিঃ দ্রঃ—জানালা = ইন্দ্রিয় স্থানী] এবং আরও আসন্ন-বা-সঙ্কীর্ণচেতন অথবা অদূরদর্শী মানুষ যেমন আগামীকল্য

অর্থাৎ নিকট ভবিষ্যতে, কিংবা লোকালোক (=লোক+অলোক) সম্বন্ধে কিছু জানে না; তেমন রাগদ্বেষবশবর্ত্তী পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসমান মানুষও সত্যসন্দর্শন করিতে হয় না সমর্থ। রাগদ্বেষবর্ত্তী মানুষ আপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম। তাহার নিকট সৎ যে অসৎ-রূপে এবং অসৎ যে সৎ-রূপে প্রতীয়মান হইবে—তাহাও সম্ভব।

যে পদার্থের প্রতি প্রাকৃতিক নিয়মে যাহার রাগ (**Attraction**) আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অসৎ হইলেও, রাগদ্বেষবশগ ব্যক্তি তথাপি তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে, এবং যে পদার্থ প্রকৃত সৎ, স্বভাবের প্রেরণায় যদি তাঁহার (সেই সৎ-র) প্রতি থাকে দ্বেষ, তাহ'লে সেই রাগ-দ্বেষবশগ ব্যক্তি কদাচ তাঁহাকে সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। যিনি সত্যবান্, তাঁহারই কর্ম্মসিদ্ধি বা জয়লাভ হয়। এইরূপে সত্যের লক্ষণাদি বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র সত্য পদার্থ সেই অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই, তদ্ভিন্ন সকলই ব্যভিচারী—সকলই মিথ্যা। কিন্তু তাহা হ'লেও এখানে আলোচ্য "সত্যবান্" শব্দটী যে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে না—তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়। পাতঞ্জল সূত্র—

"অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ"

ইহার সারমর্ম্ম—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ (প্রত্যক্ষ-অনুমান-আপ্তোপদেশ) দ্বারা যে বিষয় যেরূপে মনিত, বিদিত, প্রতিপন্ন বা অবগত (**known, understood or ascertained**) হইবে, পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ (=পরকে তাহা বুঝাইবার জন্য) উচ্চারিতবাক্ যদি অবিকল তদনুরূপ হয়, তাহা যদি বঞ্চিতা—প্রতারণাক্ষমা (= **Deceptive**) ভ্রান্তা (ভ্রমপ্রমাদপরিকল্পিতা—**mistaken**, বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা (=অবোধ্যা (**Not to be understood—unintelligible—above or past comprehension**)—না হয়, তাহা যদি

সর্ব্বভূতোপকারার্থ প্রবৃত্তা (**Pronounced or uttered for the purpose of doing good to every being)** হয়, ভূতোপঘাতপরা (কোন ভূতের অনিষ্টোৎপাদিকা—**capable of inflicting injury to any being**) না হয়, তবেই তদ্বাক্যকে বলা হয় "**সত্য**"। মন দ্বারা যথাযথরূপে বস্তুতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ যথা-মত বাগুচ্চারণের নাম **সত্যভাষণ**। যথাদৃষ্ট, যথানুমিত ও যথাশ্রুত এই শব্দত্রয় দ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধ, অনুমানপ্রমাণ-লব্ধ ও শব্দপ্রমাণলব্ধ এই ত্রিবিধ-প্রমাণ-প্রমিত অনুভবকে লক্ষ্য করা হ'য়েছে। মনুষ্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয়দ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, অপরকে তাহা জানাইবার জন্য বৈখরীশব্দ ব্যবহার করে, পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থই বিশ্বনিয়ন্তা প্রদান করিয়াছেন বাক্‌শক্তি।

মন যাহা করে উপলব্ধি, শব্দ দ্বারা তাহাই হয় অভিব্যক্ত। মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বলিতে ক্ষমবান্ নহেন কোন প্রেক্ষাবান্—বুদ্ধিমান্ সজ্জন। মন, বাক্ বা উচ্চারিত শব্দের পূর্ব্বভাব বা কারণ। যদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভগবান্ যে শক্তি দিযাছেন, সেইশক্তিকে ঠিক তদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ ব্যবহার করাই ধর্ম্ম। স্বীয় ও পরকীয় উপকারার্থ আমরা পাইযাছি **বাক্‌শক্তি**; মনুষ্য মনু-বা-মননশক্তিবিশিষ্ট (= হিতাহিত-বিবেকক্ষম), তাই বিশ্বপিতা মানবের বাগিন্দ্রিয়কে অধিকতর শক্তি দিয়াছেন। মানুষ স্ফুটতর বাক্‌শক্তি দ্বারা আপনার ও পরের উপকার করিবে, মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার ইহাই অভিপ্রায়। বেদব্যাসের উপদেশ—যে বাক্ প্রযুক্ত হয় পরপ্রতারণার্থ, যে বাক্ ভ্রান্তিজ, যে বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ হয় না (= যাহা অপরের অবোধ্য) এবং যাহা সর্ব্বভূতের উপকারার্থ উচ্চারিত না হয়, তাহা নহে **সত্যবাক্**। যুধিষ্ঠিরের বাক্যটী যথা, "সত্যং হতোঽশ্বত্থামেতি" অর্থাৎ "অশ্বত্থামা নামক হস্তী হত হইয়াছে সত্য"; এতদ্বাক্য দ্বারা দ্রোণাচার্য্য হইয়াছিলেন বঞ্চিত; যুধিষ্ঠিরের স্ববোধ—হস্তিহননরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণলব্ধ অনুভব দ্রোণা-

চার্য্যের হৃদয়ে যথাযথভাবে হয় নাই সংক্রান্ত। দ্রোণাচার্য্য ইহা দ্বারা স্বীয়পুত্র অশ্বত্থামা 'নিহত—এইরূপ বুঝিয়াছিলেন'। অতএব ইহা হয় নাই **সত্যবাক্**, পরন্তু উহা হইয়াছিল বঞ্চিতা বাক্।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয়দ্বারা যাহা হয় অনুভূত, অন্যকে তাহা জানাইবার জন্য বাগ্‌ব্যবহার। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণত্রয় দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থের অবধারণ করণকালে যদি কোনরূপ ভ্রান্তি না হয়, জ্ঞেয়পদার্থ-অবধারণকার্য্য যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় এবং স্ববোধ বা স্বীয় অনুভূতি অন্যত্র সংক্রমণ করিবার সময় শক্তি-বৈকল্য কিংবা অসরলতা (**Insincerity**) নিবন্ধন, বাক্য যদি শুদ্ধরূপে উচ্চারিত না হয়, তবে তাহাকে ভ্রান্তিজবাক্য বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। অতএব বিবক্ষাসময়ে, বা জ্ঞেয়পদার্থাবধারণ সময়ে, ভ্রান্তি এই দুই সময়েই হইতে পারে।

যে বাক্যের অর্থপরিগ্রহ হয় না, শ্রোতা যে বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাও নহে সত্যবাক্য, তাহাও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক। আর্য্যগণের নিকট ম্লেচ্ছভাষা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা। আবার, সত্যবাক্যের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, তল্লক্ষণবিশিষ্ট বাক্যও যদি পরাপকার-ফলক হয় (=অন্যের অনিষ্টজনক), পরোপকারার্থ প্রযুক্ত না হইয়া, যদি তাহা কাহার অনিষ্ট-উৎপাদনার্থ প্রযুক্ত হয়, তবে তাহাও নহে সত্য, তাদৃশ সত্যাভাসবান্ সত্যব্রতপালনের ফললাভে হইবেন বঞ্চিত।

সত্যপরায়ণব্যক্তি যাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন 'তুমি ধার্ম্মিক হও" —বলিয়া, সে ব্যক্তি নিতান্ত পাপী পাষণ্ড হ'লেও, হইবে নিশ্চয়ই ধার্ম্মিক। সত্যবানের বাক্ কদাচ হয় না নিষ্ফল। যিনি সার্ব্বভৌম রূপে সত্যপালন করেন, তাঁহার বাক্ যে অমোঘ হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য="সত্যেনানৃতত্যাগেন—মৃষাবদনত্যাগেন" ;

অর্থাৎ অনৃত বা মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করিয়া সত্যময় আত্মা লাভ হয়। এই দুই স্থলে সত্যের যে লক্ষণ দেয়া হইয়াছে, মনে হয়, সত্যশব্দটীকে এ স্থলে লইতে হইবে তল্লক্ষণযুক্ত পদার্থের বাচকরূপেই। অতএব, এ স্থলে সত্যশব্দের লক্ষ্য পদার্থ **সত্যভাষণ।**

এখন সত্যবান হইতে হইলে সত্যব্রত তথা সত্যনারায়ণব্রত পালনের যোগ্যতা লাভ করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। ঐ যোগ্যতা অর্জ্জনে অভ্যাসী সত্যসিন্ধানীর জানা চাই—(i) দুর্লভ মানব-জীবনের কী লক্ষ্য তাহা অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে যাঁহার, (ii) সত্যময় আত্মাই মানবের দ্রষ্টব্য এই উপদেশ ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যাঁহার, (iii) যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইবে—যাবৎ হৃদয় না হইবে রাগ-দ্বেষশূন্য—যাবৎ স্থূল-সূক্ষ্ম পদার্থতত্ত্ব অভ্রান্তরূপে অবধারিত না হইবে—যাবৎ সর্ব্বভূতে আত্মবৎ প্রীতি দৃঢ় না হইবে—যাবৎ হৃদয়ে না হইবে বিশ্বজনীন প্রেমের উদয়, তাবৎ লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না অথবা ঘটিবে না সত্যস্বরূপসাক্ষাৎ তাবৎ জন্ম-জরাদি-দুঃখ সঙ্কুল ভীমভবার্ণবে পুনঃ পুনঃ হইতে হইবে নিমজ্জিত; এইরূপই যিনিই বুঝিয়াছেন তিনিই সত্যব্রত তথা সত্যনারায়ণ ব্রত উদ্‌যাপনের যোগ্য।

উপসংহার ঃ—শাস্ত্রোপদেশ, ঋষি, আর্য্য, ম্লেচ্ছ সকলেই বলেন—প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বিশ্বাস করা অনুচিত; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সত্যজ্ঞানের মানদণ্ডই প্রমাণ, প্রমাণই প্রমা বা প্রকৃতজ্ঞানের তথা সত্যজ্ঞানের কারণ। প্রমাণ বা সত্যজ্ঞানের মানদণ্ড লইয়া পাশ্চাত্য যাহাকে প্রমাণ বা অভ্রান্ত জ্ঞানের করণ বলিয়া স্থির ক'রেছেন তাহা শাস্ত্রানুসারে প্রমাণ বটে, কিন্তু প্রমা বা সত্যজ্ঞানের তাহা স্থির-পরিমাপক বা অব্যভিচারি-মানদণ্ড নহে। দেশ-কালের আবরণে যে জ্ঞান আবৃত হয় না, দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে যে জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয় না, দেশ-কালের ভ্রূভঙ্গে যে জ্ঞান ভীত ও চঞ্চল হয় না, যে জ্ঞানের

নাই হ্রাস-বৃদ্ধি, যে জ্ঞান সদা-স্থির অর্থাৎ অব্যভিচারী, তাহারই নাম **সত্যজ্ঞান।** সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকৃত-ভাববিশেষ হইতে চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি; **ইন্দ্রিয়,** প্রকাশক্রিয়া ও স্থিতিশীল-সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সত্ত্বগুণপ্রধান পরিণাম এবং **বিষয়,** ইহাদের তমোগুণপ্রধান পরিণাম। ইন্দ্রিয় সদা চঞ্চল, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি আছে, দেশকালের আবরণে ইহা আবৃত এবং দেশকালের পরিবর্ত্তনে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাই শাস্ত্র বলেন—পরিচ্ছিন্ন ঐন্দ্রিয়িক অনুভব তথা প্রত্যক্ষ কখন হ'তে পারে না সত্য-বা-অব্যভিচারি জ্ঞানের স্থির মানদণ্ড।

যিনি ত্রিকালদর্শী—যাঁহার কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালও বর্ত্তমানবৎ, দেশ ও কাল যাঁহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে পারে না অবরোধ করিতে, যাঁহার হৃদয়ে বস্তুর স্থূল সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থাদ্বয় সদা প্রতিভাত, প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞান তাঁহার হইতে পারে না, তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। অতএব, যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, আপ্তোপদেশই অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ—এ কথা যদি তাঁহারা করিতেন বিশ্বাস, তাহলে শাস্ত্র আপ্তবাক্যকে কেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব'লেছেন, তাহা তাঁহাদের হইত না দুর্ব্বোধ্য! আপ্তোপদেশই শাস্ত্র মতে অভ্রান্ত জ্ঞানের একমাত্র করণ, আপ্তবাক্যই প্রমা তথা সত্যজ্ঞানের স্থির পরিমাপক যন্ত্র। দেশকালের পরিবর্ত্তনে হয় না পরিবর্ত্তিত আপ্তবাক্য; রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী নহে বলিয়া আপ্তবাক্য কখনও বলে না মিথ্যা, দেশকাল ইহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না বলিয়া ইহাই অব্যভিচারি জ্ঞানের অদ্বিতীয় করণ। **আপ্তবাক্যই** শাস্ত্রমতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আর ইহার পাশেই পাশ্চাত্য মতে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্যের প্রধান প্রমাণ, তাই পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয় প্রমিত হয় না পাশ্চাত্য তাহা বিশ্বাস করিতে

পারেন না! পাশ্চাত্যের যা লক্ষ্য বা জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও তদুপজীবক অনুমান-প্রমাণ-ব্যতীত প্রমাণান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও নাই কোন ক্ষতি; কিন্তু, অবিকৃত আর্য্যসন্তান-দিগের আছে সম্পূর্ণ ক্ষতি। কারণ, তাঁহারা জানেন বর্ত্তমান জীবনই আদ্য ও অন্ত্য জীবন নহে এবং সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্যভোগ বা অবাধে ঐন্দ্রিয়িকতৃষা চরিতার্থ করাই পরমপুরুষার্থ নহে।

পারমার্থিক সত্তার তুলনায় ব্যবহারিক বা জাগতিক সত্তা, মিথ্যা হইলেও সংসারের প্রবাহ-নিত্যতাবশতঃ ইহার সত্যত্ব সিদ্ধ। যেরূপ যাহা নিশ্চিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি কখনও তদ্রূপের ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলতম ভৌতিক পরিণাম পর্য্যন্ত যতরকম পরিণাম-পর্ব্ব আছে, সূক্ষ্মদর্শী জানেন তৎসমুদয়ের ধর্ম্ম, অবস্থা ও লক্ষণ; কথান্তরে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে যে-যে পরিণাম-পর্ব্ব যে-যে রূপে হয় নিশ্চিত, অন্যের কাছে না হইলেও সূক্ষ্মদর্শীর কাছে, তৎ-তদ্রূপ পরিণাম অব্যভিচারী, সুতরাং **সত্য**। ইন্দ্রিয়ের গাঢ় পরিচ্ছিন্নাবস্থায় প্রত্যক্ষও হয় নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তির প্রসারতার সহিত প্রত্যক্ষও হয় প্রসারিত। ইন্দ্রিয়ের পরিচ্ছিন্নতার মাত্রানুসারে প্রত্যক্ষ পরিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যক্ষের পরিচ্ছিন্নতানুসারে জ্ঞানও হয় পরিচ্ছিন্ন। সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়-শক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হ'তে পারে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পরিণাম থাকে সাধকের নখদর্পণে। যোগাভ্যাসে মানব হ'তে পারেন সর্ব্বজ্ঞ।

প্রমার বা সত্যজ্ঞানের যাহা করণ তাহাকে বলে প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অপরিচ্ছিন্ন হইলে, নিশ্চয়ই ইহা হয় সার্ব্বভৌম সত্যজ্ঞানের কারণ। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অভ্রান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যোগাভ্যাসের গুণে যাঁহার ঐন্দ্রিয়িক শক্তি সম্যগ্-বিকাশ-প্রাপ্ত, যিনি অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী, তিনি এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, ইঁহাদের প্রত্যক্ষ হয় অপরিচ্ছিন্ন, দেশকাল দ্বারা ইহা হয় না বাধিত;

অতীত ও ভবিষ্যৎ ইহাদের কাছে বর্ত্তমান, বর্ত্তমান ভিন্ন ইহাদের কাল নাই, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই। অতএব, মুক্ত পুরুষ তথা সাক্ষাত ভগবান্ যাহা বলেন তাহাই অভ্রান্ত, তাহাই অব্যভিচারী এবং ইহারই নাম "আপ্তোপদেশ"। এই আপ্তোপদেশই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহাই প্রমা বা সত্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট করণ—সাধকতম; আপ্তোপদেশকে প্রমাণ করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন আপ্তোপদেশকে যাঁহারা যথাযথ রূপে অনুবর্ত্তন করিতে পারেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সকল কর্ম্মেরই অভীষ্ট ফল লাভ করেন। 'আপ্ত' বলে কাকে ?— আপ্ত = আপ (জলরাশি) + ক্ত; আপ = অপ্ শব্দ (জল, নার ও তত্ত্ব) + সমূহার্থে ষ্ণ। অপ্ = পাওয়া অর্থে √আপ + ক্বিপ্। ..'আপ্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ—ভ্রমাদিশূন্য নারায়ণতত্ত্বার্থবেদী পুরুষই 'আপ্ত' অর্থাৎ নারায়ণতত্ত্ব সম্যক্ যিনি প্রাপ্ত হ'য়েছেন তিনিই 'আপ্ত'।

সপ্তজ্ঞানভূমিকার (বদ্ধজীব→মুমুক্ষু→মুমুক্ষুতর→মুমুক্ষুতম→ব্রহ্মবিদাংবর→ব্রহ্মবিদাংবরীয়ান্→ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠ) ক্রমোন্নত সাধক যে ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠ তিনিই 'আপ্ত' এবং যখন তিনি হ'ন মুগ্ধ মহাকারণে ও স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন স্বরূপেই হ'ন কামচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায় পারেন বিচরণ করিতে তখন তাঁহাকে বলা হয় আপ্তকাম মহাপুরুষ—বন্ধন ও মুক্তির অতীত। এই অবস্থায় আত্মার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ এবং তাঁহার হয় আত্মাতে জগৎসত্তার অভাব বিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান (= সত্যজ্ঞান); এই অনুরাগ ও সত্যজ্ঞানই সাধককে ক'রে রাখে নিস্পৃহ অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্। তিনি হ'ন জীবন্মুক্ত—তাঁহার সকল বন্ধন যায় টুটে ও তিনি আস্বাদ পান নিত্যমুক্ততার; এই জীবন্মুক্তির নামই নির্ব্বাণ, ইহার পরই দেহান্তে বোধ হয় হ'তে পারে তাঁর বিদেহমুক্তি—"বিকলেবরকৈবল্যাম্ শ্রীরামচন্দ্রপদং" ভজে" ॥ অনুভবদ্বারা যিনি সর্ব্বপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রেছেন, নিখিলবস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি

বলেন না অপ্রকৃত কথা, তাদৃশ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের উপদেশ যে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক তাহাতে নাই সন্দেহ। এবম্প্রকার আপ্তোপদেশ-প্রমাণ ব্যতীত অন্যপ্রমাণ দ্বারা লব্ধ বস্তুতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বদা ভ্রান্তিশূন্য হওয়া নহে সম্ভব। অন্যপ্রমাণপ্রমিতজ্ঞান এই জন্য সত্যানৃত (**knowledge mixed with ignorance producing doubt**); আর্য্যেরা যে বেদাদি শাস্ত্রের অবিরোধে অন্যপ্রমাণের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিতেন, ইহাই তাহার কারণ।

এই অনুভব দ্বারা লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের আপ্তোপদেশ শব্দপ্রমাণ ; এই আপ্তোপদেশ বা শব্দপ্রমাণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভূত ক'রেছেন কণাদমুনি।

যিনি ত্রিকালদর্শী (=যাঁহার কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালও বর্ত্তমানবৎ) ; যাঁহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না দেশ ও কাল, যাঁহার হৃদয়ে সদাই প্রতিভাত হয় বস্তুর স্থূল-সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থাদ্বয়, তাঁহার হইতে পারে না প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনরূপ জ্ঞান এবং তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই **প্রত্যক্ষ।**

মিত (**=measured**)—পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অথবা জাতলিঙ্গদ্বারা পশ্চাৎ যে জ্ঞান হয় অর্থাৎ যে জ্ঞান লৈঙ্গিক (**=indicative of something**) তাহাকেই বলে **অনুমান জ্ঞান।** পৌর্ব্বাপর্য্য দেশ-কালকৃত, অতএব দেশ ও কাল যাঁহার দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে অক্ষম, তাঁহার কাছে পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের জ্ঞান থাকিবে কেন? তাঁহার কাছে সকল জ্ঞানই বর্ত্তমান্।

সত্যের শাস্ত্রলক্ষণানুসারে আপ্তপুরুষই সত্যবান্ ; আপ্তপুরুষ যাহা দেন উপদেশ তাহা অবশ্যই অবনতমস্তকে পালন করিবে আত্ম-হিতার্থী। কিন্তু কালস্রোতে তাদৃশ ঋষি বা তপস্বীদের তিরোভাবের পর বেদবিদ্যাপিপাসু সত্যানুসন্ধিৎসু মনুষ্যদের জ্ঞানপিপাসানিবৃত্তির জন্য যাস্কমুনির উপদেশ—গুরু পরম্পরাক্রমে যাঁহারা বহুবিদ্য তাঁহারাই

হবেন উপদেষ্টা ; এরূপ সাধু পুরুষেরও অভাবে করিতে হইবে ঋষি স্থানীয় আপনার-আপনার সদ্‌যুক্তি-বিচার-ও-তর্ককে (অবশ্য যুক্তিহীন কুতর্ক নহে) ; কথান্তরে, সাক্ষাৎ কৃতকর্ম্মা ঋষিদের অবিদ্যমানে বহু-বিদ্যাপারগ পুরুষবৃন্দকেই ঋষিবৎ মান্য করিয়া উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করানই সমীচীন হইবে। উক্ত 'তর্ককে' ঋষিস্থানীয় করার তাৎপর্য্য এই—কার্য্যপদার্থ বা বিকারপদার্থের আছে দু'টী অবস্থা, অন্তঃ ও বাহ্যঃ (বহিঃ)। কার্য্যপদার্থের বা বিকারপদার্থের যে অবস্থা ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল, যে অবস্থা হয় দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষীভূত (**which lies nearer the senses**) তাহাই ইহার বাহ্যাবস্থা, এবং ইহার বিপরীত অবস্থাটি অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম (**Invisible, Unseen**) ; ইহা পদার্থের আন্তরাবস্থা। বহিঃ ও বাহ্য শব্দদু'টী সমানার্থক ; 'বহপ্রাপণে'— এই প্রাপণার্থক √বহ (to carry)+ইস্‌=বহিঃ। যাহা বাহ্য— তাহা প্রাপ্য বা ইন্দ্রিয়গম্য, তাহাই বহিঃ। অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ততা ভেদ ব্যতীত আন্তর ও বাহ্যের মধ্যে অন্য কোনপ্রকার নাই ভেদ। এই ব্যক্তাব্যক্ত বা স্থূল সূক্ষ্ম অবস্থাদ্বয়ই যথাক্রমে কার্য্য ও কারণ ; স্থূল বা ব্যক্ত হয় কার্য্য এবং সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত হয় কারণ। এই সত্যভূমিক ভূমির উপরই যুক্তি-তর্ক-বিচার কর্ম্ম পরিচালন করিতে হইবে বিবেক মহাশয়ের সভাপতিত্বে।

সকল দেশের সকল শাস্ত্রই বলেন, সত্যের তথা সত্যবানেরই জয় সুনিশ্চিত। আবার জয় হয় শক্তি-আধিক্যবশতঃ। অতঃপর, তাই, কথিত হবে শক্তি-সংবাদ।

১০। শক্তি-সংবাদ (শক্তির স্বরূপ)

সত্যানুসন্ধান করিতে করিতে অনুমান করা যায়—সত্যের পাশাপাশি ওতপ্রোতভাবে শায়িত আছে আর এক অদৃশ্য পদার্থ। নির্বিবশেষ-নিরঞ্জন-নিত্য "আছের" অস্তিত্বের বা সৎবস্তুর যেন হইয়াছে বিশেষণ ঐ অদৃশ্য পদার্থটি নির্বিবশেষের বিশেষ যেন, তাই বিশেষণ; বিশেষণযুক্ত হইয়াই প্রকাশ পায় অখণ্ড-অনির্ব্বচনীয় "আছে" পদার্থ, এই অস্তিত্ব বা সৎবস্তু। তাই ঐ বিশেষণই হইতেছে **শক্তি**। 'জগৎ-আছে'—এই যে প্রতীতি, এই যে জগৎবিশিষ্ট একটি সত্তাজ্ঞান, উহা হইতে জগৎ-অংশ বা বিশেষণ অংশ বাদ দিলে, সাধারণতঃ ঐ সত্তা অংশ এখন প্রতীতি যোগাই হয় না। আ ার জগৎ সত্তার প্রতীতি না হ'লে, আত্মসত্তা অর্থাৎ আমি আছি এই জ্ঞানও থাকে না। সুতরাং জগৎ = সত্তা + শক্তি; তন্মধ্যে অদৃশ্য-অপ্রকাশিতা শক্তি-অংশটী প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা করিতেছে প্রকাশিত হইতে এবং অর্দ্ধপ্রকাশিত হইলে ইন্দ্রিয়রূপে গ্রাহ্য হইয়া স্থূলভাবে পাইতেছে প্রকাশ; এই শক্তি অংশের সাধারণ সংজ্ঞা—নাম ও রূপ অপর অংশটী অর্থাৎ সত্তাটী স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হ'লেও নহে অপ্রত্যক্ষ। বস্তুতঃ সত্তা ও শক্তি অভিন্ন; শক্তির সত্তা অথবা সত্তারই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান-সত্তায় নাই কোনও ভেদ। যতক্ষণ থাকে ভেদ-প্রতীতি, ততক্ষণ দেখা যায়—শক্তি যেন সত্তাকে ধরিয়া রাখিয়াছে; এই শক্তিটীও নহে জড়, পরন্তু শক্তিই চিৎ বা চৈতন্যমাত্র। এই শক্তি নহে মিথ্যা বা মায়া, নহে ভ্রান্তি পরন্তু সত্য, ব্রহ্মের আবরক নহে পরন্তু শক্তিই ব্রহ্মের প্রকাশক। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রকাশই শক্তি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বিকাশই শক্তি; পরম অংশটির নাম শক্তিমান্ এবং "একোঽহম্ বহুস্যাম" অর্থাৎ অহংবোধ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুভাবে প্রকাশ, প্রকাশিতের

ধারণ ও প্রলয়াদি কার্য্য অংশটীর নাম শক্তি। সূর্য্যের প্রকাশশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি যেরূপ মাত্র মুখে বলা যায় এবং উক্তরূপ ভেদ হয় না কখনও অনুভূতিযোগ্য, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মাত্র-মৌখিক বিচারেই প্রযুজ্য।

যে শক্তি প্রভাবে সেই অখণ্ড সত্তা হয় খণ্ড-খণ্ড—বিষয়ের আকারে পায় প্রকাশ তাহাই শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত মহামায়ারূপে! একটী শক্তিই বিভিন্ন বিষয়-আকারে পাইতেছে প্রকাশ। সুতরাং জগৎ বলিলে, বিষয় বলিলে বুঝিতে হইবে -উহা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা একটী **মহতীশক্তি।**

কেবল-আত্মা বা সন্মাত্র লীলাকৈবল্যবশতঃ আবির্ভূত হ'লেন ব্যবহারিক আত্মারূপে আত্মলীলারূপ ব্যবহারের জন্য: ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা কর্ম্মক্ষেত্রে উদয় হইল আত্মশক্তি বা সামর্থ্য, আধ্যাত্মিক ভাষায় তার নাম চিৎ। ইহাই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ। সন্মাত্র = সৎ + মাত্র। সত্তা = সৎ + ভাবে ষ্ণ্য ; সেই নিত্য-**নির্ভাব**-নির্ব্ব্যবহার-নিরঞ্জন-নির্বিবশেষ পরমাত্মাক্ষেত্রের সৎ-পদার্থে তাঁরই ইচ্ছায় উদয় হ'লো "**ভাব**", ব্যাকরণসূত্রে ভাবে ষ্ণ্য প্রত্যয়ে সৎ পরিণত হ'লো সত্যে ; সত্যের অধিকারী সত্যবান্ শব্দ স্মর্ত্তব্য "ভূসত্তায়াং" ; আরও, ভাবের উৎপত্তি শব্দ হইতেই ; মনে যে কোন ভাবই "জাগুক না কেন উহা কতকগুলি শব্দসমষ্টি মাত্র ; ঐ শব্দগুলি যদিও ধ্বনির আকারে বাহিরে আসে না, তথাপি উহা যে নীরবতার শব্দ তদ্বিষয়ে নাই কোন সংশয়। শক্তি অনির্ব্বচনীয়া, ইহার প্রথম অভিব্যক্তিই নাদ বা **শব্দ** ; নাদ ও শক্তি অবিনাভাবী—যেখানে শক্তি সেখানেই নাদ বুঝিতে হইবে বিদ্যমান। এ জগতে যতকিছু **পদার্থ** দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা অন্তরে যে কোন **ভাবের** উদয় হয় উহা এক একটী শব্দমাত্র। শব্দ নাই অথচ **পদার্থ** কিংবা **ভাব** আছে, ইহা হয় না।

আরও বুঝিতে হইবে—সেই অখণ্ড চৈতন্য শক্তিই প্রকাশ পাইতেছে জীবের ইন্দ্রিয়প্রণালীরূপে, মনঃ-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কাররূপে, প্রাণ-অপানাদি পঞ্চবায়ুরূপে এবং ক্ষিত্যপাদি পঞ্চভূতরূপে ও তত্ত্বসমূহের (ক্ষিত্যপতেজ....) বিভিন্ন শক্তিরূপেও।

আবার, কর্ম্মমাত্রই শক্তির স্ফুরণ; দর্শন-শ্রবণাদি প্রতি কর্ম্মই এক প্রকার শক্তির স্ফুরণমাত্র। ঐ শক্তিসমূহ যখন থাকে অব্যক্ত বা বীজাবস্থায়, তখন উহাদের স্বরূপ হয় না অনুভূত, কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইলেই শক্তির সত্তা (=বিদ্যমানতা) বোঝা যায়। শক্তি যখন প্রকাশ অর্থাৎ প্রবাহশীলা হইয়া কার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন উহার গতি হয় সর্পবৎ; শক্তিপ্রবাহ কখন সরল ভাবে চলে না। সর্প কুটিল-গতি জাব; জাবভাবায় শক্তিকে **"কুলকুণ্ডলিনী"**ও বলা হয়।

জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, মনঃ-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় বলিয়া, যাহা কিছু দেখা যায়—উপলব্ধি করা যায়, এ সবই একমাত্র পরাশক্তির (=অখণ্ড চৈতন্যশক্তি)ই বিভিন্ন বিকাশ। মন্ত্রদাসা মনন করেন আধিদৈবিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেবতারই আছে একটা বৈশিষ্ট্য; এই বিশিষ্টতাই শক্তির কার্য্য; শক্তি যখন কার্য্যরূপে পায় প্রকাশ তখনই অনুমিত হয় শক্তির সত্তা, নতুবা নির্বিবশেষ শক্তি কখনও হয় না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অরূপ কারণের স্বরূপই শক্তি, আবার কারণের মতই আত্মা শক্তিপদার্থও অদৃশ্য।

ব্রহ্মনিরূপণ সূত্রের "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—বস্তুটী চিতিশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই জগদ্রূপ কার্য্যদ্বারাই উহার শক্তিরূপত্ব বিশেষ ভাবে বোঝা যায়। মনে রাখিতে হইবে—যাহা শক্তির আশ্রয়, তাহা শক্তির স্বরূপ হইতে একান্ত-ভিন্ন-পদার্থ হইতে পারে না; আর একমাত্র চৈতন্যেই শক্তি অবস্থিত, তদ্ভিন্ন আর কোথাও নাই শক্তি বা থাকিতেও পারে না। সৎ-ও যা, চিৎ-ও তাই; সৎ প্রসুপ্ত, চিৎ তাঁহারই জাগরিত ভাব বা অবস্থা, যেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় লীলাকর্ম্মকরণোন্মুখ।

শক্তিসংবাদ (শক্তি বলে কাকে ?)

শক্তি বলে কাকে ? ব্রহ্মনিরূপণ সূত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-রূপ আত্মা জীবরূপী বহু আধারের মধ্য দিয়া বহু "আমির" ভাণ করিতেছেন ; ঐ এক "আমির" নাম আত্মা এবং বহুর ভিতর দিয়া প্রকাশ হওয়ারূপ কর্ম্মটাই "**শক্তি**"। ঐ যে আত্মা এবং শক্তি, ইহাকে এক, দুই বা বিশিষ্ট এক, যাহাই বলা হউক না কেন, বস্তুতঃ তাহাতে আত্মার স্বরূপের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। আত্মা ও শক্তি, শব্দমাত্র ভেদ বস্তুতঃ নাই কোন ভেদ। যদ্দ্বারা যে ক্রিয়া হয় নিষ্পাদিত, তাহাকে বলা হয় তৎ ক্রিয়ার বীর্য্য বা **শক্তি**। বীর্য্য ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়া হয় না নিষ্পন্ন, অতএব সকল ক্রিয়াই বীর্য্যবতী।

সামর্থ্যবাচী স্বাদিগণীয় ও দিবাদিগণীয় √শক (to be able, to bear, to endure, to be powerful)+ক্তিন্ প্রত্যয়ে শক্তি-শব্দ সিদ্ধ ; "স্ত্রিয়াং ক্তিন্" (পাঃ ৩।৩।৯৪)। যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য, যোগ্যতাযুক্ত ধর্ম্মীর (বা দ্রব্যের) যাহা ধর্ম্ম ["যোগ্যতা-বচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্ম"। পা, সূ, ভা।] ; যাহা কারণের আত্মভূত ["কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং"।—শারীরক ভাষ্য।] ; যদ্দ্বারা পরলোক জয়, অর্থাৎ মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারা যায় আত্মাকে, কথান্তরে যাহা দ্বারা জীব জীবত্ব ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব তথা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে হয় সক্ষম তাহাকে বলে **শক্তি**।

শক্তিকে কর্ম্মও বলা যাইতে পারে, কারণ কর্ম্ম শক্তিরই প্রব্যক্ত অবস্থা। ঋগ্বেদসংহিতা বলেছেন "শক্তিকে" **কর্ম্ম, সামর্থ্য** ও **কারণ** নিম্নমন্ত্রে :---

"স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভীরোদসি প্রাম্।
তমু অকৃণ্বন্ত্রেধাভুবে কংস ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ"॥

মর্ম্ম :—দেবগণ স্তোম (=স্তুতি) ও শক্তি (=কর্ম্ম) দ্বারা যে ত্রিলোকব্যাপক সূর্য্যাত্মক অগ্নিকে দ্যুলোকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেই অগ্নিকেই জগদ্ব্যাপার সিদ্ধির জন্য—জগৎ-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য—এই ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থ—সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বত্র বিদ্যমান এই এক অগ্নি জগতের হিতার্থ ওষধি সকলের (ব্রীহি প্রভৃতির) যথাযোগ্য পরিপাক করিয়া থাকেন, অগ্নি দ্বারাই জগতের সর্ব্বপ্রকার ব্যাপার হয় সম্পন্ন।

নিরুক্ত বলেছেন, "স্তোমেন হি যং দিবি দেবা অগ্নিমজীজনঞ্-ছক্তিভিঃ কর্মভির্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পূরণং তমকুর্বংস্ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যা-মন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূনির্যদস্য দিবি তৃতীয়ং তদসাবাদিত্য ইতি ব্রাহ্মণম্।"

মর্ম্ম :—এই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে জগতের সমস্ত তত্ত্ব—অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য্য ইহারা কোন পদার্থ, কি জন্য ও কিরূপে সৃষ্ট হয় এই জগৎ, কর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ কি, তাপ-তড়িৎ-আলোক ইত্যাদি পদার্থ-সমূহ যে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, মন্ত্রটার গর্ভ খুঁজিলে তাহা জানা যায়। যে শক্তি দ্বারা যে নিয়মে বাষ্পীয় রথ দ্রুতবেগে হয় পরিচালিত, যে শক্তি দ্বারা যে নিয়মে ওষধিসকল বর্দ্ধিত-পুষ্পিত-ও-ফলিত হয়, যে শক্তি দ্বারা যে নিয়মে জীবদেহযন্ত্র করে কার্য্য, জীবদেহের উৎপত্তি হয়, সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে বাষ্প উদ্গমন করে, আকাশে মেঘরূপ ধারণ করে এবং পুনর্ব্বার জলরূপে পৃথিবীতে করে অবতরণ, শক্তি ও ভূতের স্বরূপ কি—এই সকল বিষয়ের প্রকৃত সমাধান হয় উদ্ধৃত মন্ত্রটা হইতে। কিন্তু, ক্ষোভের বিষয় বর্ত্তমানে বেদের মাহাত্ম্য শ্রবণে, সত্যের অনুসন্ধানে হতভাগ্য বঙ্গদেশের আর নাই প্রবৃত্তি। লেখকের বিশ্বাস যদি কোন ভাগ্যবান্ কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ-বেদজ্ঞ-ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সহায়তায় মন্ত্রের ব্যাখ্যা যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার

জ্ঞানপিপাসার হয় শান্তি। মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করার শক্তি ও যোগ্যতা এই স্বল্পজ্ঞ লেখকের নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকেই বলেছেন "শক্তি"; প্রকৃতি দেবাত্মাতে (= পরমেশ্বরে) অবস্থিতা, পরমেশ্বর হইতে অপৃথগ্‌ভূতা, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি। যোগবাশিষ্ঠের কথায়—অপ্রমেয়, শান্ত, চিন্মাত্র, নিরাকার, মঙ্গলময় পরমাত্মার প্রথমেই হয় ইচ্ছা-সত্তার অভিব্যক্তি, তৎপরে ব্যোমসত্তার, তৎপরে কালসত্তার, তদনন্তর হয় নিয়তিসত্তার (= নিয়মিত পরিচালন) অভিব্যক্তি; ইচ্ছাদি সত্তাসকলের অনুগত সত্তার নাম 'মহাসত্তা' ইচ্ছাদি সত্তাসমূহ অসাধারণী ঐশীশক্তি; ফলতঃ জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃত্ব (প্রবৃত্তি)-শক্তি, অকর্তৃত্ব (নিবৃত্তি)-শক্তি ইত্যাদি পরমেশ-শক্তির নাই সীমা; পরমেশ-শক্তিসমূহ সামান্যতঃ ইচ্ছাদি নামে পরিগণিত হ'লেও, ব্যক্তিগত ভেদানুসারে অগণনীয়। আবার, শক্তিমান হইতে শক্তির ভেদ বাস্তব নহে; মায়া বা অনাদি কর্মই শক্তিভেদের কারণ, মায়া স্বরূপতঃ অনন্ত পরব্রহ্মের গুণতঃ, শক্তিতঃ ও কালতঃ ঘোষণা করে তাঁর আনন্ত্যই। যোগবাশিষ্ঠের শেষ সিদ্ধান্ত—পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন সত্তাই শক্তি, পদার্থমাত্রেই শক্তি, শক্তিই দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি বিবিধ নামে কথিত; শক্তিই আকাশ, দেশ, কাল, মনঃ, বুদ্ধি, কর্ম, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদি নামে নামিত। ফলকথা সত্তাই শক্তি।

সাংখ্যদর্শনের কথায়—"শক্তি" উপাদান কারণ, শক্যতা বা যোগ্যতা এবং করণও বটে। যাহা যাহার স্বভাব, তাহা কখন একেবারে হয় না ধ্বংস: স্বভাব অনপায়ী (নাই অপায় বা বিনাশ যাহার)। শক্তির হয় আবির্ভাব ও তিরোভাব, কখন অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। যোগী তাঁর দৃঢ় সংকল্পশক্তি দ্বারা রঞ্জিত শুক্ল পটকে পুনর্ব্বার শুক্ল করিতে—স্বভাবে আনিতে পারেন এবং দগ্ধবীজে পুনর্ব্বার আনিতে পারেন অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি।

বৈয়াকরণ প্রধান ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয়ের শ্রুতিব্যাখ্যার কথায়—এই যে নাম, রূপ ও ক্রিয়াবৎ "বিকৃত জগতের উপলব্ধি হইতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল ইহা এক—অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ "সৎ" মাত্র (সন্মাত্র) রূপে বা অবস্থায়। "কি প্রকারে নানাভাবে অভিব্যক্তি হইল সেই এক-অদ্বিতীয়-নির্ব্বিশেষ পদার্থের ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ভর্ত্তৃহরির উপদেশ—শব্দতত্ত্ব ব্রহ্মে, একত্বের অবিরোধিনী, পরস্পর ভিন্না, আত্মভূতা শক্তিসমূহ আছে বিদ্যমান, এই সকল শক্তির ভেদারোপনিবন্ধন, শক্তিসমূহ হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ না হইলেও, ব্রহ্মের পৃথকত্বের হয় অবভাস। এ স্থলে কারণাত্মভূতা **সংস্কারবতী-মায়ার** বা **কর্ম্মের** বাচক বলা হয়, "শক্তি"কে।

আবার প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত দ্রব্যশক্তি, দেখা যায়, বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যশক্তি সংযোগে কার্য্যকালে হয় প্রতিবন্ধ ও যথাযোগ্য ক্রিয়া করিতে অপারগ। দৃষ্টান্তে বলা যায়- বাষ্প (তেজের প্রসারণশক্তি), যেমন ক্রিয়া করিতে পারে, জল তেমন পারে না; এবং তরল পদার্থে যেমন তেজের প্রসারণশক্তির কার্য্যকারিতা ও যেমন বলবতী, কঠিন পদার্থে সেরূপ নহে। আণবিক শক্তির যেখানে প্রবলতা, তেজের প্রসারণশক্তির সেখানে মন্দীভাব, এবং আবার আকুঞ্চনশক্তির হ্রাসে প্রসারণশক্তির প্রবলতা দেখা যায়। অগ্নির দাহিকাশক্তি, বিষের বিষশক্তি মন্ত্রৌষধি দ্বারা হয় প্রতিবন্ধ—ইহাও দেখা যায়। অগ্নির সহিত সাধারণ জীবদেহের সংযোগ ঘটিলেই দেহ হয় দগ্ধ, কিন্তু যোগশক্তিতে শক্তিমান পুরুষ (যেমন সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা) অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করিতে পারগ হন। বিষ সামান্য মাত্রায় ভক্ষণ করিলেই জীব মরে, কিন্তু এমন লোক আছেন যাঁহারা বিষমাত্রায় ভক্ষণ করিয়াও উহা করেন পরিপাক। এখানেও "শক্তি" শব্দকে বলে "সামর্থ্য"।

মীমাংসাশাস্ত্রের কথায়—ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন কার্য্যদ্বারা অনুমিত

হয়, সেইরূপ অতিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থের অস্তিত্বও কার্য্যদ্বারা হয় অনুমিত। গুণাদি পদার্থেও শক্তি থাকে বলিয়া শক্তিকে গুণ-দ্রব্য-কর্ম্ম পদার্থের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। শক্তিকে সামান্যাদির অন্যতম রূপাও বলা যায় না, কারণ ইহা সামান্যাদির ন্যায় নিত্য বা স্থির পদার্থ (Common Factor) নহে। অতএব স্বীকার্য্য—**শক্তিদ্রব্যাদি পদার্থাতিরিক্ত পদার্থ।** যদ্বারা যৎকার্য্য হয় সিদ্ধ, তাহা হয় বিবেচিত তৎকার্য্যসাধিকা শক্তিরূপে। কার্য্যসাধন-যোগ্যতাই, কারণ নিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম্মবিশেষই "শক্তি" শব্দের অর্থ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত বস্তুশক্তি, দেখা যায়, সর্ব্বত্র যথাসম্ভব ক্রিয়া করিতে পারগ নহে; বিষের বিষশক্তি সর্ব্বত্রই বিষ-ক্রিয়া করিতে পারে না, অগ্নির দাহকতাশক্তি সর্ব্বত্র দহন করিতে সমর্থা নহে, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অঙ্কুরোৎপাদনে পারগ নহে। আবার যেমন করতলে অগ্নির সংযোগেদগ্ধ' হয় করতল, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে অর্থাৎ কোন পাত্রে অগ্নি থাকিলে করতল হয় না দগ্ধ, আর প্রতিবন্ধক কারণটা অপসারণ করিলেই অগ্নি দগ্ধ করে করতল। যাহার অভাবে কার্য্যের অভাব হয়, তাহা দ্রব্যাদি পদার্থ-নিষ্ঠ; কিন্তু দ্রব্যাদি-পদার্থ ব্যতিরিক্ত **"শক্তি"** নামে পদার্থ স্বতন্ত্র।

নৈয়ায়িক বলেন বস্তুর কারণত্বই তাহার 'শক্তি', এমতে দেখা যায়—প্রকৃতি, শক্তি, কারণ ইহারা সমানার্থক।

শক্তিই ঘটায় পরিবর্ত্তন; জগৎসম্বন্ধীয় যে কোন অনুভূতিই হউক না কেন, তাহাই ভাবের অনুভূতি; প্রত্যেক জাগতিক ভাবই, আত্মা শক্তি পরিচালিত ভবসিন্ধুর তরঙ্গমাত্র; অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল পদার্থই ঘাত-প্রতিঘাতজনিত শক্তিতরঙ্গ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যাদের অনুভূতিই বাহ্য জাগতিক অনুভূতি—যাদের সংহতরূপই বাহ্য জগৎ, তাহারাও লীলাময়ী শক্তিস্রোতস্বিনীর এক একটী তরঙ্গ (wave motion)-ভিন্ন আর কিছু নহে। কি তাপ-তড়িৎ, কি আলোক-

-চৌম্বকাকর্ষণ, সকলই তা'ই, সকলেই আণবিক তরঙ্গ; অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি গুণপঞ্চক সত্ত্বাদি গুণ বা **শক্তিত্রয়েরই** পরিণাম, সুতরাং ইহারা তদাত্মক নিখিল-মূর্ত্তজাগতিক পদার্থও আবার শব্দস্পর্শাদিরই সংঘাতরূপ। জাগতিকভাবজাতগুলি, **অনন্তশক্তিসাগরে** ক্ষণে উত্থিত, ক্ষণে পতিত বুদ্বুদ-বিশেষমাত্র।

শক্তির **ধর্ম্মকর্ম্ম**—প্রকৃতি-বা-কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত-কার্য্য। শক্তির সহিত সাক্ষাত পরিচয় মানবের নাই, কর্ম্মের সহিতই মানবের আছে সাক্ষাত পরিচয়; কর্ম্ম দেখিয়া মানব শক্তির অনুমান করে। শক্তির স্থানপরিবর্ত্তন-বা-রূপান্তর পরিণাম-ক্রমই কর্ম্ম। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই কর্ম্মমাত্রের সামান্য প্রকৃতি—সাধারণ-কারণ বা শক্তি (common factor)। কি ভৌতিক কর্ম্ম, স্থাবর জীব অর্থাৎ উদ্ভিদের কর্ম্ম, কি সংকীর্ণচেতন অর্থাৎ ইতরজীবের কর্ম্ম, এবং কি বিশিস্ট-চেতন অর্থাৎ মানবের কর্ম্ম, সবই মূলতঃ ত্রিগুণাত্মক। বিশ্বজগৎ কর্ম্মেরই মূর্ত্তি; আমরা যাহাই করি, যাহাই জানি সবই কর্ম্ম।

নিয়ত পরিবর্ত্তন—সতত একভাব হইতে ভাবান্তরে গমনই অর্থাৎ কর্ম্মই, তাহা হইলে, সংসারের স্বরূপ; পরিণামই জগতের প্রকৃত আকৃতি। একভাব হইতে ভাবান্তরে যাইতে হইলে, নিশ্চয়ই পূর্ব্বভাবের **ত্যাগ** এবং অপর ভাবের **গ্রহণ**—এই দ্বিবিধ ব্যাপার ঘটে; এক ভাবের ত্যাগ ও অন্যভাব গ্রহণ ভিন্ন কখন কোনরূপ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কর্ম্ম হ'তে পারে না; সুতরাং কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। জগতের যে দিকেই দেখা যায় সেই দিকেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মের রূপ দেখা যায়; জগৎ যে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক-কর্ম্মময় তাহাতে নাই কোন সন্দেহ; প্রতিটী জাগতিক ভাব ইহার প্রকৃস্ট প্রমাণঃ—দৃস্টান্তস্বরূপ বলা যায় কতকগুলি; যথা—(১) উজ্জ্বল-সোণালী সুকোমল-সুশোভন গাছের পাতাগুলি তাদের শিশুকালে (=কচি অবস্থায়) শাখায় সংলগ্ন থাকিয়া

বাতাসে দুলিতে দুলিতে করে খেলা, শাখা উহাদিগকে মা'র মত আদরে বুকে লইয়া যেন পোষণ করে; কিন্তু অল্পদিনেই সোণালীরং ছেড়ে ঐ পাতাগুলিই হয় সবুজ; আবার যেন কোন অজ্ঞাত কারণে মা'র কোল ছেড়ে প'ড়ে যায় মাটীতে, আর শাখার উচ্চের সোণালী পাতাগুলি বিবর্ণ হ'য়ে যায়, শেষে ধুলায় পদদলিত হ'তে হয় তাহাদিগকে। মা'র কোলে বীতরাগ হইয়া কোন্ আকর্ষণে, কিসের টানে ধূলায় পদদলিত হওয়া ইহাদের অভীপ্সিত? (২) বীজ, বীজভাব ছেড়ে হয় অঙ্কুর, অল্পদিনেই অঙ্কুরভাব ছেড়ে আবার হয় বৃক্ষ→ফল→বীজ; (৩) ভ্রূণ ভ্রূণভাব ছেড়ে→শিশু→বালক বালিকা→যুবক-যুবতী→প্রৌঢ়াবস্থা→ বৃদ্ধাবস্থা; শেষে কোন অবস্থাতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া, এ জগতের কোন বস্তুকেই যেন ঈপ্সিততম বলিয়া না বুঝিয়া ইহসংসারের সম্পর্ক কাটিয়া স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোথায় যেন চ'লে যাইতেছে। (৪) শীতের পর বসন্তের শোভা-ও হয় অন্তর্ধান; (৫) সুবিস্তীর্ণ দেশ সাগরে, সাগর আবার দেশে হচ্ছে পরিণত।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক বা আধিদৈবিক কারণ—ভেদ সংসর্গ-বৃত্তি সূক্ষ্মতম পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, দ্ব্যণুকাদিক্রমে (=দ্বি+অণুক—molecule) স্থূল বায়্বাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আবার পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া, সূক্ষ্মাবস্থায় করিতেছে প্রত্যাগমন। ইহার আধ্যাত্মিক কারণানুসন্ধানে দেখা যায়—যে যাহাকে আত্মীয় মনে করে, যে যাহাকে সুখকর বা আত্মার অনুকূল বলিয়া বুঝে, সে তাহাকে পাইতে চাহে, তাহাকে পাবার জন্য হয় সে উৎসুক; তাহার প্রতি তাহার জন্মে রাগ (Attraction—অনুরাগ); আর, যাহা তদ্বিপরীত রূপে হয় নিশ্চিত—অর্থাৎ, যাহাকে যে অনাত্মীয় বা প্রতিকূল ভাবে, তাহাকে সে ত্যাগ করিয়া থাকে; তাহার, তাহার প্রতি হয় দ্বেষ বা বিরাগ (Repulsion)। এই রাগ-বিরাগই যথাক্রমে গ্রহণ ও ত্যাগের হেতু। রাগ-বিরাগই সকল প্রকার কর্ম্মের মূলীভূত

কারণ। রাগ-বিরাগ না থাকিলেই কর্ম্ম হয় শেষ—প্রবৃত্তির হয় নিবৃত্তি; "পরিণামস্রোত" একেবারে হয় অবরুদ্ধ; প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় সাম্যাবস্থা (Equilibrium)। রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত পুরুষই শাশ্বত শান্তি পান। রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত বলিয়াই দেবতারা নিত্যৈশ্বর্য্যভোগের অধিকারী। রাগ-দ্বেষের কারণ আলোচনায় বলা যায়—সুখভোগের পর তজ্জাতীয় সুখে ও তৎসাধনে অর্থাৎ সুখের হেতুভূত পদার্থে হয় রাগ বা আসক্তি এবং দুঃখভোগের পর তজ্জাতীয় দুঃখে ও তৎসাধনে অর্থাৎ দুঃখের হেতুভূত পদার্থে হয় বিরাগ বা দ্বেষ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ং প্রত্যক্ষ। কিন্তু সুখদুঃখভোগ হইয়া যাইবার পরও এবং সুখ বা দুঃখ-ভোগোত্তর কালে তত্তৎ পদার্থের প্রতি যথাসম্ভব রাগদ্বেষ থাকিবার কারণানুসন্ধানে মহর্ষি কণাদের সূত্র—"তন্ময়ত্বাচ্চ"—৬।১।১১ বিবেচ্য; বিষয়াভ্যাস-নিমিত্ত **সংস্কারই** তাহার কারণ। বিষয়াভ্যাস-নিমিত্ত সংস্কারের নাম তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়ত্ববশতঃ সুখ ও সুখসাধনের, কিংবা দুঃখ ও দুঃখসাধনের অবিদ্যমানেও চিত্তে বিদ্যমান থাকে রাগ-বিরাগ। বিষয়োপভোগ হইবার পরে চিত্তে সংলগ্ন হয় তাহার সংস্কার, সুতরাং বিষয়ের অনুপস্থিতিতেও রাগ-দ্বেষ থাকিবার কারণ বোঝা গেল; কিন্তু দেখা যায় যে বর্ত্তমান দেহে যে সকল বিষয়ের উপভোগ হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহাদের কখনই সন্নিকর্ষ ঘটে নাই তাদৃশ বিষয়ের প্রতিও লোকের হয় রাগ-দ্বেষ; যাহা দেখে নাই, শুনে নাই এ জীবনে যে-যে বিষয় কখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই, তত্তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষোৎপত্তির কারণে এবং ইহজীবনে অপ্রতীত বিষয়ে রাগ-দ্বেষ হয় কি কারণে তাহার উত্তরে বৈশেষিকদর্শনের সূত্র "অদৃষ্টাচ্চ" ৬।১।১২ অর্থাৎ, অদৃষ্ট বা জন্মান্তরকৃত সংস্কারবিশেষই, ইহার কারণ। বর্ত্তমান দেহে অনুভূত সুখদুঃখের প্রতি যে রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মানুভূত বিষয়সংস্কারই তাহার কারণ। জাতি-বা-জন্মবিশেষ হইতেও স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষের বৈশিষ্ট্য

দেখা যায়। মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল পদার্থের প্রতি সাধারণতঃ অনুরক্তি বা বিরক্তি হয়, পশ্বাদি ইতরজীবপ্রকৃতিতে তাহা হয় না। মনুষ্যের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদি গুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে রাগ-দ্বেষের হয় ভিন্নতা। মাতা-পিতা সমান হইলেও অনেক সময় দেখা যায়, সহোদরগণের রুচি হয় না একরূপ। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মাতা-পিতা হইতে জাত সন্তানের বিশুদ্ধবিষয়ে অনুরাগ ও তদ্বিপরীতে হয় বিরাগ। আবার মলিনচিত্ত মাতা-পিতার সন্তান হয় পাপপ্রবণ ও কুরুচিসম্পন্ন। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও নহে বিরল।

পুনরুক্তিতে বলা যায়—সুখাভিজ্ঞের সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক সুখ বা তৎসাধনে অর্থাৎ তৎ-হেতুভূত পদার্থে যে গর্ধ = গর্দ্ধ (=তৃষ্ণা, পুনর্ব্বার তাহাকে পাবার জন্য লোভ—Attraction) তাহাকে বলে **রাগ**; এবং দুঃখাভিজ্ঞের দুঃখানুস্মৃতি পূর্ব্বক দুঃখ বা তৎ সাধনে অর্থাৎ তৎ-হেতুভূত পদার্থে যে প্রতিঘ(=ক্রোধ, বিরাগ, জিঘাংসা—Repulsion) তাহাকে বলে **দ্বেষ**।

আমরা যাহা কিছু অনুভব করি—ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা যে কোন বিষয় গ্রহণ করি, তাহাদের সংস্কার সংলগ্ন হ'য়ে যায় আমাদের চিত্তে—তাহাদের ছবি (copy or image) আমাদের চিত্তপটে হ'য়ে যায় অঙ্কিত। অনুভূত বিষয়সকল অপসৃত হ'লেও আমরা যে তাদের রূপ যথাযথরূপে ধ্যান করিতে পারি, ইহাই তাহার কারণ। যাহা আত্মার অনুকুল বেদনীয় (agreeable to the perception), তাহা সুখ, আর যাহা প্রতিকুল-বেদনীয় (disagreeable to the perception), তাহা দুঃখ। পূর্ব্বে আলোচিত হ'য়েছে মিথ্যাজ্ঞানটাই এই রাগ-দ্বেষের কারণ। এই মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থসমূহের অযথাভাবে গ্রহণ, ইহারই অন্য নাম "মোহ"। এখন আলোচ্য কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনলক্ষণদোষের স্বরূপ:—প্রবর্ত্তনাই (=প্রবৃত্তিই) দোষের লক্ষণ, প্রবৃত্তি দ্বারাই লক্ষিত হয় দোষ; দোষসকলই প্রবর্ত্তিত করে

পুরুষকে কর্ম্মে। প্রবর্ত্তনালক্ষণ দোষ গুলি এই :—ঈর্ষ্যা-অসূয়া-লোভ-মান-মদ-মাৎসর্য্য-স্পৃহা-তৃষ্ণা-বাহ-অমর্ষ-মিথ্যাজ্ঞান (মোহ) রাগ-দ্বেষ-প্রমাদ-বিচিকিৎসা। পূর্ব্বে উক্ত "রাগ" = অনুকূল পদার্থে অভিলাষ "দ্বেষ" = প্রতিকুল পদার্থে অপ্রীতি, অক্ষান্তি, বিরাগ। "মোহ" = পদার্থ সমূহের অযথাভাবে গ্রহণ। প্রধানতঃ ঐ প্রবর্ত্তনালক্ষণ দোষপদার্থের মধ্যে নির্ব্বাচিত হ'য়েছে এই শেষোক্ত তিনটাই (রাগ-দ্বেষ-মোহ)।

ব্যাপার-বা ক্রিয়া দ্বারা শক্তির অনুমান করা যায়; কারণ শক্তি বিনা ক্রিয়া হয় না। মানুষ যখন কর্ম্ম করে (বাচিক, মানসিক ও কায়িক), তখন মানুষে যে উক্ত ত্রিবিধ (রাগ দ্বেষ-মোহ) ক্রিয়ানিষ্পাদিকা-শক্তি আছে (**Impulses to action**) তাহা অনুমান হয়।

কর্ম্ম=শক্তির স্থানপরিবৃত্তি-বা-রূপান্তরপরিণামক্রম **"work is any process of transference or transformation of energy"**।

আত্মা হইতে ইচ্ছার (**will**) উৎপত্তি ; **WILL FORCE** = মনঃ। ইচ্ছা হইতে কৃতি বা প্রযত্ন→চেষ্টা→ক্রিয়া (বাহ্য বা স্থূল কর্ম্ম) ; মহর্ষি কণাদ বলেন কর্ম্ম দ্বিবিধ (ক) বাহ্য তথা আধিভৌতিক, (খ) আন্তর তথা আধিদৈবিক ; গীতার কর্ম্মযোগের কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক তথা আধ্যাত্মিক কর্ম্ম।

ঋগ্বেদসংহিতার ৩।২২।২ মন্ত্র থেকেই শক্তির ধর্ম্মকর্ম্ম বেশ অনুধাবন করা যায়, মন্ত্র যথা :—

"অগ্নে যত্তেদিবিবর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষপ্স্বাযজত্র।
যেনান্তরিক্ষমুর্বাততন্থত্বেষঃ সভানুরর্ণবোনৃচক্ষাঃ॥"

মর্ম্ম—হে অগ্নি! হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! দ্যুলোকে যে বর্চঃ (তেজঃ বা শক্তি) বিদ্যমান, তাহা তোমার জ্যোতিঃ(=শক্তি) ; পৃথিবীতে দাহ-পাকাদিক্রিয়া নিষ্পাদনরূপে যে তেজঃ বিদ্যমান্ তাহা তোমারই তেজঃ, এইরূপ ওষধীসমূহে (অরণী প্রভৃতি কাষ্ঠে), অথবা

বনস্পত্যাদিতে যে সোমাখ্য তেজঃ আছে, জলে যে ঔর্ব্ব নামক তেজঃ আছে, তাহারাও তোমারই তেজঃ ; অপিচ তুমিই বায়ুরূপে তেজ দ্বারা আকাশ ব্যাপিয়া আছ বিদ্যমান। অতএব বোঝা যায়—পরমেশ্বরের এক তেজঃ বা শক্তিই রূপ ধারণ ক'রেছেন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি। আবার অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইহাদের প্রত্যেকটী প্রত্যেকের রূপ (=আকার) ধারণ করিতে পারেন। ইহারা চেতন ও অচেতন এই উভয়বিধরূপে অভিব্যক্ত হইতে সমর্থ ("ইতরেতরজন্মানো ভবন্তী-তরেতরপ্রকৃতয়ঃ....)। বেদ বলেন বিদ্যুৎ ও বায়ু এই দুইটী অন্তরিক্ষ ব্যাপী কর্ম্মাত্মা দেবতা বা শক্তি। মরুৎ বৈদ্যুতাগ্নির আশ্রয় ; এই মরুৎ বিশ্বের আকর্ষণ শক্তি, এতদ্বারা উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ ইত্যাদি কর্ম্ম হয়। আবার হে অগ্নি ! যে-তুমি জলে প্রবেশ কর, সেই তুমি ওষধীসকলের উৎপাদন পূর্ব্বক উহাদের গর্ভে ওতপ্রোত ভাবে হও প্রবিষ্ট ; সেই তুমিই আবার প্রাদুর্ভূত হও ইহাদের অপত্যরূপে।

এইরূপে দেখা যায়—"শক্তি"-শব্দটী-ব্যবহৃত কর্ম্মের বাচকরূপেও। অতএব শক্তির স্বরূপ জানিতে হইলে কর্ম্মেরও স্বরূপ জানা চাই। বেদের উপদেশ—পরমাত্মাই বিশ্বজগতের পরম কারণ। পরমাত্মার অবস্থা দ্বিবিধ প্রতীয়মান হয়—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক. ইহার ব্যবহারিক অবস্থা ত্রিগুণময়ী ; ব্যবহারিক অবস্থাটা আবার বিদ্যমান অন্তর্বহির্ভাবে ও কার্য্যকারণাত্মক এবং পুনঃ পুনঃ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন ও ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন—ইহাই ব্যবহারিক অবস্থার স্বরূপ। ব্যবহারিক অবস্থা পারমার্থিক অবস্থার বক্ষে ধৃত হইয়া করে অবস্থান, বিশুদ্ধ সত্ত্বের হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, পরিণামিভাবের গতি উভয়তোবাহিনী একটী গতি উত্তরবাহিনী বা অন্তর্মুখা, ২য়টী দক্ষিণবাহিনী বা বহির্মুখা, একটী পরাচীনা (ancient) অপরটীপ্রতীচীনা (western) একটী কেন্দ্রাভিগা (centripetal) অপরটা কেন্দ্রাতিগা (centrifugal)। পরিণামিভাব

যখন বহির্মুখ হয় তখন আরম্ভ হয় সৃষ্টি। এই পরিণামভাবই বেদের কর্ম্ম; কিরূপে অব্যক্ত অবস্থা হইতে বক্তাবস্থায় আসে এই বিশ্বজগৎ কিরূপে ঘটে ইহার বিবিধ পরিণাম, অপিচ কিরূপেই বা ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় ইহা যায় ফিরে অর্থাৎ বিশ্বজগতের জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-বিপরিণাম-অপক্ষয়-বিনাশ এই ছয়টী বিকারের (ষড়ভাববিকারের) তত্ত্ব জ্ঞাতব্য।

বেদের কথায় বিশ্বজগৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্য উভয়াত্মক। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা; ইহারাই অগ্নি-সোম, অন্নাদ-অন্ন ইত্যাদি নামে কথিত। অবিকৃতিরূপা ও অখিল বিকারের **মূল-প্রকৃতি** (= ত্রিগুণ-ময়ী শক্তি), এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির উদাসীন **পুরুষ** (= চিচ্ছক্তি), এই উভয় হইতে মহদাদি সপ্ততত্ত্বের (মহত্তত্ত্ব + অহংকারতত্ত্ব + ৫ তন্মাত্র) উৎপত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়ের যোগে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরুষাংশের অবিক্রিয়ত্ব বশতঃ অপিচ প্রকৃত্যংশের বিকারশীলতা বশতঃ প্রকৃত্যংশই প্রপঞ্চাকারে পরিণত। ঋগ্বেদে এই জন্য কথিতা "অর্দ্ধগর্ভা"; মহদাদি সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি অর্দ্ধাংশ (প্রকৃত্যংশ) দ্বারা বিশ্বজগৎ প্রসব করে। মহদাদি **সপ্ততত্ত্বই** সুতরাং, বিশ্ব প্রপঞ্চের আন্তর ও বাহ্য—এই উভয়বিধ পদার্থের রেতঃ-স্বরূপ অর্থাৎ বীজ ও কারণভূত। এই মহদাদি সপ্ততত্ত্ব বিষ্ণুর (= সর্ব্বব্যাপক পুরুষের) একদেশবর্ত্তী (= একপাদাশ্রিত), ইহারা তাঁহারই শক্তি।

"সপ্তার্দ্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্ম্মণি ॥"

ঋগ্বেদসংহিতা, ২।২১।১৬৪

পরমেশ্বর ও তাঁহার শক্তি এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে "দেবতা"-শব্দটী বেদে। পরমেশ্বর স্বীয় মায়া বা শক্তি দ্বারা লোকানুগ্রহার্থ অগ্নি, বায়ু ইত্যাদিরূপে হ'ন আবির্ভূত। দেবতাগণ বস্তুতঃ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, তবে কর্ম্মভেদবশতঃ বহু নামে স্তুত। এক পরমেশ্বর

সোম ও অগ্নি, প্রধানতঃ এই দুই রূপে আছেন বিদ্যমান, এই দু'টীই মূলশক্তি বা দেবতা। আরও, লোকভেদে এক দেবতা তিনরূপেও হ'ন অনুভূত যেমন—পৃথিবীলোকবাসী দ্বারা অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষ লোকবাসী দ্বারা বায়ুরূপে এবং দ্যুলোকবাসী দ্বারা সূর্য্যরূপে। যাঁহাকে জানিলে জীব হয় কৃতার্থ, যাঁহাকে জানিলে জীবের হয় মুক্তি, তাঁহাকে জানিতে হইলে বিশ্বে যত রকম পদার্থ আছে তৎ সমুদয়ই যে পরমেশ্বরের শক্তি—এই জ্ঞানের বিকাশ হওয়ার জন্যই পৃথিব্যাদিকেও "দেবতা" বলেছেন বেদ। চৈতন্যাধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পরিণামই বিশ্বজগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। স্থিতিশীল তমোগুণ-প্রধান পরিণামে চিচ্ছক্তির হয় না বিকাশ, এই জন্য ইহা 'জড়'; পৃথিবী তমোগুণবহুলা।

অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য "দেবতা" নামে কথিত বটে, কিন্তু ঠিক ইঁহারাই ন'ন দেবতা অর্থাৎ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য ইত্যাদি পদার্থ সকলের যে রূপ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তাহাই ইঁহাদের সার্ব্বভৌম প্রকৃত রূপ নহে; বেদ অগ্ন্যাদির সার্ব্বভৌম প্রকৃত রূপকে বলিয়াছেন "দেবতা"। অগ্ন্যাদির সার্ব্বভৌম প্রকৃত রূপ এইরূপ যেমন—তমোগুণে বিদ্যমান অগ্নির রূপ, রজোগুণে বিদ্যমান অগ্নির রূপ, সত্ত্বগুণে বিদ্যমান অগ্নির রূপ, অপিচ গুণত্রয়াতীত রূপে বিদ্যমান অগ্নির রূপ ইঁহার **সার্ব্বভৌমরূপ**; সার্ব্বভৌমরূপ বলিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে। গুণত্রয়ের তারতম্যে পরিণামের হয় অনন্ত ভেদ; সর্ব্বাত্মক অগ্নি আছেন বিদ্যমান সর্ব্বত্রই **অন্তর্য্যামিরূপে** এবং আরও **অন্তরযামি-রূপে।**

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ বলিতে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই গুণ-ত্রয়কেই লক্ষ্য ক'রেছেন বেদ। সাংখ্যের কথায় দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ববহুল, মধ্য বা অন্তরিক্ষ রজোবহুলা এবং পৃথিবী তমোবহুলা।

অথর্ব্ববেদের কথায়—দ্যুলোকে, ভূলোকে এবং অন্তরিক্ষলোকে (দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যবর্ত্তী) যিনি অনুপ্রবেশপূর্ব্বক করেন সঞ্চরণ, যিনি অভিব্যক্ত হ'ন **তড়িদ্‌রূপে**, যিনি জ্যোতিশ্চক্রে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক করেন সঞ্চরণ, যিনি বর্ত্তমান লোকত্রয়ব্যাপিকা দিক্ সকলের অন্তরে অন্তরে, যিনি বিদ্যমান সর্ব্বজগতের আধারভূত—সূত্রাত্মা বায়ুতে, সেই বিশ্বজগতের অনুগ্রাহক অগ্নির উদ্দেশ্যে করা হউক হোম।

অতএব বলিতে পারা যায়—বেদব্যাখ্যাত শক্তির রূপ যথাযথ ভাবে দেখিতে হইলে, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়ের, যে-কর্ম্মের বৈচিত্র্য বশতঃ গুণত্রয়ের অনন্ত বিচিত্রতা হইয়াছে সেই-কর্ম্মের এবং চিচ্ছক্তির (= চিন্ময় পুরুষের) সার্ব্বভৌম প্রকৃতরূপ দেখা চাই।

সত্ত্বগুণ প্রকাশসমর্থ, রজোগুণ প্রবৃত্তি বা পরিচালনসমর্থ, এবং তমোগুণ নিয়মন বা প্রতিবন্ধসমর্থ। গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, অন্যোন্যমিথুন-বৃত্তিক, এবং অন্যোন্যজননবৃত্তিক। একটী গুণ অপর গুণদ্বয়কে অভিভূত করিয়া স্বীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

সংক্ষেপতঃ পুনরুক্তিতে বলা যায়—শক্তি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, (১) যদ্দ্বারা—কোনরূপ কর্ম্ম কৃত হয়, (২) যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হবার যোগ্য, (৩) যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্ম্মীর বা দ্রব্যের ধর্ম্ম, (৪) যাহা কারণের আত্মভূত, (৫) যদ্দ্বারা জয় করা যায় **পরলোক** অর্থাৎ যদ্দ্বারা নিরোধ হয় পুনর্জ্জন্মের, এবং হইতে হয় না উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত দুঃখসঙ্কুল ভবপারাবারে, (৬) যদ্দ্বারা অতিক্রম করিতে পারগ হওয়া যায় **মৃত্যুর** বা পরিবর্ত্তনের রাজ্য – তাহাই শক্তি। শক্তিমহিমার শেষোক্ত দফা দু'টীর অভিপ্রায় অনেকেই বুঝিবেন-না ব'লে মনে হয়। তাঁরা হয় তো পরলোকের অস্তিত্বেই বিশ্বাসবান কি না—সন্দেহ। যাই হোক উহা এখানে আলোচ্য বিষয় নহে। তবে এইানে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে—পরলোকের জয়কে কথান্তরে বলে পরিণামের পরিসমাপ্তি।

যেরূপ কর্ম্ম বা শক্তি দ্বারা পরিণামক্রমের হয় পরিসমাপ্তি, সেইরূপ কর্ম্ম বা শক্তিই পরলোক জয়ের কারণ। কারণের যাহা আত্মভূত তাহা শক্তি, এবং শক্তির যাহা আত্মভূত তাহা কার্য্য; কথান্তরে কারণ, শক্তি ও কার্য্য—ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে।

ইতিপূর্ব্বে বহুলশঃ কথিত যে শক্তির প্রকাশিত অবস্থা, তার নামই কর্ম্ম; সেই কর্ম্ম দ্বিবিধ:—(১) প্রবৃত্তিমূলক, (২) নিবৃত্তি মূলক; (১) ব্যুত্থানশক্তির প্রবলতায় হয় প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম। (২) নিরোধশক্তির প্রবলতায় হয় নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম;

প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রান্তবিন্দু; সকল প্রবৃত্তিকেই একদিন নিবৃত্তি-বিন্দুতে হবে পৌঁছাতে। যে কোন একটী দৃশ্যমান কর্ম্মকে যদি পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা যায়, তাহ'লে বোঝা যাবে—নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য। পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তির নাম **পরলোক জয়।** ইহলোক-বাসী তথা জগৎবাসী সত্তানুসন্ধানীকে করিতে হইবে পরলোকজয় অর্থাৎ পরলোককে অধিকার করিয়া তথায় সানন্দে বসবাস করার বা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যই হবে তাঁর। বিশুদ্ধ সত্ত্বের (= সন্মাত্র পদার্থ) উপরি রজঃ ও তমঃ এই গুণ বা শক্তিদ্বয়কৃত বিকারই এই জগৎ (= ইহলোক); রাসায়নিক (chemical) ও প্রাকৃতিক (physical) এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনের স্বরূপ চিন্তায় বোঝা যায়—এই উভয়বিধ পরিবর্ত্তনই ত্রিগুণপরিণাম। "পৃথিবীত্ব" ও "জলত্ব" বলিতে সংসর্গ-বৃত্তিক শক্তির (Aggregative Power – attraction) প্রবলতাই বোঝায়, আর ভেদবৃত্তিক শক্তির (Separative Power—repulsion) প্রবলতাই "তেজঃ" ও "বায়ু" পদার্থ। শাস্ত্রের উপদেশ—সর্ব্বাধার বা মূলাধার (= Hold-All) আকাশ হইতে বায়ুর (গতিই বায়ুর ধর্ম্ম বা গুণ বা শক্তি), বায়ু হইতে তেজের এবং তেজঃ হইতে জলের, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এক সত্ত্বের উপরই ভেদবৃত্তিক ও সংসর্গবৃত্তিক—এই দ্বিবিধ শক্তিকৃত বিবিধ উপরাগই (impre-

ssions) বিবিধ গুণ। পঞ্চভূত ত্রিগুণপরিণাম ; স্থানব্যাপকতার (Extension) রূপ চিন্তা করিলে, আকাশ ও বায়ু—এই ভূতদ্বয়ের রূপ বুঝিতে পারা যায় এবং এইরূপে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পঞ্চভূতেরই উপলব্ধি করা যায়। পঞ্চভূত গুণত্রয়েরই কার্য্য ; পতঞ্জলি মুনির উপদেশ—পঞ্চভূতের প্রত্যেকটীর পঞ্চবিধ-অবস্থার (স্থূল + স্বরূপ + সূক্ষ্ম + অন্বয় + অর্থবত্ত্ব) স্বরূপ দেখাইবার জন্য তিনি যাহা ব'লেছেন, তাহা হইতে পঞ্চভূত যে ত্রিগুণের কার্য্য, গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারেই যে পঞ্চভূতের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে—তাহা সপ্রমাণ হয়। তিনি আরও ব'লেছেন—পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বিদিত হ'য়া যিনি ইহাদের উপরে যোগশাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মানুসারে সংযম করিতে পারেন, তিনি হ'ন **ভূতজয়ী** ; তাঁহার অণিমাদি অষ্টভূতের (অষ্টৈশ্বর্য্যের) হয় বিকাশ।

এইরূপে পঞ্চভূতজয়ী ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাহায্যে পারগ হ'ন ত্রিশক্তি তথা ত্রিগুণ (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ) জয়ে ; একে-একে তমোগুণ ও রজোগুণ পূর্ণ জয় ক'রে সত্ত্ব (= সৎ + ভাবে ত্ব) গুণে পৌঁছিয়া সাধক বর্জ্জন করিতে অভ্যাস করেন সর্ব্বভাব যায় সৎ ভাব পর্য্যন্ত যখন হ'ন তিনি সংস্কৃত এবং ক্রমশঃ সৎ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম = সত্তর (= সৎ + তর ; তর প্রত্যয়ে আপেক্ষিক) এবং অন্তে পৌঁছান সাধক সত্তম (= সৎ + তম—তম প্রত্যয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আতিশয্যবোধক পদ) অবস্থায় যাহার সংলগ্ন প্রতিবেশী লোক = ঐ পরলোক, সাধকের লক্ষ্যস্থল—সত্যলোকের পরপারে যেখানে পরিণাম ক্রমের পরিসমাপ্তি ও শাশ্বত পরানন্দ চিরবিরাজিত ; এবং সাধক হ'ন ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠ।

এই সত্তমেরই কোলে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় হ'ন একীভূতা ও শোষিতা শক্তি দেবী ; ইহাই তার পরিণতি—যেন স্পঞ্জ পদার্থের (sponge) জলশোষণ রূপ।

বৈদিক আর্য্যরা যখন রোগনিবারণ এবং অন্যান্য ব্যবহারিক উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য বিবিধ সাংযৌগিক বস্তু করিতেন প্রস্তুত, তখন তাঁহারা যে পঞ্চভূত বলিতে মাত্র স্থূল মাটী=কাদা-জল-আগুন ইত্যাদি বুঝিতেন না, তাঁদের যে গণিতের জ্ঞান ছিল, তাহা স্বীকার্য্য।

ইহলোকের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শক্তির বহুবিধ কর্ম্ম বহুবিধ নামে বিদিত, যথা ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেয়া যায়—তথাকথিত নির্গুণ ব্রহ্মে আবির্ভাব হ'লেন ইচ্ছাশক্তি—ব্রহ্মশক্তি—ব্রহ্মমহিষী =আদ্যাশক্তি তথা মহতী চিতিশক্তি। সেই ব্রহ্মশক্তির যে অবান্তর শক্তিপ্রভাবে ঐ অখণ্ডসত্তা (=অখণ্ডৈকরসসত্তা) হয় খণ্ডীকৃত অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড সত্তায় হয় বিভক্ত এবং আরও হয় প্রকাশিত বিষয়াকারে তাঁহাকেই শাস্ত্র বলেন মহামায়া। মহামায়া-শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ হইতে বোঝা যায় এইরূপ :—মায়া=মাত্রা-মাপ বা পরিমাণ করা অর্থে √মা+য ণ+স্ত্রিয়াং আপ ; অর্থাৎ যে শক্তি অখণ্ড-অনন্ত-অসীম ব্রহ্মকে আপন রুচিমত গণ্ডীর ভিতর পরিমাণ-পরিমাপ ক'রে দেখান্ ভেল্‌কি সান্ত-সসীম-খণ্ডাকারে সেই শক্তিই মায়াশক্তি এবং মহতী মায়াশক্তিই মহামায়া। মায়াকল্পিত যে "ইন্দ্রজাল" তথা ইন্দ্রিয় জাল বা ষট্‌কোণবিশিষ্ট কোষসমূহের বিস্তৃত সমষ্টি (মৎস্যজালবৎ) —ইন্দ্রিয়গণের জাল বা ষট্‌কোণ বিশিষ্ট কোষসমষ্টির সূত্রাবরক তাহা অজ্ঞান-অবিদ্যা রচিত। এক সত্য বা ব্রহ্মব্যতীত কোথাও কিছুই নাই —এই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া অজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিয়া, অবিদ্যায় লীলা-কৈবল্যবশতঃ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহরাজ্যের রাণীর অভিনয় করিতেছেন ঐ ব্রহ্মশক্তি মহামায়া।

সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিষয়-বৃত্তি (দৈবিক ও আসুরিক) ও এই বিশ্বরূপই সেই মহামায়ারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্ফুরণমাত্র।

বিজ্ঞানবিশেষের বিশিষ্ট নাম তালিকায় প্রদত্ত হইল প্রাচ্যশাস্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র মিশ্রিত শব্দ কোষাবলী যথা :—

আদ্যাশক্তির (Primordial Energy) অবান্তর ভেদ—

প্রাণশক্তি ; ইহার অধস্তন—জীবনীশক্তি, জননশক্তি, ধারণশক্তি, পালনশক্তি, বিমোহিনীশক্তি, প্রণাশিনীশক্তি, স্মৃতিশক্তি, ধৃতিশক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য নামধেয় শক্তি।

আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তি ENERGY কথিত হয় অবস্থাবিশেষে POWER ও FORCE নামেও। গতির আরম্ভক বা প্রবর্ত্তক শক্তি (moving force)। গতি বা বেগবর্দ্ধন শক্তি (accelerating force)। প্রতিবন্ধক শক্তি (Resisting force), প্রতিরোধক শক্তি (Retarding force)। স্থিতিবিজ্ঞানের (Statics) চাপ-ভার-পেষণশক্তি (Pressure) গতিবিজ্ঞানের (Dynamics) motion—Starting or Changing আকর্ষণশক্তি (Attraction), বিপ্রকর্ষণশক্তি (Repulsion) মহাকর্ষণশক্তি (Universal Attraction) সার্ব্বত্রিক বিপ্রকর্ষণ (Universal Repulsion) নববিধ গতিশক্তি (প্রবৃত্তিশক্তি) :—

১। ক্রিয়মাণ (Kinetic), ২। মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation), ৩। তাপশক্তি (Heat), ৪। স্থিতিস্থাপক Elasticity), ৫। সংহতিশক্তি (Cohesion energy), ৬। রাসায়নিক শক্তি (Chemical) ৭। তাড়িতশক্তি (Electrical), ৮। চৌম্বকশক্তি (magnetic energy) ৯। বিকীর্য্যমানশক্তি (Radiant)॥

সংসর্গবৃত্তিক শক্তি (aggregative power) ও ভেদবৃত্তিকশক্তি separative power এই উভয়কে ভাগকরা হ'য়েছে ৪ ভাগে যথা :—

(ক) মূর্ত্তাবচ্ছিন্ন বা সাংস্থানিক শক্তি (molar—pertaining to mass, aggregative but not molecular) যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (gravitation)। (খ) আণবিক বা অণ্বচ্ছিন্ন শক্তি (molecular) যেমন সংহতি (cohesion) (গ) পারমাণবিক বা পরমাণ্বচ্ছিন্ন শক্তি (atomic) যেমন রাসায়নিক (chemical affinity (ঘ) বৈদ্যুতিক শক্তি (electric energy)।

শক্তি (Force) কোন পদার্থ—তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, উহা অজ্ঞেয়—অনির্দ্দেশ্য পদার্থ। জড় পদার্থ কি, গতি কি—তাহা চিন্তা করিলে মনে হয়—জড় পদার্থ ও গতি হয় শক্তিরই প্রব্যক্ত অবস্থা ভেদ ; শক্তিদ্বারাই জড় পদার্থের বা গতির স্বরূপ নিরূপণ করা যায়, কিন্তু শক্তি স্বয়ং কোন বস্তু তাহা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। কাহার মানে শক্তি (Force) পদার্থের স্বরূপ অবধারণ করা যাবে তাহা দেখা যায় না। শক্তিই বস্তুতঃ সকল পদার্থের **চরম মানদণ্ড ;** শক্তিকে সাক্ষাত পরিমাণ করার কোন সাক্ষাত উপকরণ বা মানদণ্ড নাই। শক্তি সাতত্যই সর্ব্ব কার্য্যের কারণ।

আরও, শক্তি (energy) দ্বিবিধ—(ক) উদিত, ক্রিয়মান (kinetic) যেমন অধঃপতনশীল দ্রব্যের, কামানের চলনাত্মক গোলা। (খ) শান্ত (potential) যেমন স্প্রিং, বেত, উন্নমিত দ্রব্যের অধঃ-পতনকালে উহার গুরুত্ব যে-কর্ম্ম করে।

যন্ত্র ব্যতিরেকে শক্তি কখনও কর্ম্ম করিতে পারে না। মাত্র-তমোগুণ-প্রধান ভৌতিকরাজ্যের কলকারখানার যন্ত্রের মত জীবরাজ্যের জীব-শরীরই জীবের যন্ত্র। 'যন্ত্র'-শব্দটা নিষ্পন্ন এইরূপ—সংযমন-বা-সঙ্কোচ-নার্থক √"যন্ত্রি" + অচ্ ; 'যদ্দারা' কোন কিছু নিয়ন্ত্রিত বা সংযমিত হয় তাহাকে বলে যন্ত্র। যে কোনরূপ ক্রিয়া হউক, তৎসম্পাদনে চাইই 'যন্ত্র' ও 'শক্তি' এই দুই ; আরও, চাই তাহাতে ত্রিবিধ শক্তি—সত্ত্ব-রজঃ তমঃ। সংযমন (Resistance—Retardation) স্থিতিশীলতমোগুণ বা শক্তির কার্য্য। অতএব যন্ত্র তমোগুণপ্রধান পরিণাম ; যন্ত্র তামসশক্তি। শক্তি যন্ত্রগতা হইলেই, করে কার্য্য, নচেৎ কোন কর্ম্ম করিতে হয় না সমর্থ ; কথান্তরে, কোন শক্তি অপর বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা বাধিত না হইলে, উহার কার্য্যকারিতা হয় না উত্তেজিত। যখন জীবশরীরকে কোন শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয়—কোনরূপ বাধা অতিক্রম করিতে হয় তখনই সে বোঝে তাহার শরীরে আছে কত

শক্তি। শক্তির এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হওয়ার, অথবা উহার কার্য্যকারিতা সম্বর্দ্ধন-ও-নিয়মনোপায়ের নামই যন্ত্র।

পক্ষান্তরে, যাহা ভোগায়তন—যাহা শক্তির আধার বা আশ্রয় তাহাকে বলে 'শরীর'; আরও, যাহা চেষ্টার (= হিতপ্রাপ্তি-ও অহিত পরিহারযোগ্য ব্যাপারের আশ্রয়, যাহা আরও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন সুখ-দুঃখের আশ্রয়, তাহা শরীর। আরও, চেতনাধিষ্ঠিত-ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত-বিকার সমূহাত্মক পদার্থকেও অন্যে বলেছেন "শরীর"। 'শরীর'-শব্দ নিষ্পন্ন এইরূপ—বধ করা তথা শীর্ণ হওয়া অর্থে √শৃ + ঈয়ম্ র্ম্ম; ইহার প্রতিশব্দ 'সংহনন্'—যাহা হয় সংহত অর্থাৎ পরপ্রয়োজনে (পরার্থে) সংসৃষ্ট হয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুপদার্থের মিলনে হয় উৎপন্ন।

যাই হোক, মনুষ্য-শরীরের কর্ম্মতত্ত্বই এখানে অনুসন্ধেয়। পূর্ব্ব-কথিত "যন্ত্র"-ই এই শরীর; যে কোনরূপ কর্ম্মই হউক তন্নিষ্পত্তিতে চাই এই শরীররূপ যন্ত্র ও শক্তি। তত্ত্বতঃ মনুষ্য-জীবন নানা জাতীয় শক্তির অভিব্যঞ্জনাত্মক এবং মনুষ্যশরীর-যন্ত্রসমূহ ঐ সকল শক্তির অভিব্যক্তিকরণ (Instrument)।

শাস্ত্রের উপদেশ—শরীর ত্রিবিধ (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ); বেদান্তের পঞ্চকোষ বা Sheath (= অন্নময় + প্রাণময় + মনোময় + বিজ্ঞানময় + আনন্দময়)—ইহাদের মধ্যে (i) অন্নময়কোষ হয় স্থূল-শরীর, তামস অর্থাৎ তমোগুণপ্রধান ও তমোগুণের আধিক্যে উৎপন্ন, তাই অন্নময়-কোষ জাড্যবহুল; (ii) প্রাণময়কোষ—রাজস বা রজোগুণবহুল, তাই প্রবৃত্তি-বা-ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট, (iii) মনোময়কোষ (iv) বিজ্ঞান-ময়কোষ ও (v) আনন্দময়কোষ এই তিনটাই সাত্ত্বিক বা সত্ত্বগুণপ্রধান বটে, তবে সকলেই সমান সাত্ত্বিক নহে; যেমন—তমোমিশ্রসত্ত্বগুণ মনোময়কোষের কারণ, রজোমিশ্রসত্ত্বগুণ বিজ্ঞানময়কোষের কারণ এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণ আনন্দময়কোষের কারণ। মনোময়কোষ প্রাণময়-কোষের ভিতর বলিয়া অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের অপেক্ষাকৃত প্রত্যাসন্ন

(=নিকটবর্ত্তী) বলিয়া, ইহাতে (এই মনোময়কোষে) সর্ব্বান্তর আত্মচৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়; স্থূলদর্শী মানব এইজন্যই মনোময় কোষকেই "আত্মা" বলিয়া ভুল করে। ক্রিয়াশক্তির যেরূপ আপাদমস্তক ব্যাপ্তি হয় উপলব্ধ, জ্ঞানশক্তিরও সেইরূপ আপাদ-মস্তকব্যাপ্তি হয় উপলব্ধ। সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এই মনোময় কোষের অন্তর্ভূত। বুঝিতে হইবে—ক্রিয়াশক্তিবৎ সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে জ্ঞানশক্তি এবং মাত্র মস্তিষ্কই যে জ্ঞানশক্তির আধার—আশ্রয় বা অধিকরণ তাহা নহে।

এক জ্ঞানশক্তির ত্রিগুণতারতম্যবশতঃ করণশক্তি (সত্ত্ব), কর্ত্তৃশক্তি (রজঃ)-ও ভোগশক্তি (তমঃ) এই ত্রিবিধভেদ। মনঃ করণশক্তি হইতে উৎপন্ন এবং তমোমিশ্রসত্ত্বগুণ মনোময়কোষের কারণ। কাম-সংকল্প বিচিকিৎসা-তৃষ্ণা-রাগ-লোভ ইত্যাদি করণশক্তিজন্য মনের বিকার বা বৃত্তি।

পাতঞ্জলদর্শনের কৈবল্যপাদ ২৩ সূত্রের উপদেশ—চিত্তবস্তুটী, দ্রষ্টা (=পুরুষ বা চিচ্ছক্তি) ও দৃশ্য (শব্দাদি বিষয়-ও-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ) এতদুভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া, প্রকাশ করে সকল বিষয়কে। চিত্তকে মনঃ ধরিলে মনঃ মন্তব্য (জ্ঞেয়—cbject)-পদার্থে উপরক্ত অর্থাৎ মন্তব্যপদার্থাকারে আকারিত হয়, অপিচ ইহা (স্বয়ং বিষয় বা দৃশ্য বলিয়া) বিষয়ী-বা আত্মার সহিত স্বীয় বৃত্তি-সহকারে অভিসম্বদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্ত বিষয় ও বিষয়ী (object aud subject) এই উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয় বলিয়া, বিষয় ও বিষয়ী এইউভয়রূপেই হয় ভাসমান; বিষয়াত্মক (পুরুষ-বা-আত্মার দৃশ্য) হইয়াও, অবিষয়াত্মকরূপে—স্বয়ং দৃষ্ট (subject)-ভাবে, অচেতন হইয়াও চেতনরূপে হয় প্রতিভাত এবং কথিত হয় প্রতিবিম্বোদ্‌গ্রাহিস্ফটিকমণিবৎ সর্ব্বপদার্থের অবভাসক। চিত্ত আত্মার সমানাকার ধারণ করে বলিয়া, কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ চিত্তকেই বলেন চেতন, এবং চিত্তের বাহিরে আত্মা নাই, চিত্তই এক

মাত্র আত্মা, দৃশ্যমান বস্তুসকল চিত্ত ছাড়া অন্য কিছু নহে, চেতনাচেতন জগৎ বিজ্ঞানবিজৃম্ভণ (বিস্তার) ইত্যাদি অসার উক্তি করেন। চিত্ত বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়রূপেই ভাসমান, তাই ঐ স্বল্পজ্ঞান লোক চিত্তকেই আত্মা বলিয়া মনে করে।

চিত্ত ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ চিত্তের পরপারে আত্মনামক পদার্থের রূপ স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না এবং অনুমাননেত্রেও ইহা যথাযথভাবে হয় না পতিত। আত্মদর্শন করিতে হইলে চাই সমাধি; সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই সত্য, ইহাতে নিত্যযুক্ততা উপলব্ধি করাই সমাধি।

লিঙ্গ-বা-সূক্ষ্মশরীরের তত্ত্ব না জানিয়া, কোষচতুষ্টয়ের (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়) স্বরূপ না দেখিলে, শরীর-মনঃ- আত্মা এই তিন পদার্থের তত্ত্ব যথাযথভাবে জানা যায় না। স্থূল শরীর = অন্নময় কোষ, সূক্ষ্মশরীর = (প্রাণময় + মনোময় + বিজ্ঞানময়)-কোষ এবং কারণশরীর = আনন্দময় কোষ।

স্থূলশরীরযন্ত্র-ও-তন্নিষ্ঠ শক্তিসমূহের তত্ত্বে দেখা যায়—শরীর রক্ষিত হয় ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারা যথা, বিসর্গ (=ত্যাগ)—আদান (= গ্রহণ)-বিক্ষেপ (= শীতোষ্ণাদির বিবিধপ্রকারে চাঞ্চল্য)। যে শক্তিদ্বারা ধৃত হয় শরীর তাহাকে বলে "**প্রাণশক্তি**" ; এই প্রাণশক্তি ত্যাগ-গ্রহণ-চাঞ্চল্য (স্পন্দন), এই ত্রিবিধ ক্রিয়াত্মিকা। সপ্রাণ শরীর ধারণার্থ ত্যাগ-গ্রহণ সংক্ষেপতঃ এই দ্বিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

শরীরযন্ত্র সমূহের উৎপত্তি যথা প্রয়োজনে হইয়াছে। মনুষ্যশরীর যে সকল কর্ম্ম সম্পাদনার্থে গঠিত, সেই সকল কর্ম্মনিষ্পত্তির জন্য যত সংখ্যক-ও-যতপ্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন, মনুষ্য শরীরে ঠিক তত সংখ্যক-ও-ততপ্রকার যন্ত্র আছে। আধুনিক বিজ্ঞান তাহার সবিশেষ উপদেশ দেন বর্ত্তমানে। এখানে উহা আলোচ্য বিষয় নহে।

প্রাচ্যশাস্ত্রের উপদেশ—বিশ্বজগৎকে বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় মাত্র দ্বিবিধ পদার্থ যথা দৃশ্য ও দ্রষ্টা।

১ম্—দৃশ্য (object)=প্রকৃতি (= প্রকাশশীল সত্ত্ব + ক্রিয়াশীল রজঃ + স্থিতিশীল তমঃ) ও তদ্বিকার (মনঃ + ইন্দ্রিয় + ভূত + ভৌতিক-পদার্থ) **২য়—দ্রষ্টা** = ভোক্তা (subject) = চিন্ময়পুরুষ।

১ম্—দৃশ্যঃ—পুরুষের ভোগ-ও-অপবর্গ (মুক্তি) সম্পাদনার্থ ত্রিগুণাত্মিকা **প্রকৃতি** স্থূল-সূক্ষ্মভূত-ও-ইন্দ্রিয়রূপে হ'ন পরিণতা। অতএব পুরুষের সুখ-দুঃখভোগ-ও-অপবর্গই প্রাকৃতিক পরিণামের উদ্দেশ্য।

অন্নময় কোষ তমোগুণপ্রধান পরিণাম, প্রাণময় কোষ রজোগুণপ্রধান পরিণাম, আর, সত্ত্বগুণপ্রধান পরিণাম=(মনোময় + বিজ্ঞানময় + আনন্দময়কোষ) ; ফলতঃ গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু। মানুষের শরীরে জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি ও পোষণশক্তি প্রধানতঃ এই ত্রিবিধশক্তির হয় ক্রিয়া। তাই শরীরযন্ত্রসমূহ প্রধানতঃ ত্রিবিধ যথা জ্ঞানশক্তি যন্ত্র, পরিচালনযন্ত্র ও পোষণযন্ত্র। পোষণকার্য্য ও প্রাণনক্রিয়া একই।

যন্ত্রচালনে চাই অগ্নি। শরীরযন্ত্র নিরন্তর করে ক্রিয়া, ক্রিয়াতে হয় ক্ষয়, এবং ক্ষয়ের পূরণার্থ চাই আহার। অথর্ববেদের কথায়—"সূর্য্য স্বীয় এক ওজকে (= তেজঃ-বা-শক্তিকে) বায়ু-অগ্নি-সোম এই ত্রিধা বিভাগ পূর্ব্বক ধারণ ক'রেছেন এই জগদ্দেহ ; সূর্য্যই বাত-পিত্ত ও-শ্লেষ্ম-লক্ষণ যুক্ত দোষত্রয়রূপে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছেন বিদ্যমান" ; এই বেদবাক্যের প্রতিধ্বনিতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকও বলেন—"জীবদেহে যে সকল শক্তি আছে তাহা আসিয়াছে উদ্ভিদরাজ্য হইতে, ঔদ্ভিদশক্তি আবার সূর্য্যপ্রসূত ; অতএব সূর্য্যই সর্ব্বপ্রকার জৈবশক্তির কারণ। আবার মাধ্যাকর্ষণই সৌরতাপ-ও-সৌরালোকের উৎপত্তিকারণ। অতএব মাধ্যাকর্ষণই সম্ভবতঃ সমগ্রজীবনী শক্তির আদ্যরূপ। মাধ্যাকর্ষণ বস্তুতঃ ত্রিগুণপরিণাম—ইহা সাংস্থানিকসংসর্গবৃত্তিশক্তি। মাধ্যাকর্ষণ ও আণবিক-আকর্ষণ স্বরূপতঃ এক। ত্যাগ-গ্রহণ এই দুইকার্য্য নিষ্পন্ন হয় দ্বিবিধক্রিয়া দ্বারা - প্রসারণ (expansion) ও আকুঞ্চন

(contraction)। সোমশক্তির কার্য্য আকুঞ্চন এবং অগ্নি-বা-তাপ শক্তির কার্য্য প্রসারণ। অতএব সোম ও অগ্নি এই দ্বিবিধ উপশক্তি দ্বারাই যথাক্রমে গ্রহণ ও ত্যাগ এই দুই কার্য্য হয় প্রাণশক্তির। প্রাণশক্তির একমাত্র আধার সূর্য্য ; যে বরণীয়-ভর্গ বা ব্রহ্মজ্যোতি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে সম্যক্‌ভাবে ওতপ্রোত রহিয়াছেন, তাঁহারই বিশিষ্ট বিকাশক্ষেত্র সূর্য্য ; তাই ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্রে সেই বরণীয় ভর্গের উপাসনা করিতে গিয়া, সূর্য্যকেই তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে করেন গ্রহণ। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি বাক্যব্যয়ে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সঞ্চালনে, প্রত্যেক চিন্তায় মানুষের যে প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হয়, এক মাত্র সূর্য্য হইতেই, তাহা তাহারা পুনরায় লাভ করিয়া আপন অস্তিত্ব উদ্‌বুদ্ধ রাখিতে হয় সমর্থ। তাই কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে, কি সাধনাক্ষেত্রে, একমাত্র সূর্য্যই জীবের সর্ব্ব প্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন। গর্ভস্থ শিশু যেমন নাভিসংযুক্ত নাড়ী দ্বারা মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসপ্রবাহে হয় পরিপুষ্ট, তেমন মানুষের নাভিচক্রে (= মণিপুর কেন্দ্রে) সূক্ষ্ম সূত্ররূপী জ্যোতির্ধারা অবলম্বনে প্রতিনিয়ত আসিতেছে সূর্য্য হইতে **প্রাণশক্তি**রূপ রসপ্রবাহ, তাহারই ফলে জীব থাকে সঞ্জীবিত। এই পরিদৃশ্যমান সূর্য্যই তাহার জগদ্‌ব্যাপক **পিতৃস্থানীয়**; আরও, প্রাণ = ক্রিয়াশক্তি বা-রজোগুণপ্রধান-প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিতচিচ্ছক্তি ; এই প্রাণ স্বীয় রূপকে দুই প্রকারে ধারণ করেন, যেমন—(ক) শরীরে প্রাণ আপনাকে প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ুতে বিভক্ত হইয়া আছেন ইনি ; (খ) ব্রহ্মাণ্ডকরণ্ড (= কোটা) মধ্যে জগদবভাসক আদিত্য রূপে আছেন ইনি। পাশ্চাত্যপণ্ডিতের স্থূল দৃষ্টিতে প্রাণ সূর্য্য-প্রসূত ; কিন্তু শ্রুতির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রাণবস্তু সূক্ষ্মতম কারণের অঙ্কশায়ী সর্ব্বব্যাপী জগৎব্যাপক চিৎশক্তি, যাহাতে জগৎ অবস্থিত—যে চৈতন্য জগৎপ্রতীতিবিশিষ্ট সেই চৈতন্যেরই নাম বিষ্ণু বা প্রাণশক্তি। "প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্"। আবার, ছান্দোগ্য-উপনিষদে

প্রাণের উপাসনা-প্রস্তাবে উক্ত যে, প্রাণই জগদ্‌গ্রাসকারী বা সর্ব্বভাবের বিলয়কারক; বস্তুতঃ ইহা প্রত্যক্ষও হয়—কি জ্ঞানেন্দ্রিয়-**শক্তিপ্রবাহ**, কি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, কি জনন-মরণাদি পরিবর্ত্তন-প্রবাহ সবই প্রাণশক্তি আশ্রয়ে প্রকটিত সুতরাং তাহাতেই হয় প্রলীন। তাই প্রাণই আবার **"হরি"**। মানুষ যতদিন এই প্রাণের সন্ধান না পায়, যতদিন প্রাণকে হরি বলিয়া, কিংবা হরিকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে না পারে, যতদিন আত্মপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, ততদিন গগনভেদিরবে হরিনাম উচ্চারিত হইলেও সে পায় না অমরত্বের বা অভয়পদের সন্ধান !!

২য়—দ্রষ্টা—প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ভূত এই সকল পদার্থ চৈতন্যাধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছিন্ন অবস্থা। যিনি পৃথিব্যাদি ভূতসকলে আছেন, উহাদের যিনি অন্তর, যাঁহাকে উহারা জানে না, যাঁহার শরীর পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী অর্থাৎ ইহাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে করেন পরিণামিত যথাযোগ্যপরিণামে, এইরূপ যিনি প্রাণে, বাক-পাণ্যাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ে, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, মনে ও বিজ্ঞানে করেন অবস্থান, যিনি প্রাণ-মনঃ-ও-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অন্তর কিন্তু যাঁহাকে জানে না প্রাণ ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি; যাঁহার অধিষ্ঠান বা শরীর ইহারা, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী, তিনিই সত্য—তিনিই পূর্ণ, তিনিই অমৃত। সর্ব্বব্যাপক প্রাণশক্তির অঙ্কশায়িত প্রাণতুল্য যে দ্বিতীয় শক্তি, তাহার কার্য্য মাত্র জীবরাজ্যে। প্রাণরাজ্যে জীবনীশক্তি এবং আণবিক-পারমাণবিক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ শক্তি যেন করিতেছে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। জীবনীশক্তি ও রাসায়নিকশক্তি (আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ) নিঃসন্দেহেই ভিন্ন পদার্থ। জীবদেহে ভৌতিক-ও-রাসায়নিক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের ক্রিয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা নির্জ্জীবদেহে যে ভাবে হয়, সজীবদেহে ঠিক সে ভাবে হয় না। সজীব আহার আহরণ করে বহির্দ্দেশ হইতে, আহৃত দ্রব্যকে যথাপ্রয়োজন পরিণামিত করে

রসাদিতে, আপন দেহের রক্ষণ-বা-পোষণার্থ যে-যে অঙ্গে যে-যে দ্রব্যের যাবন্মাত্রা বিতরণ আবশ্যক, তত্তৎ অঙ্গে তত্তদ্ দ্রব্যের তাবন্মাত্রা করে বিতরণ। এই সব ব্যাপার কেবল রাসায়নিক ব্যাপার হ'তে পারে না। তাই অন্য কোন উচ্চতর শক্তির বশে রাসায়নিক শক্তি সেই উচ্চতর শক্তির নির্দেশানুসারে ক্রিয়া করে জীবরাজ্যে; এই উচ্চতর শক্তিই **জীবনীশক্তি**। সজীবদেহে আছে পরস্পরবিরোধিনী ভৌতিকশক্তি-দ্বয় (আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ) এবং জীবনীশক্তি। জীবনীশক্তি যে, ভৌতিক-শক্তি (=রাসায়নিক শক্তি) হইতে স্বতন্ত্র, তাহার প্রতিপাদনে বলিতে হয়—প্রাণের অভিব্যক্তি নির্নিমিত্ত—আকস্মিক নহে, সন্ততি বা বংশপরম্পরায় ইহার হয় অভিব্যক্তি; সজীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের হয় উৎপত্তি। যে-শক্তি নিয়ত নিবদ্ধ থাকে ভৌতিক পদার্থে, তাহা, এবং পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে সঞ্চরণশীলশক্তি পৃথক্ পদার্থ; কোথা হইতে এই স্বতন্ত্র সঞ্চরণশীলশক্তি আসিল, অদ্যাপি তাহা অজ্ঞাত হইলেও, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কোন পদার্থের আবির্ভাবজ্ঞান না থাকিলে তাহার অস্তিত্বজ্ঞান তাহাতে বাধিত হ'তে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে কথিত—সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের তারতম্যানুসারেই পঞ্চকোষ-বা স্থূলাদিত্রিবিধশরীরের হইয়াছে পরিচ্ছেদ (=ইয়ত্তারূপে নির্ণয়)। জীবের শরীরে যত প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে, তাহাদের সমষ্টিই **জীবাত্মার শক্তি।** জীবশরীরে প্রধানতঃ ক্রিয়া করে ত্রিবিধ শক্তি—পোষণ-বা-প্রাণশক্তি, পরিচালনশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। আরও, জীবশরীরযন্ত্রটা ধৃত হয় ত্রিবিধক্রিয়া বা শক্তি দ্বারা যথা:—(i) বিসর্গ (=ত্যাগ—Excretion or Getting rid of waste matter; (ii) আদান (=গ্রহণ—Ingestion or the taking in); (iii) বিক্ষেপ (=প্রেরণ—Distribution)। আয়ুর্ব্বেদের কথায়—উপরোক্ত তিন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয় বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ

শক্তির দ্বারা; বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার স্বরূপ-চিন্তায় দেখা যায়, ইহারা যথাক্রমে বায়ু-অগ্নি-সোম এই ত্রিতয় সম্পর্কে অথর্ব্ববেদ বলেন, "সূর্য্য স্বকীয় এক ওজকে (= স্বীয় এক তেজঃ বা **শক্তিকে,** বায়ু-অগ্নি-সোম এই ত্রিধাবিভাগপূর্ব্বক ধারণ ক'রেছেন **জগদ্দেহ,** সূর্য্যই বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মালক্ষণ দোষত্রয়রূপে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছেন বিদ্যমান। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, "All the energy of animal is derived from plants. All the energy of plants arises from the Sun. Thus the Sun is the cause, the original source of all energy in the organism, i.e., of the whole of life."

"As the formation of the solar heat and solar light is explicable by the gravitation of masses; GRAVITY is perhaps the original form of energy of all life."

[A text-book of Human Physiology by
Dr. L. Landois.]

ইহার মর্ম্ম—মাধ্যাকর্ষণই সৌরতাপ ও সৌর আলোকের উৎপত্তি-কারণ; অতএব মাধ্যাকর্ষণই সম্ভবতঃ সমগ্র জীবনীশক্তির আদ্যরূপ। এখন Dr. Landois মহাশয়ের উক্তির সমালোচনাতে বলা যায় যে, অদ্যাপি মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপই হয় নাই নিশ্চিত: যাহা স্বয়ং অনিশ্চিত স্বরূপ, তাহা দ্বারা অন্যের স্বরূপ নিশ্চয় কিরূপে হয়? যে স্বয়ং অসিদ্ধ সে অন্যের স্বরূপ হইবে কিরূপে? মাধ্যাকর্ষণ বস্তুতঃ ত্রিগুণপরিণাম, ইহা সাংস্থানিকসংসর্গবৃত্তিশক্তি। আণবিক আকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। আকুঞ্চন (Contraction) ও প্রসারণ (Expansion) এই দ্বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা, আদান ও বিসর্গ এই দ্বিবিধকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। আকুঞ্চন সোমশক্তির, এবং প্রসারণ অগ্নি-বা-তাপশক্তির কার্য্য। অতএব সোম ও অগ্নি এই দ্বিবিধশক্তি দ্বারাই যথাক্রমে গ্রহণ ও ত্যাগ এই দ্বিবিধ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

এই সূত্রে আরও বলা যায় যে, তান্ত্রিকদের কুলকুণ্ডলী বা কুলকুণ্ডলিনীই এই শক্তি—যাহা মূলাধার (Sacro-Coccygeal gangtion) পদ্মগহ্বরে সুপ্তাবস্থায় গুন্-গুন্ শব্দ করে এবং যাহার শ্বাস ও উচ্ছ্বাসের বিবর্ত্তন দ্বারা জগতের জীব থাকে জীবিত; তাই ইহা তন্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পীতুল্য শক্তি বিশেষ—জীবশক্তি। সর্পভূষণ বা সর্পসংস্থিত দেবমূর্তির তাৎপর্য্যও এই সর্পতুল্য প্রবাহময় শক্তির নিদর্শন। ইহার রহস্য এই যে, যে শক্তি ঘনীভূত হইয়া যেরূপ স্থূলমূর্ত্তিতে হয় প্রকট, সেই শক্তির প্রবাহময় অবস্থা সূচনা করিবার জন্যই, ঐ সকল মূর্ত্তির সর্পাভরণ। এই সত্য অনুধাবন করিয়াই জীবভাবীয় শক্তিকে বলা হয় "কুলকণ্ডলিনী"। বস্তুতঃ সাধক যখন বিশিষ্ট ক্রিয়াদি করেন, তখন তিনি প্রত্যক্ষ অনুভবও ক'রে থাকেন—শক্তি প্রবাহটা যেন সর্পগতিতে প্রবাহময় হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে উঠিতেছে, অথবা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে নামিতেছে। এই মূলাধারই কর্ম্মাশয় অর্থাৎ কর্ম্মবীজের আধার বা উৎস; উহাতে অবস্থিত জীবভাব; **এই জীবভাবের নামই কুলকুণ্ডলিনী।** শরীর-ব্যবচ্ছেদবিদ্যায় অনভিজ্ঞ তান্ত্রিক মহাশয়ের কল্পিত একটা সর্প কল্পনা করিয়া সাধু ও অকপট সাধক যেন না হ'ন বিপথগামী। সর্পগতিতে জীবশক্তি হয় ব্রহ্মাভিমুখী তাই উহাকে বলা হয় সর্প। মূলাধারস্থিতা সুষুপ্তা আত্মশক্তি ভুজঙ্গরূপিণী। [পাঠক স্মরণ করুন—প্রতি কর্ম্মপ্রচেষ্টায় পশুপক্ষীদের পুচ্ছ উত্তোলন এবং শ্রমিকদের কঠিন শ্রমে দম্-লওয়া বা দম্সম অবস্থা ; বস্তির নিম্নাংশে (sacro-pelvic area) তান্ত্রিকের "কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ"-শব্দটা আলঙ্কারিক মাত্র ; বস্তুতঃ স্ব-স্ব আত্মশক্তির বৃদ্ধি বা উদ্বোধন করার অভ্যাসই কুল-কুণ্ডলিনী জাগরণ। **শক্তির আশ্রয়**—যিনিই শক্তির আশ্রয়, তিনিই শক্তিমান্। সেই "তিনিই"-মাত্র আছেন ; "তিনিই" "হরিঃ ওঁ তৎসৎ"-র "সৎ" ; তাঁরই কোলে চরাচর বাকি সব আছে। মনে কর একটা

বৃক্ষ দেখিতেছ, 'বৃক্ষ আছে' বলিয়া একটী বোধ পাইল প্রকাশ; ঐ বোধের যে অংশটা 'আছে' অর্থাৎ অস্তিরূপে প্রতিভাত, সেই অস্তিত্বরূপ বোধটাই বৃক্ষরূপ বিশেষণযুক্ত হইয়া প্রতীতিগোচর হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ একটী শক্তিমাত্র বা শক্তিপ্রবাহ মাত্র; কতকগুলি শক্তিপ্রবাহ একত্রিত হইয়া একস্থানে 'বৃক্ষ'-নামে পরিচিত হইতেছে। অতএব স্থির যে বৃক্ষটা বা কতকগুলি শক্তিপ্রবাহের সমষ্টি হ'চ্ছে সেই "সৎ"-র বা 'আছের' বা আদি অস্তিত্বের বিশেষণ। আদি-অস্তিত্ব নির্বিবশেষ; বিশেষণযুক্ত না হইলে প্রকাশ পায় না সেই সৎবস্তু; ঐ বিশেষণই হয় শক্তি এবং সদ্বস্তুটী হয় শক্তিমান্।

শক্তি ও শক্তিমান সম্বন্ধ কথা এই—সচ্চিদানন্দবিভব, স-কল (কলা বা প্রকৃতির সহিত বিদ্যমান) পরমেশ্বর হইতে প্রথমে আবির্ভাব হয় শক্তির। শক্তি, শক্তিমান হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, যেমন—শান্ত-কল্লোল সমুদ্র বাত্যাক্ষোভিত হইয়া যে প্রকার উচ্ছূন বা স্ফীত হয়, সমুদ্রসমুত্থ-তরঙ্গ সমুদ্রসক্ষোদ্ভূত হইয়াও, সমুদ্র হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন না হইয়াও সাধারণতঃ (স্থূলদৃষ্টিতে) যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্নরূপে ধরা হয়, সূক্ষ্মা অব্যক্ত বা সাম্যাবস্থার অবস্থায় বিদ্যমানা প্রশান্ত পরমেশশক্তি সৃষ্টিকালে সেইপ্রকার উচ্ছূন বা স্ফীত হয়েন, অখণ্ডসচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন না হইয়াও স্থূলদৃষ্টিতে পৃথকরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। তিল হইতে যেরূপ তৈল বিনির্গত হয়, আদিসর্গে সেইরূপ সনাতন শিবের—ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে তাঁহা হইতে শিবতত্ত্বৈকসঙ্গতা (ব্রহ্মতত্ত্বৈকসঙ্গতা) পরাশক্তি হয় পরিস্ফুরিত।

শক্তিময় পরব্রহ্ম জগদাকার ধারণ করার সময় 'বিন্দু', 'নাদ', ও 'বীজ', এই ত্রিধা ভিন্ন হ'ন; পুরুষ, প্রকৃতি ও কাল এই ত্রিবিধভাবে বিবর্ত্তিত হ'ন। 'বিন্দু' "শিবাত্মক", 'বীজ' শক্ত্যাত্মক এবং "নাদ" উভয়াত্মক অর্থাৎ শিব-শক্ত্যাত্মক বা কুণ্ডলিনী বা চিদচিদাত্মক। পরা নাম্নী শব্দাবস্থা, শব্দব্রহ্ম ও **চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি** এক

পদার্থ। শব্দব্রহ্মের পরানাম্নী শব্দাবস্থা বা চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে পশ্যন্ত্যাদিরূপে (পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী) আবির্ভূত হন বেদরাশি। শব্দব্রহ্মময়ী কুণ্ডলিনী বা চিচ্ছক্তিই 'পরা'-বাক্ (শব্দের পরাখ্য অবস্থা)। **"পরা"**—নিস্পন্দা 'পরা'-বাক্ (চৈতন্যাভাসবিশিষ্ট মায়া বা প্রকৃতি—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) যখন সস্পন্দাবস্থা প্রাপ্ত হ'ন, যখন তাঁহার সাম্যাবস্থায় হয় বিক্ষোভ, তখনই তাঁহার পশ্যান্ত্যাদি অবস্থার হয় আবির্ভাব। **"পশ্যন্তী"** = শব্দব্রহ্মের পশ্যন্তী অবস্থার জ্ঞানাত্মকত্ব-নিবন্ধন ইঁহার নাম 'পশ্যন্তী'; 'পশ্যন্তী' বাহ্যান্তঃকরণাত্মিকা হিরণ্য-গর্ভরূপিণী। যিনি বেদের 'হিরণ্যগর্ভ', সাংখ্যের 'মহত্তত্ত্ব' তিনিই 'পশ্যন্তী'-নাম্নী শব্দাবস্থা। বেদের কথায়—সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার সকাশ হইতে 'হিরণ্যগর্ভ—তথা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার আবির্ভাব। সেই হিরণ্যগর্ভ ভুবনজাতের একপতি—এক ঈশ্বর; হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত সেই পরমাত্মা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন বিদ্যমান্।

রয়ি-প্রাণ বা **সোম-অগ্নি**ঃ—হিরণ্যগর্ভরূপে বিবর্ত্তিত প্রজা-পতি করিয়াছিলেন **তপঃ** (= জন্মান্তরভাবিত জ্ঞানের শ্রুতি বা বেদপ্রকাশিত অর্থ যে-জ্ঞানের বিষয়, সেই জ্ঞানের করিয়াছিলেন **পর্য্যালোচনা**); এবং তপঃ করিয়া সৃষ্টিসাধনভূত 'রয়ি' ও 'প্রাণ' (সোম ও অগ্নি) এই মিথুনদ্বয়কে উৎপাদন ক'রেছিলেন।

পরমাণুঃ—[পরমাত্মভাবের তপের তথা তাপের ফলে আবির্ভাব হ'লো **বিন্দু** ক্ষণিকের মধ্যে (ক্রিয়ৈব কালঃ); কালই অব্যক্তের প্রথম অভিব্যক্তি = **"ক্ষণ"** (= কালের সূক্ষ্মতম অংশ) এবং 'বিন্দু' (=দেশেরই কাল্পনিক সূক্ষ্মতম অংশ যার নাই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ)। বিন্দুসমষ্টিই পরমাণু। পরমাণু সমষ্টি=অণু→অণু সমষ্টিই = পিণ্ড পিণ্ডসমষ্টিই = ব্রহ্মাণ্ড = **জগৎ**]।

বিন্দু, পরমাণু, অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল পদার্থেই আছে মন,

প্রাণ। বেদের চতুর্ব্বিধ অবস্থার (পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী) স্বরূপ দর্শন এবং চিচ্ছক্তি ও ত্রিগুণতত্ত্বের তত্ত্বাবলোকন আবশ্যক।

'হিরণ্যগর্ভ', 'বেদ', 'সত্যোক্তি', 'প্রাণ', ইহারা অভিন্ন পদার্থ; সর্ব্ব-ব্যাপিকা, সকলের অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমানা চিচ্ছক্তিই বস্তুতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি ; অন্ধ জড়শক্তি কাহাকেও দিতে পারে না দৃষ্টিশক্তি, অপ্রাণ জড়শক্তি কাহাকেও করিতে পারে না প্রাণ; অমনস্ক কখনও কাহাকে করিতে পারে না মনস্ক। "অসৎ কদাচ হয় না সৎ এবং সৎ কদাচ হয় না অসৎ"।

("Never can nothing become something nor something nothing" ।)

[FORCE and MATTER p. 10. by Prof. L. Buchner M. D.]।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য জড়পরমাণু পুঞ্জে পরিণত হওয়া নিশ্চয়ই নহে। তাই নিবিষ্টমনে প্রার্থনা করিতে হইবে—"অসৎ হইতে আমাকে সৎকে প্রাপ্ত করাও, তমঃ বা অজ্ঞান হইতে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যুরাজ্য হইতে আমাকে অমৃতভবনে নিয়ে চল"।

মন্ত্র :—"অসতো মা সৎ গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"।

জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে নাই কোন বিরোধ ; এই সূত্রে স্মর্ত্তব্য পৃঃ ৮১। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনিই ঈশ্বর—অষ্টৈশ্বর্য্যশালী যেমন—"অণিমা লাঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা" ॥

বহুত্বের সৃষ্টি ও তাহার ধারণ ঐ অষ্টৈশ্বর্য্যশালী শক্তিমান্ ঈশ্বরেই হইতেছে ; আবার যখন তিনি ইচ্ছা করিবেন যে, আর আমি বহুভাবে হইব না প্রকাশিত তখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে সৃষ্টি—হইবে প্রলয়। সুতরাং সেই শক্তিমান্‌ই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর। পরমাত্মা-

স্বরূপেরই এই ঈশ্বররূপ বিকাশকে বলা যায় শক্তি ; সেই পরম অংশটীর নাম শক্তিমান্ এবং অহংবোধ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুভাবে প্রকাশ, তাহার ধারণ ও প্রলয়াদি কার্য্য অংশটীর নাম "শক্তি"। এই শক্তি ও শক্তিমান্ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ সূর্য্যের প্রকাশশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি যেরূপ মুখে বলা যায় মাত্র, উক্তরূপ ভেদ কখনও হয় না অনুভূতিযোগ্য, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মাত্র মৌখিক বিচারেই প্রযুজ্য; পরমাত্মা ও শক্তি অভিন্নভাবে প্রতীতিযোগ্য যতক্ষণ ভেদপ্রতীতি থাকে, ততক্ষণ দেখা যায়, শক্তি যেন সত্তাকে রাখিয়াছে ধরিয়া। এই শক্তিটিই চিৎ-বস্তু বা চৈতন্যমাত্র যাহা সৎরূপ ইহার পূর্ব্বপুরুষ-পরমপুরুষের সাথে অবিচ্ছিন্নরূপে, অবিযোজ্য ও অবিশ্লেষণী ভাবে সংলগ্ন-সংযুক্ত-সংজড়িত। এই শক্তি বা (বেদান্তের) "মায়া" নহেয় মিথ্যা, নহে ভ্রান্তি ; বরং পরম সত্য। ব্রহ্মের আবরক নহে এই মায়ারূপী শক্তি, বরং ব্রহ্মের প্রকাশক। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রকাশই এই মায়ারূপী শক্তি। এই শক্তি সগুণব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই শক্তি যখন আর বহুত্বের স্পন্দনে অভিস্পন্দিত না হইয়া বহুভাবে বিরাজিত প্রকাশ-শক্তিকে উপসংহৃত করিয়া, স্থিরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই তিনি নির্গুণ-নিরঞ্জন-নির্বিবকল্প ব্রহ্ম নামে হ'ন কথিত। ইনি অবাঙ্‌মনসোগোচর ; যতক্ষণ জীবজগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণই তিনি মহতী চিত্তিশক্তি রূপিণী মহামায়া। অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়া দুর্বিজ্ঞেয়া বটে, কিন্তু অনু অর্থাৎ অব্য-বহিত পরেই তিনি প্রকটিতা হ'ন ভাব-আকারে। প্রতিক্ষণে জীবের অন্তরে যে ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, উহাই শক্তিরূপিণী মহামায়ার অনুভাব ; কামক্রোধাদি বৃত্তি, রূপরসাদি বিষয়, দয়াক্ষমাদি গুণ, এ সকল শক্তিরূপিণী মহামায়ারই অনুভাব। এই ভাবরাশি মহামায়ারই অঙ্কে সঞ্জাত এবং মহামায়াতেই হয় বিলীন। অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রথম ব্যক্তাবস্থায় যখন আবির্ভূতা হ'ন ঐ

চৈতন্যময়ীশক্তিস্বরূপা মহামায়া তখনই প্রকটিতা হইয়া পড়েন ভাবের আকারে ; ঐ ভাবরাশি ঘনীভূত হইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে এই স্থূল জগৎ-আকারে। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থূল। যতক্ষণ মহামায়া থাকেন অনুভাবের আকারে ততক্ষণ উহা মানসগ্রাহ্য ; উহা ঘন হইলেই স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায়। ভাবই মহামায়ার অনু অর্থাৎ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দ্বিতীয় স্বরূপ।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মিকা মহতীশক্তি প্রতি জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও ভাবাকারে হয় প্রকাশিত। অনির্ব্বচনীয়া শক্তির প্রথম অভিব্যক্তিই **নাদ**; নাদ ও শক্তি পরস্পর অবিনাভাবী। যেখানে শক্তি সেখানেই নাদ। মহতী শক্তির সন্ধান করিতে হইলে সেই ওঁকাররূপী নাদের সন্ধান ও অনুধাবন করা চাই। এ জগতে যতকিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা অন্তরে যে কোন ভাবের উদয় হয়, উহা এক-একটী শব্দাকারে শক্তি মাত্র। শব্দ নাই অথচ পদার্থ বা ভাব আছে, ইহা হয় না।

শক্তি-পরিচালক আশ্রয়কে বলে সেই শক্তির বাহন। যে দেবশক্তি যেরূপ পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, সেই পশুই সেই দেবতার বাহনরূপে পরিচিত।

অরূপ কারণের স্বরূপই শক্তি ; কারণের মতই শক্তিপদার্থও অদৃশ্য। শক্তি যখন কার্য্যরূপে পায় প্রকাশ, তখনই অনুমিত হয় শক্তির সত্তা, নতুবা শক্তি কখনও হয় না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। শক্তিতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানই মানবের চরমজ্ঞান ; মানবকুল শক্তিসাধনার সুবিধার জন্য **প্রবাহময় শক্তিকে** যেন তিনটা বাঁধ দিয়ে বেষ্টন ক'রে কাল্পনিক মাত্রা দিয়েছেন এবং সন্ধিবন্ধন দ্বারা সেই ত্রিমাত্রা স্বরূপ মূর্ত্তিটাকে এক অপূর্ব্ব সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে সাধকসমাজে ক'রেছেন প্রবর্ত্তন। বেদের সর্ব্বমন্ত্রের সার সেই ত্রিধামাত্রা বা ত্রিমাত্রা—**ওঁ,** যাহা হইতে এই জগৎ প্রপঞ্চ, যাহা হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, যাহা ব্যাকরণের সন্ধিবিচ্ছেদে

"অ", "উ" ও "ম"-রূপে জগদাকারে প্রকটিত। চিন্ময়ী মহতীশক্তি স্থূল জগদাকারে প্রকটিতা হইয়া জড়াশক্তি নামে কথিতা হ'ন কোন কোন দার্শনিক দ্বারা। ঐ শক্তিপ্রবাহ প্রকাশ করে তিন প্রকার ক্রিয়া যথা—**প্রথম**—উৎপত্তি বা নামরূপবিশিষ্ট একটা ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্র, ইহাই সৃষ্টি বা "অ"-কার মাত্রা; **দ্বিতীয়**—স্থিতি, সেই বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত শক্তিকেন্দ্রটা যতক্ষণ লয়শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মস্বরূপ স্থির রাখিতে সমর্থ ততক্ষণই উহা স্থিতি বা "উ"-কারমাত্রা নামে কথিত; **তৃতীয়**—লয়, যখন উক্ত শক্তিকেন্দ্র আবার মহাশক্তির কোলে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তখনই হয় লয় বা "ম"-কারমাত্রা। এই "অ" + "উ" + "ম" যথাক্রমে মন + প্রাণ + জ্ঞান এবং সাধনার ভাষায় যথাক্রমে ব্রহ্মা + বিষ্ণু + শিব ও যোগীর ভাষায় সৃষ্টি + স্থিতি + লয়। ষড়্ভাব-বিকারের ৬টা বিকারই-পরিবর্ত্তনই (জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষয়তে, নশ্যতি) এই ত্রিবিধ স্পন্দনের ভিতর দিয়া চলিতেছে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিপরমাণুতে। পঞ্চভূত ঐ ত্রিবিধশক্তির প্রবাহমাত্র।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিমাত্রার তৃতীয় মাত্রা "ম"কারটা ব্যঞ্জন, উহা অর্দ্ধ মাত্রা; আর, প্রথম ও দ্বিতীয় (অ + উ = ও) = ওকারের মস্তকে ঐ অর্দ্ধমাত্রা "ম"ই নাদ ও বিন্দুরূপে প্রকাশিত। জ্যামিতির অনুশাসনে যাহার আছে অবস্থিতি কিন্তু নাই বিস্তৃতি তাকে বলে বিন্দু; ঐ অবস্থিতি অংশটি নির্গুণ-ব্রহ্মের দ্যোতক এবং বিস্তৃতি অংশটা **সগুণ-ব্রহ্ম বা শক্তির** প্রকাশক---ইহাই নাদ বা শব্দ। যাহার অবস্থিতি আছে, তাহার একটু-না-একটু বিস্তৃতি আছেই; কারণ বিন্দুসমষ্টিই পদার্থ; বিন্দুকে মাত্র-চৈতন্য এবং নাদকে মাত্র-জড়শক্তিরূপে ধরিলে, বিন্দুর শক্তিহীনতা বলা হয়; এমতে শক্তিহীন বিন্দুর শক্তি-পরিচালকতা অসম্ভব বিধায় ব্রহ্মকে বলিতে হয় শক্তিহীন; ইহা বেদ ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। আবার অন্যদিকে ত্রিমাত্রার অর্থ স্বরবর্ণ (অ + উ) এবং অর্দ্ধমাত্রার অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ (ম) ধরিলেও হয় এইরূপ;

কারণ স্বরের সাহায্যেই ব্যঞ্জন হয় উচ্চারিত ও প্রকাশিত। স্বর বা শক্তি আশ্রয় করিয়াই নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকাশ পান সগুণরূপে।

আবার, অদৃশ্যা শক্তির প্রথম সাড়া মিলে অর্থাৎ প্রথম অভিব্যক্তিই স্বর বা শব্দ ও নাদ; নাদশক্তির প্রতিভূ শঙ্খ। যে প্রণবধ্বনি অনন্তজগৎ (=সমগ্র দেশ space) পরিব্যাপ্ত, অনাহত-চক্র হইতে সাধক যে ধ্বনি শুনিতে পান, যাহার বিভিন্ন তরঙ্গসমূহ জগতে শব্দ-আকারে পরিচিত, শঙ্খ তাহারই প্রতীক। পুরাণের বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী; শঙ্খ যেমন নাদশক্তির প্রতিভূ, চক্র তেমনই বৃত্তাকারে পরিভ্রাম্যমাণ গতিশক্তির প্রতিভূ অর্থাৎ জগৎচক্র বা কালচক্র (Time)। যেখানে অক্ষর পুরুষ (=পরমাত্মার স্বরূপ) হইতে উদ্ভূত বেদ→কর্ম্ম→যজ্ঞ→পর্জ্জন্য→অন্ন→প্রাণী (=পরমপুরুষের সাক্ষাত প্রতিনিধি মানব) যিনি মোক্ষ দ্বারা ফিরে যেতে চান সেখানে (=পরমাত্মক্ষেত্রে), যেখান থেকে এসেছেন তিনি, তাহা সেই চিরস্থিরস্থল, সৎ-বস্তু। অনুলোম ও বিলোমভাবে এইরূপ চক্রবৎ গতির নাম সংসার; ইহাই বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র বা সংসারচক্র বা জগৎচক্র। পরমাত্মা পরব্রহ্ম হইতে প্রবর্ত্তিত এই সংসারচক্রকে বা জগৎ-চক্রকে যাঁহারা নিয়ত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তাঁদের চক্ষে এই চক্র অতি সুন্দরদর্শন; তাই বিষ্ণুর চক্রকে বলে সুদর্শনচক্র। আবার, বিষ্ণুর সৃষ্টিপালনকল্পে দুর্নীতি-বিশৃঙ্খল-উৎশৃঙ্খল শাসনে প্রয়োজনীয় শাসনশক্তির প্রতিভূ এই গদা; এবং সৃষ্টির স্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকরণশক্তির প্রতিভূ এই পদ্ম।

শক্তি প্রবাহময়--প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ একটী শক্তিমাত্র, প্রত্যেক পরমাণুই শক্তি। শক্তি স্থিরপদার্থ নহে; তবে পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎকে স্থির দেখায় কি রূপে? এই প্রশ্নের সমাধান হয় একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা--একটী মশাল অতি দ্রুত বেগে যদি সঞ্চালিত হয় (ঘোরান হয়) তাহ'লে দেখা যায় যেন একটী

স্থির অগ্নিময় রেখার চক্র বা বৃত্ত। এই জগতের **স্থিরতা** এবং **সত্তাও** ঠিক এইরূপ। সুতরাং রূপ-রসাদি বিষয়সমূহ যে একটী শক্তি-প্রবাহমাত্র ইহা বেশ অনুমান হয়। এই শক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিদৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ উহা এক।

এক অখণ্ড চৈতন্যরূপিণী শক্তিই আমাদের ইন্দ্রিয়প্রণালী রূপে, অন্তরেন্দ্রিয় (=মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার) রূপে, প্রাণ-অপানাদি পঞ্চ বায়ুরূপে, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতরূপে, রূপরসাদি পঞ্চবিষয়রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ঐ অখণ্ডৈকচৈতন্যশক্তি প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত প্রতিটী জীবে ও প্রতিটী পরমাণুতে; ঐ এক অখণ্ড চৈতন্যই জীবরূপী বহু আধারের মধ্য দিয়া বহু চৈতন্যের ভাণ করিতেছে; ঐ এক অখণ্ডচৈতন্যের নাম **আত্মা** এবং বহুর ভিতর দিয়া তাঁর প্রকাশ হওয়াটাই **শক্তি**। আত্মা ও শক্তি, শব্দ মাত্র ভেদ; বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই।

মনে রাখিতে হইবে আবার প্রবাহশক্তির প্রকাশ হয় দ্বিবিধঃ—অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। আরও, শক্তি ও জ্ঞান অভিন্ন এবং একই জ্ঞান বহু বৈচিত্র্যকারিণী বিষয় আকারেপ্রকটিতা মহাশক্তি—ইহাই মুল তত্ত্ব।

জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় বলিয়া যাহা কিছু দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায়—এ সবই একমাত্র **পরাশক্তিরই** বিভিন্ন বিকাশ; মানব সাধারণতঃ শক্তির বিকাশ বা কার্য্যটীমাত্র দেখিতে পায় এবং মুগ্ধ থাকে তাহাতেই, শক্তির যথার্থ স্বরূপটী জানিতে চায় না। শক্তিদেবী সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র সুপ্রতিভাত হইলেও তার বিরাট এক অংশ নিত্যই অদৃশ্য-অগ্রাহ্য-অলভ্য ও অবাঙ্মনসোগোচর হইয়া বর্ত্তমান আছেন (=কেবলাত্মা)। ব্রহ্মনিরূপণ সূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই উক্তিতেই স্বীকৃত পরমাত্মার শক্তিস্বরূপত্ব। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বস্তুটী চিতিশক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই জগৎরূপ কার্য্যদ্বারাই তাঁহার শক্তিরূপত্ব বিশেষ ভাবে বোঝা যায়। আর **যখন** জগৎরূপ কার্য্য থাকে

না, স্বজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদও থাকে না, কেবল্ বিশুদ্ধ বোধস্বরূপটী হয় উদ্ভাসিত, **তখন** তাঁকে শক্তিময় কিংবা **শক্তিহীন**—কিছুই বলা যায় না। তবে যতক্ষণ পরমাত্মায় শক্তিময়স্বরূপটী হয় প্রত্যক্ষ, ততক্ষণ তাঁহাতে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বরূপ দ্বিবিধ মহত্ত্ব হয় দৃষ্ট। তাঁহাতে জীবভাবে দৃষ্ট হয় ত্রিবিধ ভেদ যেমন স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; এবং ঈশ্বরভাবে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ থাকে না, কেবল স্বগত ভেদ হয় উপলব্ধ। মানব সাধনাদ্বারা, জ্ঞান-ভক্তির অনুশীলন দ্বারা এই ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত যেতে পারে, তারপর স্বরূপটী সর্ব্ববিধ সাধ্য-সাধনার অতীত। তবে ইহা স্থির যে, মানব যখন সাধনার ফলে বা আত্মকৃপায় এই ঈশ্বরত্বে অর্থাৎ আত্মার শক্তিময়স্বরূপে যেতে পারে, তখন—কেবল তখনই উদ্ভাসিত হ'তে পারে তাঁর নিরঞ্জন স্বরূপটী। সেখানে—সেই নিরঞ্জনক্ষেত্রে যাইয়া তাঁকে শক্তিময় বলিলেও ক্ষতি নাই, শক্তিহীন বলিলেও ক্ষতি নাই, উভয়রূপ বলিলেও ক্ষতি নাই, উভয়াভাবরূপ বলিলেও ক্ষতি নাই; তিনিই সব অথবা তিনি কিছুতেই নাই।

আদি শক্তি

১। সংসারে যত শক্তি আছে পরমাত্মাই তাহার প্রেরক। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শক্তিই জগতের উপাদান। **ভৌতিক জগতে** তাহাই পদার্থমাত্রের আদি দ্রব্যবীজ। "নাবস্তু নোবস্তু সিদ্ধিঃ", যাহা বস্তু নহে তাহা হইতে বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। মানসিক জগতেও তাই অর্থাৎ শক্তিই উপাদান। শক্তিই সাংখ্যের প্রকৃতি। শক্তিই একদিকে বাহ্যবস্তু, অন্যদিকে মানব-প্রকৃতি। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি যে সূক্ষ্মদেহ তাহা উহার (= শক্তিরই) রূপান্তর এবং স্থূলদেহ উহারই বাহ্য পরিণাম। জগতে যত ভৌতিক ও জৈবিক শক্তি আছে সমস্তই শক্তির গুণত্রয়ের অন্তর্গত। শক্তিই বাহ্যবস্তু ও শক্তিই মানসিক প্রকৃতি এবং শক্তিই চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থের তেজঃ, বল, বীর্য্য,

ধর্ম্ম। "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ" অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানে নাই ভেদ—এইসূত্রে ভৌতিকশক্তি ভূতপদার্থ হইতে নহে স্বতন্ত্র, জৈবিক শক্তিও (= মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়) স্থূলদেহ হইতে নহে স্বতন্ত্র। শক্তিই বাহ্য ও মানসিক পদার্থরূপে আবির্ভূত, শক্তিই তাহাদের জীবন, এবং শক্তিই তাহাদের অন্তিম পরিণাম। "একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ প্রতিপাদ্যতে"—একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞান হইলে সকলতত্ত্বেরই হয় জ্ঞান, যেমন এক মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে মৃত্তিকানির্ম্মিত তাবদ্বস্তুর তত্ত্ব যায় জানা। একমাত্র ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণরূপে কথিত। প্রকৃতরূপ উপাদানশক্তি তাঁহারই (= ব্রহ্মেরই) প্রেরিত ; তিনি সে শক্তির আধার। একমাত্র তাঁহাকেই (ব্রহ্মকেই) উপাদানরূপী প্রকৃতির আধার ও প্রেরয়িতা বলিলেই বলা হয় বেদ-বাক্য ; যেহেতু তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলেই যেমন সমগ্র ভৌতিক ও মানসিক জগতের তত্ত্ব জানা যায়, তেমন ব্রহ্মজ্ঞানে জীবাত্মারও তত্ত্ব যায় জানা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মাপ্রেরিত প্রকৃতিশক্তিই হয় **মূল উপাদান** (মূল কারণ নহে) সবারই যথা, (১) জগতের স্থূল-সূক্ষ্ম দ্রব্যের, (২) জীবের স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের এবং (৩) সমুদয় ভৌতিক ও জৈবিক শক্তির। মূলে তাহাই—মূল কারণে পরমাত্মাই দ্রব্য, বীর্য্য, তেজঃ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজধাতু।

২। পরমাত্মাপ্রেরিত ঐ প্রকৃতিশক্তি জীবগণের অনাদি বন্ধন-স্বরূপ। সৃষ্টিচক্রের নাই আদি-অন্ত ; অসংখ্য প্রলয়—অসংখ্য জন্ম মৃত্যুসহিত এই সৃষ্টিচক্র বুদ্ধির অগম্য। জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পর-পর প্রকৃতিসাধক। তাহাই দেহ-মন ও ভোগ্য পদার্থের বীজ ; তাহাই নব নব কার্য্যের হেতু। অতএব স্থির এই যে, জীব আপনার ভোক্তৃত্বশক্তি ও ভোগ্যদ্রব্যবীজের সাথে চিরকাল হইতে ঐ শক্তির আছে অধীনে। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুসারে তাহার প্রেরক ও নিয়ন্তা। ঐ শক্তি নিত্য অথচ বিকারী, অব্যয়, অথচ পরিণামী, তাহার

কিঞ্চিন্মাত্রও কখন হয় না লুপ্ত। তাহার এক রূপের অন্তর্দ্ধান হইলেও তাহা অন্যরূপে থাকে সঞ্চিত। সাক্ষাৎ কর্ম্ম পরক্ষণেই ধারণ করে অদৃষ্টরূপ; অদৃষ্ট শুভাশুভ ফলরূপে হয় পরিণত। বৃক্ষশক্তি ফলরূপে, ফল বীজরূপে বীজ আবার বৃক্ষরূপে হয় পরিণত। জীবের স্থূলদেহ গলিত হইয়া উদ্ভিজ্য বা অন্য জীবদেহে হয় পরিণত; অন্নজলাদি ভুক্ত হইয়া স্থূলদেহে হয় অবস্থান্তরিত উদক ঘনীভূত হ'য়ে হয় তুষার এবং তুষার আবার হয় উদক। এইরূপে সাগর শুষ্ক হ'য়ে বাষ্প হয় এবং বাষ্প আবার হয় সাগর। পৃথিবী ও অন্যান্য লোকমণ্ডল শক্তিরূপ মূল দ্রব্যবীজে হ'তে পারে উপসংহৃত। আবার সেই দ্রব্যবীজ হইতে শত শত লোকমণ্ডল হ'তে পারে আবির্ভূত। এই প্রকার পরিবর্ত্তন অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল হইবে, কিন্তু তাহাতে গুণবতী প্রকৃতির এক বিন্দুও কখনও **হইবে না বিনষ্ট।**

৩। বিনষ্ট না হউক, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বিস্ময়জনক। এই সংসারে অসংখ্য অসংখ্য পদার্থ, তাদের বিচিত্র শক্তি; অসংখ্য অসংখ্য জীব, তাদের অনির্ব্বচনীয় মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, দৈহিকশক্তি দেখা যায়; কিন্তু সবই ভাসিতেছে পরিবর্ত্তন-প্রবাহে। কখন এক একটি জড়পদার্থের, এক-একটী জীবদেহের শক্তি বিকৃত হইয়া তাহাকে করিতেছে বিনষ্ট। কখনও বা একেবারে অনেকপদার্থ ও অনেকদেহব্যাপী শক্তি বিকৃত হইয়া সাধারণ উৎপাত সকল আনিতেছে; কোন পদার্থ ও কোন জীব একাদিক্রমে কোন অবস্থাকে ভোগ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ এই যে, ভোগে শক্তি হয় রুগ্ন, দূষিত, মলিন, বিকৃত, কলুষিত ও নিস্তেজ, তাই হয় পরিবর্ত্তন। এইরূপ **পরিবর্ত্তনে** প্রকৃতি হয় সংশোধিত।

৪। এক-একটী জড়পদার্থের বা জীবদেহের শক্তির যে পরিবর্ত্তন, তাহাই **ব্যষ্টি** পরিবর্ত্তন। তাহা দ্বারা তত্তৎ পদার্থ-বা-জীবব্যাপী প্রকৃতিই হয় সংশোধিত। প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক জীবগত

প্রকৃতিকে বলে ব্যষ্টিপ্রকৃতি। স্থূলদেহের বিনাশে অনাদি সূক্ষ্মদেহের ও তদবচ্ছিন্ন জীবাত্মার বিনাশ হয় না। গীতার কথায় (১৫।৭, ৮) যেমন ফুল হইতে সৌরভ সংগ্রহ করে বায়ু, তেমন জীবাত্মা পূর্ব্বদেহ হইতে মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার সহ প্রবেশ করে নূতন দেহে। জীবাত্মার জন্য এই সংস্কার বা প্রকৃতি পরিণত হয় সংশোধিত-নূতন-দেহরূপে।

৫। অনেক পদার্থ ও অনেক জীব-ব্যাপী শক্তির এক-এক বারে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহাকে বলে **সমষ্টি** পরিবর্ত্তন। প্রথমতঃ এই সব পরিবর্ত্তন দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিক, বা বহুবর্ষান্তজ। দ্বিতীয়তঃ একদেশী, বহুদেশব্যাপী, পৃথিবীব্যাপী, কতিপয় লোকমণ্ডল ব্যাপী, বা বহু লোকমণ্ডলব্যাপী। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে প্রতিদিন জীবগণের জাগরণশক্তি-ক্ষয়ে, আসে নিদ্রা। নিদ্রান্তে নবতর বীর্য্যসহকারে পুনঃ জাগরণ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অন্তে পৃথিবীর, বৃক্ষলতার, নর-দেহের ও সাগরের জলধাতু কমে; পুনঃ ঐ তিথিদ্বয়ের সমাগম প্রভাবে উহা বাড়ে। বৃক্ষাদির পত্র পুষ্পফল ধারণের শক্তি বর্ষে-বর্ষে যথাঋতুতে হয় সংশোধিত। পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তিক্ষয় অথবা প্রকৃতির পর্জ্জন্য বর্ষণের শক্তিক্ষয় নিবন্ধন কতিপয় বর্ষ যাবৎ অল্প শস্য হয় উৎপন্ন, আবার সেই সমস্ত শক্তি সংশোধিত হইয়া কতিপয় বর্ষ যাবৎ প্রচুর শস্য ফল জন্মে। আবার প্রকৃতির স্বাস্থ্য শক্তিক্ষয়ে কখনও পৃথিবীর এক দেশে, কখনও বা বহুদেশে পীড়ার উপদ্রব হয়, কখনও বা সেই শক্তি সংশোধিত হইয়া তথায় আবার আরোগ্য বিরাজ করে। কোন কোন সময়ে প্রকৃতির বিশেষ-বিশেষ দোষ জন্য বিশেষ-বিশেষ পীড়া ব্যাপ্ত হয় পৃথিবীময়, আবার সে শক্তি সংস্কৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। এইরূপে যখন ত্রিলোকব্যাপী বা সমগ্র সৌরজগৎব্যাপী জীবগণের ভোগশক্তি, জীবনীশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য ঐশ্বর্য্যের স্থিতিশক্তি, ভোগদানের শক্তি, এবং সুখপ্রদ-শক্তি-সমূহের আধার-স্বরূপ সমষ্টিপ্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠে তখন ত্রিলোক

অথবা চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী হয় **প্রলয়**। যখন ত্রিলোকব্যাপী হয় প্রলয় তখন ত্রিলোকস্থ লোকমণ্ডল সমূহ-জলদ্বারা হয় আবৃত। যখন চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী হয় প্রলয় তখন সমগ্র দ্রব্যময়ী ও সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতি আপনার উদ্ভব-স্থান-স্বরূপিণী **ব্রহ্মশক্তিতে** হয় বিলীন। তখন সমস্ত জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রকৃতি, মনোবুদ্ধি, আদি সূক্ষ্মদেহ, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের বাসনা, সুখের প্রার্থনা, সুখদুঃখপ্রদ স্বভাব, দেবাধীনতা, পঠিতবিদ্যার ও কৃতকর্ম্মের সংস্কার প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ সেই একই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া বিরাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চিরবিনাশ হয় না। শাস্ত্রের উপদেশ—ঈশ্বর নিয়ামিত কালান্তে তাহা সংশোধিত হইয়া জীবের সহিত সৃষ্টিরূপ কার্য্যে বিচিত্রভাবে পুনঃ পরিণত হইয়া থাকে। পুনঃরায় চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রকৃতির নবরাজ করে বিরাজ।

৬। এইরূপে জগৎরূপিণী ও জগৎব্যাপিনী দ্রব্যশক্তিময়ী ও কার্য্যশক্তিময়ী প্রকৃতি পরমাত্মা কর্ত্তৃক অনাদি কাল অবধি **প্রেরিত** ও **উপসংহৃত** হইতেছে। অবিমুক্ত (=বদ্ধ) জীবগণ তাহারই আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া ভোগার্থ করিতেছে যাতায়াত। এই প্রকৃতি কখনও চিরবিশুদ্ধ ভাবে থাকিতে পারেনা সৃষ্টিতে অনবরত ভৌতিক পদার্থতে ও জীবদেহাদিতে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্ব্বদাই অল্পবিস্তর মলিনতা প্রাপ্ত হয়। তাই শাস্ত্রে ইহাকে বলে **সমলা শক্তি**; উহা তমোগুণ মিশ্রিত সত্ত্ব-প্রধান, মলিন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতি। উহার নামান্তর **অবিদ্যা, স্বভাব, কারণ** দেহ, **অপূর্ব্ব** ইত্যাদি। জীব-রাজ্যে ইহাই মানসিক প্রকৃতি, বুদ্ধিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, মেধাশক্তি, চিন্তাশক্তি, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুকৃত, দুষ্কৃতি, ব্যক্তিস্বভাব ও অদৃষ্ট। জীবের স্থূলদেহে তাহাই গতিশক্তি, রতিশক্তি, দানশক্তি গ্রহণশক্তি প্রভৃতি।

৭। পরমাত্মার শক্তি অনন্ত। কর্ম্মসূত্রদ্বারা জগৎরূপ কার্য্যে যাহা প্রেরিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনন্ত শক্তির একবিন্দু প্রভাবমাত্র।

আর তাঁর স্বীয় বশে যে অনন্ত শক্তি আছে তাহা অতি পবিত্র ; তাহার নাম **বিমলা শক্তি** ; তাহা নির্ম্মল সত্ত্বগুণবিশিষ্ট এবং তাহাকে মূলা প্রকৃতি বা মহামায়াও বলা যায়। **সমলা শক্তি** ভৌতিক জগতে কঠোর ভৌতিক নিয়মে এবং জীবরাজ্যে অবশ্য ভোক্তব্য অদৃষ্টে বদ্ধ। সেই পর্য্যন্তই তাহার প্রভাব ; তদূর্দ্ধে তাহা এক তিলও ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না; তাহা ঈশ্বর নিয়ামিত দেশ-কাল-পদার্থ জীব-অদৃষ্ট প্রভৃতিতে বদ্ধ : তাহা সে নিয়মলঙ্ঘনে অসমর্থ ; অতএব তাহা দ্বারা জগতের যে সকল দুঃখের প্রতিবিধান অসম্ভব, ঈশ্বর প্রাগুক্ত স্বীয় বশীভূত নির্ম্মলা মায়াদ্বারা তাহা সাধন করিয়া কালে-কালে অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন ; ইহাই অবতারের হেতু।

৮। জগতের স্থূলাংশপ্রলয়ে ব্রহ্মার নিদ্রা এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় প্রলয়ে তাঁহার যে বিনাশকল্পনা, তাহা পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে। এখন বলা যায় যে, প্রাগুক্ত সমলা প্রকৃতিই জগতের সেই স্থূল-সূক্ষ্ম-ধাতু স্বরূপিণী এবং পরমাত্মার ব্রহ্মা নামক কর্ত্তৃত্বের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। সুতরাং ব্রহ্মার নিদ্রা ও মৃত্যু তাহারই অবান্তর ও অন্তিম পরিবর্ত্তনের অনুগত

৯। অতঃপর পরমাত্মার যে অধিষ্ঠান বিমলাশক্তিস্বরূপিণী মায়াতে উপস্থিত তাহা চতুর্দ্দশভুবনের অনাদি অনন্ত যন্ত্রী। সেই অধিষ্ঠানের নাম বিষ্ণু। যখন মহাপ্রলয়ে স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রপঞ্চাত্মক চতুর্দ্দশ ভুবন তত্রত্য সমলা প্রকৃতি ও তদুপরিস্থিত বিমলাপ্রকৃতির সহিত প্রবেশ করে পরমাত্মাতে, তখন সেই কাল ঐ বিষ্ণু নামক কর্ত্তৃত্বের নিদ্রা বা রাত্রি-রূপে হয় কল্পিত। স্বয়ং পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন কল্পনা নাই। শক্তিরূপ উপাধিই কল্পনার হেতু। পরমাত্মা বিকারীপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়াও শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব ॥

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধবিচারে শক্তিসাতত্য (conservation of ENERGY and also Persistence of Force) বিচার্য্য। বস্তু মাত্রেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, শক্তি বা যোগ্যতাবিশিষ্ট। শক্তিসমূহ এক অবস্থা

ত্যাগ ক'রে অবস্থান্তর গ্রহণ করে—একভাব ছেড়ে অন্যভাবে আসে। এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন হ'লেও ইহারা তত্ত্বতঃ কমেও-না বাড়েও-না; সমষ্টিভূত শক্তির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা সর্ব্বদা থাকে সমান। কি যান্ত্রিক শক্তি (mechanical force), কি রাসায়নিক শক্তি (chemical force) কি তাড়িতশক্তি (electrical force), কি জীবনীশক্তি (Vital force) সকলই পরস্পর সম্বদ্ধ, সকলেই সকলের আকার গ্রহণ করিতে পারে, সকলেই সকলের ভাবে ভাবিত হ'তে পারে। শক্তিসমূহ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় গমন করিতে পারে; ইহাদের রূপান্তরগ্রহণযোগ্যতা আছে, ইহারা ইতরেতর সম্বদ্ধ, শক্তি-সকলের তত্ত্বতঃ ধ্বংস হয় না, এই জন্য জগতে বিবিধ-বিচিত্র পরিণাম!

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উপরোক্ত শক্তি-সূত্রগুলি জানিলেই কারণ-তত্ত্বের পূর্ণরূপের স্বরূপাবগতি হয় না; বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্যের কারণজিজ্ঞাসু ইহাতে চরিতার্থ হ'তে পারেন না; শেষে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠেই বলেছেন যে কারণরহস্য অদ্যাপি দুর্ভেদ্য।

আমাদের প্রাচ্য ঋষি পতঞ্জলিদেবের উপদেশ যে, "ক্ষণ" ও তৎ-"ক্রমে" সংযম করিলে 'বিবেকজজ্ঞান' লাভ হয়। এই বিবেকজজ্ঞানে সর্ব্ববস্তুর ক্ষণপরিণাম হইতে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের তত্ত্ব জানা যায়। অতএব যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বপদার্থের কি হইয়াছে, কি হইতে পারে, কি হইতেছে, তৎসমুদয় নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিতে পারা যায়, যে জ্ঞানের উদয় হইলে কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকে না—তাহাই "বিবেকজজ্ঞান"।

আরও দেখুন লেখকের "অবসরে আমার খোঁজ" পুস্তক পৃঃ ৫৮৭।

বিবেকজজ্ঞান লাভের উপায়ঃ—

করিতে হবে যোগ—ক্ষণ + ক্রম + বিন্দু। যাঁর চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে—কেন্দ্রাভিমুখ হ'য়েছে—একাগ্র হ'য়েছে তাঁর ভক্তিগম্য অন্তর্মুখচিত্তবৃত্তির ভক্তি দ্বারাই পরতত্ত্বের হয় জ্ঞান = "বিবেকজজ্ঞান"।

অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে জ্ঞানদাতা শিবের (Central Nervous

System) অনুস্মরণে—ভাবনা বা ধ্যান দ্বারা আত্মহারা হ'লেই অর্জ্জিত হয় সর্ব্বজ্ঞত্ব, পরেশত্ব, সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা, অনন্তশক্তিমত্ব। তৈল ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করিলেই 'ক্ষণ' ও 'তৎক্রমে', ধারণা, ধ্যান ও সমাধিয় ফল ফলে। 'ক্ষণ', 'মুহূর্ত্ত', 'দিবস', 'পক্ষ' ইত্যাদি ইহারা খণ্ডকালের বিশেষ-বিশেষ অবস্থা; খণ্ডকালের (যে কালকে আমরা সাধরণতঃ কাল বলিয়া বুঝি তাহার) স্বরূপ বুঝিতে হ'লে ভাবিবার বিষয়—বীজ হ'তে হয় অঙ্কুর, অঙ্কুর→কাণ্ড→পত্র পুষ্প→ফল→বীজ; যে দিকেই দেখা যায় সেখানেই এরূপ পরিণাম প্রবাহের আবর্ত্ত। প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বটে, তবে তাহার কারণ বুঝাইয়াছেন শ্রুতি—"সূর্য্যরশ্মি" (সূর্য্যের সন্তাপনী শক্তি) এই প্রকার সতত পরিণামের কারণ; সূর্য্যদেবের পাকক্রিয়াও পরিণামের কারণ। তণ্ডুলাদি দ্রব্যসকল অগ্নিসন্তাপে পক্ক হইয়া অন্নাদিরূপে হয় পরিণত; জল সন্তপ্ত হ'লে ধারণ করে বাষ্পাকার; প্রত্যেক জাগতিক ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনই এই প্রকার সূর্য্যমরীচি বা তাপকৃত পাকবিশেষ। যেখানে পরিবর্ত্তনের ছবি, সেইখানেই সূর্য্যের সন্তাপনী শক্তি-বা-তাপকে বলিতে হইবে সেইপরিবর্ত্তনের হেতু। **পাকঃ**—যখন কোন দ্রব্যকে উত্তাপিত করা হয়, তখন ঐ উত্তাপবিশিষ্ট দ্রব্যে তাপের তারতম্য অনুসারে হয় দ্বিবিধ ক্রিয়া; ১ম্—উত্তপ্ত দ্রব্যের অণুপুঞ্জের মধ্যে রজোগুণের বা গতির হয় বৃদ্ধি; ২য়—সন্তাপবিশিষ্টদ্রব্যের আণবিক বিশ্লেষণক্রিয়া (Analysis) সংঘটিত হয়; দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণশক্তি হয় শিথিল; দ্রব্যের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাগত পরিণাম হয়। ইহাই পাক। সূর্য্যের পাকক্রিয়ার তারতম্যানুসারে ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কাল বিশেষ নিশ্চিত হইয়া থাকে; ইহাতেই নিমেষাদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কালবিভেদ জানা যায়। পাণিনির ২।২৫ "কালাঃ পরিমাণিনা" সূত্রে—যদ্দ্বারা তরুলতা, তৃণ, প্রভৃতি মূর্ত্তিমৎ দ্রব্যজাতের কদাচিৎ **উপচয়** (বৃদ্ধি) কদাচিৎ **অপচয়**

(হ্রাস) দেখা যায় তাহাকে বলে "কাল"। তবে, নিরবয়ব কালের অবয়ব বিভাগ যথা দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, অনয়, বৎসর ও যুগ ইত্যাদির হেতু **আদিত্যগতি**। অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার উপাধিযুক্ত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হ'য়েন। কাল একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে (নিমেষ,কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, ঋতু) দিবসরূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে বৎসর রূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে যুগরূপে হ'ন বিশেষিত।

নিমেষাদি যুগ পর্য্যন্ত কলনাত্মক কাল চক্রবৎ হ'ন পরিবর্ত্তমান তাই বলা হয় **"কালচক্র"**।

গ্রীসের Aristotle (Greek philosopher 384-322 B. C.)—গতির পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধাত্মক মান বা সংখ্যা "কাল" (Time); গ্রহদের গতিদ্বারা, কলনাত্মক কাল হয় সংখ্যাত ; গ্রহগণের সমচক্রাবর্ত্তচক্রগতিই (uniform circular moion) কালের পরিণাম অবধারণের উপযুক্ত প্রমাণ—মাননিরূপক।

Leibnitz—পরিণাম ও ঘটনাপুঞ্জের ক্রমপারম্পর্য্যকে (Succession) "কাল" বলেছেন।

Kant—German scientist and phlilosopher (1724-1804) প্রাচ্যবাণী—"জন্যনাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ"—এই প্রাচ্য বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেছেন যে, knowledge by the senses alone depends on the knowledge of time and space, and as the knowledge of time and space is the cause of direct belief so this (knowledge of time and space) cannot be called as being due to the knowledge by the senses. Time is the cause of manifestation of Intuitions (= সহজ বুদ্ধি বা আন্তরজ্ঞান), time is the shelter—Receptacle and rather time is the father of Perception

of all created objects; also Time is the father of creatable substances; Time is the Receptacle of the world (জন্যনাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ)

ক্ষণ-ক্রম—কাহাকে বলে ?—দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশকে (যাহাকে আর ভাগ করা যায় না তাহাকে) যেমন 'পরমাণু' রূপে কল্পনা করা হয়, তেমন অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কালের 'ক্ষণ'রূপে কল্পনা।

[বিঃ দ্রঃ—অপকর্ষ = ন্যূন করা, লঘু করা কমানো হয়েছে এমন অবস্থা—অতিশয় (Highest or Lowest) নিম্নাকৃষ্ট অবস্থা কাষ্ঠা = ১৮ নিমেষ (স্বাভাবিক ভাবে চক্ষুর পলক ফেলার কাল) ∴ অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত = কালকে ভাগ করিতে করিতে—কমাইতে কমাইতে যখন আর ভাগ করা যায় না ও আর কমানো যায় না, কালের সেই নিম্নাকৃষ্ট অবস্থা।] দেশের (Space) অবিভাজ্য অংশ **"বিন্দু"**; দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশ **'পরমাণু'** তেমনই কালের অবিভাজ্য অংশ **'ক্ষণ'**। অথবা, যে সময়ে চলন্ত পরমাণু তাহার পূর্ব্বস্থান ছেড়ে পরস্থানে যায় সেই ক্ষীণ সময়টুকুকে বলে **'ক্ষণ'**। এই ক্ষণ-প্রবাহের অবিচ্ছেদই—তৈলধারাবৎ একতান—অবিরাম প্রবৃত্তিই হয় **'ক্রম'**।

জগৎ ক্ষণকালও পরিণামশূন্য হইয়া—পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না, পরিণামই জগতের জগত্ত্ব—জগতের স্বরূপ। একটী ক্ষণের পর আসিতেছে অন্য এক ক্ষণ, তৎপরে আবার অন্য এক ক্ষণ, তৎপরে অন্য এক ক্ষণ, এইরূপে চলিতেছে অনন্ত ক্ষণ-কাল প্রবাহ। আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা পরিণাম বা পরিবর্ত্তন বা ক্রিয়া। একভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ বা পাদক্ষেপই (পা-ফেলা) 'পরিণাম'—পরিবর্ত্তন। পা-ফেলা, গমনার্থে √ক্রম + অল্ ভা = **'ক্রম'**-পদটী নিষ্পন্ন; পরিণাম মাত্রেই ক্রমোৎপন্ন ব্যাপার সমূহ, পরিণামের অপরান্ত (অবসান) দ্বারা ক্রমের পৌর্ব্বাপর্য্য হয় অনুমিত, সঙ্কলনাত্মিকা

বুদ্ধি দ্বারা অন্তিম ক্ষণে অনুভূয়মান পরিণামই ক্রমপদবাচ্য অর্থ। ক্রিয়াজ্ঞানই ক্ষণ, মুহূর্ত্তাদি হয় খণ্ডকালজ্ঞান। "গুণভূত (তত্তৎরূপে ভাসমান) অবয়বসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত, সঙ্কলনাত্মক একত্ববুদ্ধি প্রকল্পিত —অভেদরূপে উপলব্ধ ক্রমোৎপন্ন ব্যাপার সমূহের নাম "ক্রিয়া"। উদাহরণ—এক খণ্ড বস্ত্র এক বৎসর ব্যবহারান্তে হয় জীর্ণ, এই জীর্ণতা হয় নাই মাত্র একদিনেই; বস্ত্রখানি যে ক্ষণে বোনা হ'য়েছে সেই ক্ষণ হইতেই ইহার জীর্ণ পরিণাম সংঘটিত হইতে হইয়াছে সুরু—সেই ক্ষণ হইতেই ইহার পাক-ক্রিয়া চলিতেছে। বস্ত্র খানির জীর্ণতা সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক যখন জীর্ণতা স্থূলাশয়ে এলো তখনই বোঝাগেল বস্ত্র হইয়াছে জীর্ণ। অতএব ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহ, পরিণামের অবসান দ্বারা হয় অনুমিত; সঙ্কলনাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা অন্তিমক্ষণে অনুভূয়মান পরিণামই **'ক্রম'**। 'ক্রম' অর্থাৎ ক্ষণের তৈলধারাবৎ (অবিচ্ছিন্নত্বই = অন্তররাহিত্যই = **absence of interval**) ক্রমের আত্মা (ক্রমের স্বরূপ), পরিণামের অবসান বা চরম অবয়ব দ্বারাই 'ক্রম' হয় গৃহীত বা জ্ঞাত।

এখন 'ক্ষণ' ও 'তৎক্রমের' অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের স্বরূপ জানিলে **'বিবেকজজ্ঞান'** জানা যাবে; কারণ, 'ক্ষণ' ও 'তৎক্রমের' অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের উপর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করিলে 'বিবেকজজ্ঞান'—এর হয় উদয়। এই বিবেকজজ্ঞান 'সর্ব্ববিষয়' 'সর্ব্বথাবিষয়' এবং 'অক্রম' অর্থাৎ বিবেকজজ্ঞান স্বীয় প্রতিভা হইতেই হয় উৎপন্ন, ইহা **অনৌপদেশিক** কিছুমাত্র অবিষয়ীভূত নাই এই বিবেকজজ্ঞানের। এই বিবেকজজ্ঞান 'সর্ব্বথা বিষয়' অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, সমস্ত বিষয়ই এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, অতীত এবং অনাগত-ও (ভবিষ্যৎ) এই জ্ঞানে থাকে বর্ত্তমানরূপে। এই জ্ঞান অক্রম, অর্থাৎ, কোন বস্তুর এক ক্ষণের পরিণামে সংযম করিলেই এই জ্ঞান প্রভাবে

উহার সর্ব্ব—সর্ব্বপরিণামের জ্ঞান যুগপৎ হইয়া থাকে। বিবেকজ-জ্ঞানকে তাই 'তারক জ্ঞান' বলেছেন পতঞ্জলিমুনি।

যোগাভ্যাস দ্বারা বশীকৃতমানস যুক্তযোগীর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগী দ্বিবিধ—(i) যুক্ত (ii) 'যুঞ্জান'। (i) 'যুক্ত-যোগী' বিনাধ্যানে চিন্তা না করিয়াই সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; (ii 'যুঞ্জানযোগী' বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে সন্ধারণপূর্ব্বক ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (আচ্ছাদিত) ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থিত) পদার্থসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। **আবির্ভূতপ্রকাশ** পুরুষ (যাঁহার চিত্ত সর্ব্বথা মলবিরহিত হওয়াতে জ্ঞান পূর্ণভাবে বিকাশিত হইয়াছে এমন পুরুষ), **অনুপদ্রুতচিত্ত পুরুষ** (যাঁহার চিত্ত কোন কারণে উপদ্রুত হয় না এমন) এমন পুরুষের অতীত ও অনাগত-জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে বিশিষ্ট নহে অর্থাৎ অতীত এবং অনাগতও তাঁহার কাছে বর্ত্তমানবৎ। এই যোগবিভূতির কথা পাশ্চাত্য দেশেও অস্বীকার্য্য নহে—তাহা প্রমাণিত হয় Lord Edward Bullwar Lytton (1803-1873) মহাশয়ের কৃত নভেল "zanoni" দ্বারা যথা—

"But first, to penetrate this barrier, the soul with which you listen must be sharpened by intense enthusiasm purified from all earthlier desires. ***...., when thus prepaerd, science can be brought to aid it; the sight itself may be rendered more subtle, the nerves more accute' the spirit more alive and out-ward and the element itself—the air, the space may be made, by certain secrets of the higher chemistry, more palpable and clear. And this too is not magic as

the credulous call it, as I have so often said before, magic (or science that violates nature) exists not; it is but the science by which nature can be controlled".

[Zanoni Book iv Chap iv]

মর্ম্ম—চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, হৃদয় জাগতিককামনাবিরহিত হইলে, ইন্দ্রিয়শক্তি সমধিক সুতীক্ষ্ণ হয়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। ইহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহে, অতিপ্রাকৃতিক নহে, ইহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।

গণনার্থে √কল+অনট্ ভা = কলন ; এই কলনাত্মক কাল হয় দ্বিবিধ--(১) মূর্ত্ত (২) অমূর্ত্ত। **সূর্য্যসিদ্ধান্ত** প্রাণকে **মূর্ত্ত**কালের আদিভূত—একক (unit) রূপে ধ'রেছেন ; সুস্থশরীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যেসময়, তাহার নাম 'প্রাণ' ; (ইংরাজি) ৪ সেকেণ্ডে ১ প্রাণ। আর, **অমূর্ত্ত**কালের আদিকে বলা হয় "ত্রুটি" (ছেদন করা অর্থে √ত্রুট+কি র্ম্ম) = সূক্ষ্মকালবিশেষ; ১ ত্রুটী = ০'০০০০২৯৭১ সেকেণ্ড।

৬ প্রাণ = ১ পল ; ৬০ পলে = ১ দণ্ড (নাড়ী বা ঘটিকা) ; ৬০ দণ্ডে = এক নাক্ষত্র অহোরাত্র (a sidereal day and night) ৩০টী অহোরাত্রে = এক নাক্ষত্র মাস (a sidereal month)

এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সময় তাহার নাম সাবন (সবিতা সম্বন্ধীয়) অহোরাত্র (Terrestrial day)। ৩০ **সাবন অহোরাত্র** = ১ সাবন মাস।

এক তিথির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম **চান্দ্র অহোরাত্র** (LUNAR DAY) ; ৩০টী তিথি = ১টী চান্দ্র মাস ; সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণ পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে বলা হয় সৌরমাস ; এইরূপ ১২টী সৌর মাসে = ১ সৌর বৎসর : সৌর ১ বৎসর = দেবতাদের ১ অহোরাত্র। মনুর কথায়—অক্ষিপক্ষের স্বাভাবিক **উন্মেষসঙ্কোচকে** বলে 'নিমেষ' ; ১৮ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা ৩০ কলায় = ১ মুহূর্ত্ত ;

৩০ মুহূর্ত্তে=১ অহোরাত্র। মনুষ্যের একমাস=পিতৃলোকের ১ দিন-রাত ; মনুষ্যের ১ বৎসর=দেবতার ১ অহোরাত্র ; উত্তরায়ণ=দেবতার 'দিন' ; দক্ষিণায়ন=দেবতার "রাত্রি"। 'অহোরাত্র'—সম্বৎসরেরদু'টী চক্রস্বরূপ ; এই দু'টী চক্রের আবর্ত্তনেই সম্বৎসর হয় পূর্ণ। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা (শঙ্কু) ৬০বার ঘুরিয়া যেরূপ মিনিট-শঙ্কুকে একবার ঘোরায়, অহোরাত্র-চক্র সেরূপ ৩০ বার ঘুরিয়া মাসচক্র ঘটায় ; মাসচক্রও আহারাত্রের মত 'শুক্ল' ও "কৃষ্ণ' দু'ভাগে বিভক্ত। ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ৬০ বার ঘুরিয়া যেরূপ ঘণ্টার কাঁটাকে ঘোরায় সেইরূপ মাসচক্র ১২ বার ঘুরিয়া সম্বৎসর চক্রকে ঘোরায়। সম্বৎসর চক্রই বৃহত্তম চক্র নহে ; শাস্ত্রে সম্বৎসর চক্রের পর 'যুগচক্র', 'মন্বন্তরচক্র', 'কল্পচক্র', ও 'মহাপ্রলয় চক্র', এই চারিচক্রের অস্তিত্ব ও ইহাদের গতিতত্ত্ব বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। 'ক্ষণ', 'মুহূর্ত্ত', 'দিবস', 'পক্ষ' 'ঋতু', অয়ন', 'বৎসর', 'যুগ', 'মন্বন্তর', 'কল্প' ও 'মহাপ্রলয়'—কলনাত্মক কালের ইহারা বিশেষ-বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ-বিশেষ পর্ব্ব (পাব্ বা গ্রন্থি)।

জগতের ইতিহাস জানিতে হইলে, এই কলনাত্মক কালের আদ্যন্ত অপিচ ভূলোকাদি লোকত্রয়ের তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে জানিতে হইবে ; যে ইতিহাসে ক্ষণচক্র হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রের আবর্ত্তন এবং কোন চক্রের আবর্ত্তনে কিরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম ঘটে এই সংবাদ আছে, তাহাই প্রকৃত ও পূর্ণ ইতিহাস ; এক মাত্র ভারতের বেদশাস্ত্রই সেই সংবাদ দিতে সক্ষম।

ক্ষণচক্র হইতে প্রলয়চক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রই অহোরাত্রচক্র ; ক্ষণচক্রেও অহোরাত্রচক্রের হয় আবর্ত্তন, মুহূর্ত্তচক্রেও হয় অহোরাত্রচক্রের আবর্ত্তন এবং বৎসরচক্রও অহোরাত্র-চক্রের আবর্ত্তনাত্মক। গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিভবপ্রাদুর্ভাবই 'চক্র' শব্দের অর্থ। পরিচ্ছিন্ন "কাল" ও "ক্রিয়া" একই অবস্থা ; ক্রিয়ামাত্রই ত্রিগুণপরিণাম, তাই সকল পরিণামই ক্রমপরিণাম বা চক্রাবর্ত্ত। জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম,

অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টী ভাববিকার আবর্ত্তন করে অবিরাম পর্য্যায়ক্রমে। উষা ও রাত্রি সদা আবর্ত্তন করে পর্য্যায়ক্রমে, ইঁহাদের পর্য্যায়ক্রমে আগমন-প্রত্যাগমনের—আবির্ভাব-তিরোভাবের নাই বিরাম, ইঁহাদের প্রবৃত্তির নাই অন্ত; 'উষা' ও 'রাত্রি' উভয়েই হন অমরণধর্ম্ম বা অমৃত।

তিথি = গমনার্থক √অত + ইথিন্ ক; অথবা বিস্তারার্থক √তন (তনু বিস্তারে) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এই তিথি শব্দ যে কালবিশেষ বর্দ্ধমানা কিংবা ক্ষায়মানা এক চন্দ্রকলাকে করে বিস্তার, সেই কাল বিশেষটুকুকে বলে 'তিথি'; অথবা, যথোক্ত কলা দ্বারা যাহা হয় বিস্তারিত, তাহা 'তিথি'।

স্কন্দপুরাণোক্তির মর্ম্ম—"আধারশক্তিরূপা যে মহামায়া দেহীদের দেহধারিণীরূপে সংস্থিতা, তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ-ভাগ দ্বারা পরিচিতা চন্দ্রদেহধারিণী অমা নাম্নী 'মহাকলা'-নামে প্রোক্তা; ইনি ক্ষয়োদয় রহিতা অর্থাৎ ইঁহার নাই ক্ষয় বা উদয়; ইনি নিত্যা তিথি। আরও, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—চন্দ্রমার এক উদয় হইতে দ্বিতীয় উদয় পর্য্যন্ত কালের নাম তিথি। প্রথম কলা ক্রিয়ারূপা 'প্রতিপৎ' এবং দ্বিতীয়াদি কলা ক্রিয়ারূপা দ্বিতীয়াদি। 'ক্রিয়াই কাল'—অথবা "ক্রিয়াজ্ঞানই কালজ্ঞান"।

তিথিভাগ—দ্বাদশ সংখ্যক মাসাত্মক বা মেষাদি রাশ্যাত্মক অর

(Spoke of a wheel) ○ রাশিচক্র
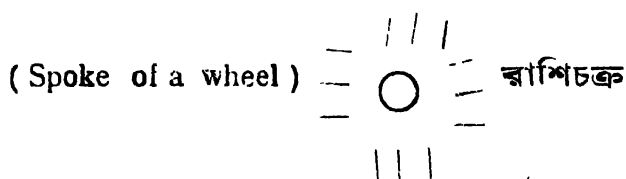
সত্যস্বরূপ সনাতন অবিচল আদিত্যচক্র পুনঃ পুনঃ করিতেছে আবর্ত্তন; ইহাতে স্ত্রী-পুরুষরূপে পরস্পর মিথুনীভূতা ৭২০ (৩৬০

দিন+৩৬০ রাত্রি) সূর্য্যসন্তানস্বরূপ (সূর্য্য হইতে উৎপন্ন) অহোরাত্র (=তিথি) ভোগ হয় ।

"দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্ব্বর্ত্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য ।

আপুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ" ॥

[ঋগ্বেদসং ২।৩।১৬]

অমবস্যা ও পূর্ণিমা—যে তিথিতে চন্দ্র অদৃশ্যভাবে উদয় হয়, সূর্য্যেন্দুসঙ্গম অর্থাৎ অমা (সহ)+বাসকরণে√বস+য অধি+আপ্ অর্থাৎ যে তিথিতে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য সহিত সম সূত্রে বাস করে এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্র রেখা ও সূর্য্যরেখা মিলিত হ'য়ে এক রেখায় পরিণত হয় (১৮০) তাহাই **অমাবস্যা** ; যে তিথিতে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে চন্দ্রের সপ্তম্ রাশিতে অবস্থান রূপ যে অত্যন্ত দুরস্থিতি তাহাই **পূর্ণিমা**।

শব্দের শক্তি

ইতিপূর্ব্বে কথিত যে, কারণের মতই অদৃশ্যা তাঁর চিরসহচরী শক্তি ; শক্তিদেবীর সর্ব্বপ্রধম অভিব্যক্তি নাদ বা শব্দ ; আবার এই শব্দের-ও আছে একটা শক্তি। এখন এই শব্দের শক্তিকথা কিছু বলা যায়—

শব্দ উচ্চারিত হইলে, যদ্দারা উহার ঠিক ঠিক অর্থবোধ হয় তাকেই বলে শব্দের শক্তি। শব্দের অর্থবোধক শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন (১) 'যোগ' (২) 'রূঢ়ি' (৩) যোগরূঢ়ি ; তাই শব্দও তিন প্রকার (১) 'যৌগিক' (২) 'রূঢ়' (৩) 'যোগরূঢ়'। উদাহরণে বলা যায়—যে পাক্ করে তাকে বলে পাচক' ; এই 'পাচক'-শব্দটী **যোগিক শব্দ**। কিন্তু, 'পঙ্কজ' শব্দটী, যার মানে পদ্ম তাহা হয় **যোগ**রূঢ় শব্দ, কারণ পঙ্ক হইতে পদ্ম ছাড়া অন্যান্য বস্তু জন্মিলেও, অন্য কোন কারণে (অর্থাৎ রূঢ়ি শক্তি দ্বারা) উহা পদ্মের বোধক হয় ; যাহা 'পদ্ম হইতে জন্মায়'—এই অর্থ **অন্য কোন শক্তি দ্বারা হয় নিয়ামিত**, তাই পদ্ম হইতে জাত অন্যান্য বস্তু না বুঝাইয়া পদ্মকেই বুঝায় ; এখানে যৌগিক শক্তিকে নিয়ামিত ক'রে, বিশেষিত করে ঐ রূঢ়ি শক্তি তাই পঙ্কজ

হয় যোগরূঢ় শব্দ। আরও, 'শিবরাত্রি'-শব্দটী হয় 'যৌগিক' শব্দ (শিবপ্রিয় রাত্রি) ; কিন্তু, যখন ঐ শব্দটী "শিবরাত্রি"টা হয় বিশেষিত—নিয়ামিত কালবিশেষে (মাঘ ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীই) 'রূঢ়ি' শক্তি দ্বারা তখন শব্দটী হ'য়ে দাড়ায় 'যোগরূঢ়'।

এখন এই শক্তির সমার্থশব্দ—সমনাম "তেজঃ"-শব্দটী শক্তির প্রতিশব্দ—ইহা সর্ব্বজন বিদিত। অতএব, তেজস্তত্ত্বও এই শক্তি আলোচনাবসরে যথাজ্ঞান লিখিত হইল। প্রকৃতিরাজ্যের পঞ্চভূতের অন্যতম ভূত এই তেজঃ—তৃতীয়-স্থানাধিকারী মধ্যস্থভূত ; ইহার উর্দ্ধে মরুৎ**ব্যোম** ও ইহার অধস্তান অপ্-ক্ষিতি ; যেমন, "ক্ষিত্যপ্-**তেজঃ** মরুদ্ব্যোম্"। এই মধ্যস্থভূত "তেজঃ"-ই যেন উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অপ্ ও মরুৎ-এর উপর করে প্রভূত্ব। এই তেজঃ শব্দটীর ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থবিচার—√তিজ+অসুন্ (উণা' ৭।১৮৮) ; তিজ ধাতু মানে নিশান=[নি+√শো (তীক্ষ্ণ করা' শান্ দেয়'—তেজনা)+অনট্ ভা] অর্থাৎ তনূকরণ ও পালনকরণ। নিরুক্তিতে জলার্থেও ব্যবহৃত এই তেজঃ শব্দটী যেমন—

অগ্নে যত্তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যো ॥
বায়ো যত্তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যো ॥
সূর্য্য যত্তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যো ॥
আপ যদ্বস্তেজস্তেন তমতেজসং কৃণুত
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ। [অথর্ব্ববেদসংহিতা]
"বায়ুর্ব্বা অগ্নেস্তেজঃ, তস্মাদ্বায়ুরগ্নিমন্বেতি"

সংস্কৃত শব্দই বিজ্ঞান। এই সমস্ত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য ও অথর্ব্ববেদসংহিতায় উদ্ধৃত মন্ত্রে ব্যবহৃত তেজঃ শব্দটীর অর্থ চিন্তা করিলে অগ্নি ও জল একই পদার্থ বলে প্রতিপন্ন হয়। সন্মাত্ররূপ পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তির (Mood, Temper, Temperament তথা Temperature) গতির বেগবৃদ্ধিতে হয় **তাপ**, যার রূপ অগ্নি ; এবং

তদ্বিপরীতে হয় **শৈত্য**, যার রূপ সলিল ; একই পদার্থের অবস্থান্তরে দুই রূপ ; এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য যেমন—একই মনোরসের দুইটী দিক—অনুরাগ (=রাগ) ও বিদ্বেষ (=দ্বেষ)।

বৈশেষিক দর্শন (২।১।৩) বলেন, "তেজো রূপস্পর্শবৎ" অর্থাৎ—রূপ ও স্পর্শ এই দুই গুণবিশিষ্ট তেজঃ পদার্থ। রূপই তেজের বিবিধ-বর্ণযোনি—অর্থাৎ তেজঃ হইতেই বিবিধবর্ণের হয় বিকাশ। "রূপ" যখন তেজের বিশেষ গুণ, তেজ ব্যতীত অন্যভূতে যখন রূপ বিদ্যমান প্রায়-নাই, তখন বলা যায় ভূতসকল স্বয়ং প্রায় বর্ণহীন। আমরা যাহা উপলব্ধি করি তাহা স্থূলপঞ্চভূত ; এবং স্থূলপঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের (=শব্দস্পর্শাদি) পঞ্চীকৃত অবস্থা—"তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি" (সাং দং ১।৬১)—অর্থাৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচনানুসারে **বায়ু (=Motion)** হয় অগ্নির তেজঃ, তাই অগ্নির সাথে সংযুক্ত থাকে সর্ব্বদাই বায়ু। আরও ইহা সুবিদিত যে অপ্ বা সলিলের গুণ শৈত্য। ত্বকের (=স্পর্শেন্দ্রিয়) সন্নিকর্ষবশতঃ অগ্নির যে ক্রিয়া হয় তাহার **উপল**ব্ধি, এবং জলের সহিত সেই ত্বকের স্পর্শক্রিয়ার **উপল**ব্ধি—এই দু'টী উপলব্ধি **ভিন্ন-রকম** বলিয়া অগ্নিকে "অগ্নি" এবং জলকে "জল" বলিয়া (অর্থাৎ এই বস্তু দু'টীকে পরস্পর পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথগ্‌রূপে) বোঝা যায়। অগ্নি=উষ্ণাত্মক তেজঃ, সলিলের শৈত্য বা সোম=শীতাত্মক তেজঃ। অগ্নি বা তাপের ধর্ম্মকর্ম্ম=আণবিক বিশ্লেষণ এবং প্রসারণ ; আর, শৈত্য বা সোমের কাজ=আণবিক আকুঞ্চন। কণাদের বৈশেষিক দর্শন (৫।২।৮) বলেন, "অপাং সংঘাত বিলয়নঞ্চ তেজঃ-সংযোগাৎ" ; ইহার মর্ম্ম এই যে জলের **সংঘাত** (=ঘনীভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ বরফ—solidification) এবং জলের **বিলয়ন** (=দ্রবী-ভাবপ্রাপ্তি ও বাষ্পীয়ভাবপ্রাপ্তি)—এই দুই পরিণামই ঘটে তেজঃ-

সংযোগ দ্বারা। অসঙ্কোচেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আকুঞ্চন (Contraction) ও প্রসারণ (Expansion) উভয়ই তেজের কার্য্য – ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা। যে শক্তি দ্বারা পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর হয় সংহত (মিলিত) সেই শক্তিকে বলে আণবিক আকর্ষণ (molecular attraction)। **তাপশক্তি** ক্রিয়া করে এই আণবিক আকর্ষণের প্রতিকুলে (বিরুদ্ধে) অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লিষ্ট অণুগুলিকে করে বিশ্লিষ্ট, আর ঐ আণবিক আকর্ষণের অনুকুল হয় **শৈত্য-**শক্তি। সুতরাং তাপ ভেদবৃত্তিক (Separating বা Repulsing) ও শৈত্য সংসর্গবৃত্তিক (aggregating বা attracting)। কর্ম্ম-মাত্রই ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি-নিষ্পাদ্য ; পুংশক্তিই সবিতা বা প্রবৃত্তি (= Attractive force) এবং স্ত্রীশক্তিই সাবিত্রী বা সংস্ত্যান (Repulsive force)। পরস্পর বিরুদ্ধ এই দ্বিবিধশক্তি-নিষ্পাদ্য প্রতিটী জাগতিক কর্ম্ম ; কেবল-ভেদবৃত্তিক বা কেবল-সংসর্গবৃত্তিক শক্তি দ্বারা কোনপ্রকার কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তন হ'তে পারে না সংঘটিত। শক্তির বৈষম্যভাব হইতে প্রসূত এই জগৎ ; কেবল-ভাব (= শক্তি সাম্য) জগতে থাকা সম্ভব নহে। পরিবর্ত্তনের জন্য চাই অবশ্য বৈষম্যভাব—কর্ম্মাত্মক। [বিঃ দ্রঃ – পরিবর্ত্তন = পরি + √বৃৎ (= থাকা) ভাববাচ্যে ল্যুট + অনট্ ভা ; এইরূপে নিষ্পন্ন পরিবর্ত্তন শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হচ্ছে বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তন—অবস্থান, অর্থাৎ পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়া অপরভাবে সংক্রমণ (= আগমন)। আবার জগৎ-শব্দটী নিষ্পন্ন √গম + ক্বিপ্ প্রত্যয়ে]

নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ভাবই জগৎ ; পরিবর্ত্তনের এইরূপ লক্ষণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়—পরস্পর বিরুদ্ধশক্তিদ্বয়ের (তাপ ও শৈত্য) যুগপৎ অনুভূতিই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি। কারণের আত্মভূত অর্থাৎ শক্তির পূর্ব্বভাবই কারণ-**সন্মাত্র ;** শক্তির পরভাবই কার্য্য বা শক্তির আত্মভূত। সুতরাং কার্য্যের পূর্ব্বভাব হয় শক্তি এবং শক্তির

অপর ভাব হয় কার্য্য। একই ভাব বা সন্মাত্র-সত্তা পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে যথাক্রমে শক্তি ও কার্য্য নামে কথিত।

তাপের হ্রাসবৃদ্ধিতে পরমাণুপুঞ্জের গতির যথাক্রমে হয় হ্রাস ও বৃদ্ধি; পরমাণুগুলির পরস্পর সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষও ঘটে তাপেরই ন্যূনাধিক্যে। তাপ একটী বিশ্বব্যাপী শক্তিতরঙ্গ; এই তরঙ্গে পদার্থ মাত্রেরই পরমাণুপুঞ্জ তরঙ্গায়িত।

আবার, জীবদেহে যেসব শক্তি, তাহা আসে উদ্ভিদ্ হইতে; এবং উদ্ভিদ্ শক্তি আসে সূর্য্য হইতে। অতএব সূর্য্যই সর্ব্বপ্রকার জৈব-শক্তির কারণ বা আদি উৎপত্তিস্থান। সৌরতাপ ও সৌরালোকের উৎপত্তি বোধ হয় মাধ্যাকর্ষণশক্তি হইতে; তাই সম্ভবতঃ সমগ্র জীবনীশক্তির আত্মরূপ ঐ মাধ্যাকর্ষণশক্তি—ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিত শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক Dr. Landois-সাহেব মহাশয়ের অভিমতের মর্ম্ম। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত স্বরূপই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই নিশ্চিত। [দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১০]। যাই হোক, মাধ্যাকর্ষণ বস্তুতঃ ত্রিগুণপরিণাম এবং ইহা সাংস্থানিক সংসর্গবৃত্তিশক্তি. আণবিক আকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ স্বরূপতঃ এক। প্রাচীন অথর্ব্ববেদ সংহিতা বলেছেন—"য একমোজস্ত্রেধা বিচক্রমে" অর্থাৎ সূর্য্য স্বকীয় এক ওজঃকে (স্বীয় এক-তেজঃ-বা-শক্তিকে) বায়ু, অগ্নি ও সোম এই ত্রিধা বিভাগপূর্ব্বক ধারণ ক'রেছেন জগদ্দেহ।

শাস্ত্রকথায় বিশ্বজগতের সকল পদার্থই অগ্নীষোমাত্মক, জগতে এরূপ পদার্থ নাই যাহা শুদ্ধ আগ্নেয়, বা শুদ্ধ সৌম্য। জীবের শরীর অগ্নীষোমাত্মক: শরীর রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় অবশ্য-অদনীয় খাদ্য দ্রব্যসমূহকে সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই ভাগে ভাগ করিলে ভাল হয়; পোষকপদার্থরূপে নির্ব্বাচিত খাদ্যসমূহও কিয়ৎপরিমাণে তাপোৎ-পাদক। শ্বেতসার, শর্করা নানাবিধ তৈল ও বসা ইত্যাদি দ্রব্যসমূহ শরীরতাপ রক্ষায় বিশেষ উপযোগী। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রমতে

অঙ্গার (=carbon) ও জলজনক (hydrogen) এই দু'টী প্রধান দাহ্য মূল পদার্থ; প্রাচ্যের শ্রুতিও পূর্ব্বেই ব'লেছিলেন পৃথিবী-ও জলকে **"ভোগ্যভূত"** কেন? তাহাই চিন্তনীয় এখানে। বেদাদিশাস্ত্র পাঠে জানা যায়, জগৎটাই জন্মেছে অগ্নি (=তাপ) ও সোম (=অপ্) এই দু'টী পদার্থ দ্বারাই; এই জগৎ অন্ন ও অন্নাদ এই পদার্থদ্বয়ের মিলিত মূর্ত্তি; অন্ন (=ভোগ্য) হয় সোম (=অপ্), অন্নাদ (=ভোক্তা) হয় অগ্নি (=তাপ্)। অগ্নি ও সোম, ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্য এবং আরও পরস্পর পরস্পরের কারণ; অগ্নি উদ্গিত হয় বায়ব্যাত্মক সোমশক্তি হইতে।

ইহা সুবিদিত যে বাহিরের বায়ু-বা-জল অপেক্ষা জীবের শরীর-সন্তাপ (Body temperature) অধিকতর। ইহার কারণ—প্রাচীনমতেঃ—তাপ হয় একটী সূক্ষ্ম, ভারহীন, তরলপদার্থবিশেষ; ইহা প্রত্যেক মূর্ত্তপদার্থের আণবিক অবকাশ (inter-atomic spaces) অধিকার পূর্ব্বক থাকে বিদ্যমান, এবং এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে করে সঞ্চরণ; যে পদার্থ হইতে ইহা নিষ্ক্রান্ত হয় তাহা হয় শীতল এবং যে পদার্থে ইহা প্রবেশ করে তাহা হয় উষ্ণ। নবীন মতে—তাপ হয় পদার্থের অবস্থান্তর ছাড়া অন্য কিছু নহে; পদার্থের অণুগুলির কম্পন বা স্পন্দন হইতে (molecular vibration) তাপের হয় উদ্ভব; আণবিক কম্পন যে পরিমাণে হয় দ্রুত সেই পরিমাণে পদার্থ হয় উষ্ণ; আণবিক কম্পন অত্যন্ত দ্রুত হইলে আলোকের হয় অভিব্যক্তি।

শারীরপ্রবৃত্তিশক্তির (kinetic energy) অবাধিত অভিব্যক্তিই শরীরসন্তাপ (Body temperature); শারীরপ্রবৃত্তিশক্তির অবাধিত অভিব্যক্তি শারীর-অণুসমূহের প্রকম্পন-বা-স্পন্দন কারক। আহারের সহিত, অপিচ শ্বাসগ্রহণকালে বায়ুস্থ oxygenর সহিত

আমরা যে সঞ্চিত-নিশ্চল-নিদ্রিত, কর্ম্মক্ষম শক্তি (potential energy) করি আহরণ, তাহাই শরীরসন্তাপের অন্তিম উৎপত্তিস্থল।

প্রত্যেক রাসায়নিক সংযোগ-ও-বিশ্লেষব্যাপারে তাপের হয় উৎপত্তি। অঙ্গারক দ্রব্যসমূহের মধ্যে (organic substances) যাহারা খাদ্য তাহারা C, H, O, N এই অমিশ্রভূত চতুষ্টয়ের সাংযৌগিক; ভুক্ত অঙ্গারক পদার্থের পরিপাক-বা-সন্দাহকালে কার্ব্বন (C) অক্সিজেনের (O) সাথে সংযুক্ত হইয়া হয় কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড্ (cabon dioxide CO_2 এবং হাইড্রজেন (H) অক্সিজেনের (O) সাথে সংযুক্ত হইয়া হয় জল (H_2O); এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে ঘটে তাপের উৎপত্তি; আরও, সাধারণ শরীরবিধানের (কোন বিশেষ পদার্থের নহে) রাসায়নিক-পরিণাম-সন্দাহ হইতেও উৎপন্ন হয় শরীরসন্তাপ (body temperature)।

এই শরীরসন্তাপ যে **প্রাণাগ্নিহোত্রযজ্ঞসম্ভূত**—তাহা বেদেরই উপদেশ। শুক্লযুজর্ব্বেদসংহিতায় আছে—"অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ"। নাভি-শব্দ = √নহ (বন্ধনে, to tie) + ইঞ র্ম্ম; সং পুং। ইহার শব্দার্থ—রথচক্রমধ্যমণ্ডল, কেন্দ্র, সম্রাট্, বা বেদের ইন্দ্র; ইহার ভাবার্থ = কারণ বস্তু। এ যজ্ঞ গৃহস্থ-পুরোহিতের দ্বারা হোমকুণ্ডে প্রদীপ্ত অগ্নিতে নহে ঘৃতনিক্ষেপ; পরন্তু ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ, যাহা চলিতেছে অহরহঃ এই ব্রহ্মাণ্ডে। এই অগ্নিতাপের প্রধান উৎস = সেই পরমাত্মার অন্তঃস্থিত; তাঁহার ইচ্ছারূপে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত; অথবা, যেন আকাশ-আধারে মরুৎ মহাশয়ের সবেগ গতাগতির ধাক্কায় ও ঘর্ষণে উদ্ভূত এই **তাপ** তেজঃরূপে এবং যুগপৎ সাথে সাথে আবির্ভাব **অপ্** দেবীরও—ঠিক যেন সস্ত্রীক সাজিলেন স্থূল সৃজন-কর্ম্মের জন্য। সমস্ত সৃষ্টিই অগ্নিষোমাত্মক।

বেদাদিশাস্ত্র "অপ্" বলেন তাহাকে—সেই শক্তিকে, যে শক্তি দ্বারা সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত কারণগর্ভে বিলীন এই বিশ্বজগৎ স্থূলভাব প্রাপ্ত

হয়; বিশ্বের সংস্ত্যানশক্তিই (Aggregative power) বেদের অপ্। আরও, নিরুক্ত নৈগমকাণ্ডের বাক্য—"ক্রিয়া আপো ভবন্তি স্ত্যায়নাৎ"; যাস্কমুনির টীকায়—স্ত্যায়নাৎ সংহননাৎ ইত্যর্থঃ, আপ এব হি পার্থিবানামবয়বানাং সংহননে হেতুভূতা ভবন্তি।" অতএব সংস্ত্যান বা স্ত্রী-শক্তিই যে "অপ্" এই শব্দের মুখ্য অর্থই তাহা।

পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার এই সংস্ত্যানশক্তিকেই বলেন "স্ত্রী"; "সংস্ত্যানাং স্ত্রীপ্রবৃত্তিশ্চ পুমান্।" বেদ এই অপ্‌কেই—সংস্ত্যানশক্তিকেই মাতৃশক্তিরূপে ক'রেছেন স্তুতি [সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্রাদি এবং উপনয়ন উপহার ২য় ভাগ পৃঃ ১১৭ দ্রষ্টব্য]।

আরও, অথর্ববেদসংহিতা ৩।১৩।২ মন্ত্র যথা—

"যৎ প্রেষিতা বরুণেনাচ্ছীভং সমবল্‌গত।
তদাপ্নোদিন্দ্রো বো যতীস্তস্মাদাপো অনুষ্ঠন্॥"

মর্ম্ম ঃ—বরুণ অথবা আদিত্য (=বিশ্বের সম্রাট্ বা পরমেশ্বর) কর্ত্তৃক প্রেরিত অপ্‌সমূহ যখন সম্ভূত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল অর্থাৎ স্পন্দিত হ'তে লাগিল, তখন ইন্দ্র (=electricity) স্পন্দনশীল অপ্‌কণাগুলিকে **প্রাপ্ত** হইয়াছিলেন—যেন গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়েছিলেন, কথান্তরে তাড়িতা-বদ্ধ হ'য়েছিল (electrified) অপ্‌সমূহ। [প্রাপ্ত=প্র (প্রকৃষ্ট-রূপে) + √আপ (পাওয়া)⋯ক্ত]। তাই ঐ আলিঙ্গনাবদ্ধ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সংস্ত্যানশক্তিগুলির নাম হইল "**অপ্**।" এই মন্ত্রটিতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের স্বরূপ দেখানো হয়।

বশিষ্ঠদেবের অমূল্য স্বল্পাক্ষর সারবান্ উপদেশ—

"অগ্নিষোমৌ মিথঃ কার্য্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্য্যায়েন সমং চেত্তৌ প্রজীষেতে পরস্পরম্॥" (যোগবাশিষ্ঠ)

বায়ব্যাত্মক সোমশক্তি হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে সোমের হয় আবির্ভাব। অগ্নি ও সোম ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্য এবং

পরস্পর পরস্পরেরের কারণরূপে ব্যবস্থিত, ইহারা উভয়েই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করার (=দমিয়ে দেবার) চেষ্টা করে। একবার অগ্নির জয়, অন্যবার সোমের জয়। কার্য্যকারণভাবের দ্বৈবিধ্য—যাহা না হ'লে যাহা হয় না, যদ্ব্যতিরেকে যাহার সিদ্ধি অসম্ভব, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী—তাহাই তাহার কারণ।

উপসংহারে বলা যায়—এক অখণ্ড মহতীশক্তি—চিতিশক্তি (=অখণ্ড চৈতন্যসত্তার সহচরী) অথবা খোদ ব্রহ্ম যখন যেভাবে আপনাকে প্রকাশিত করেন, তখন তিনি সেইরূপ ভাবেই বিভিন্ন নামে ও রূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার একত্বের কোন হানি হয় না। তাই ভারতের সনাতনধর্ম্মনিষ্ঠ সজ্জনরা ৩৩ কোটী দেবতা দর্শন করিয়াও অদ্বৈতবাদী-প্রায়। এই ধন্য দেশের জনগণ এমনই শক্তিবাদী ও চৈতন্যদর্শী যে, কোনও স্থানে কোনরূপ বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ দেখিলেই তাহাকে একটা জড়শক্তি মাত্র না দেখিয়া, উহাকেই দেবতা বলিয়া করে পূজা।

শক্তির কার্য্য—এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড দেখেই অনুমিত হয় শক্তির সত্তা। শক্তি নিজে যদি ধরা না দেন তাহ'লে শক্তির সন্ধান পাওয়া শক্তিসাধকদের দুঃসাধ্য বা অসাধ্য।

১১। শক্তির কার্য্যকর্ম্ম ও আনন্দ

ইতি পূর্ব্বেই কথিত হ'য়েছে—এই পরিদৃশ্যমান সারা জগৎটাই শক্তির কার্য্যকর্ম্ম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার **সন্মাত্র** অংশটুকুতে নাই কর্ম্মের কোন লক্ষণ; তাই তাহাকে বলা হয় **নির্গুণব্রহ্ম** এবং তাঁর "চিৎ" বা "শক্তি" অংশই সর্ব্বকর্ম্মের উৎস তাই তাকে বলে **সগুণ-**

ব্রহ্ম। মাত্র সৎ স্বরূপটীর (বা-সত্যের) উপলব্ধি হইলে ক্রমে শক্তি-সাধকের পিপাসার তীব্রতা-অনুসারে, "চিৎ" (বা শক্তির) ও "আনন্দ"-স্বরূপও হইবে প্রতীতিযোগ্য। সৎ বা সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাতে যাহা কল্পনামাত্র বলিয়া মনে হইত, এখন হইতে তাহা বাস্তব সত্যরূপেই হয় অনুভূত; যেহেতু এই সৎ-বস্তুটী প্রত্যক্ষ; ইহা কোনরূপ অনুমান বা কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে হয় না। ইহা এত স্থূল, এত ঘন যে, জাগতিক পদার্থসমূহের স্থূলতা যেন এই নিশ্চল সত্তার নিকট ছায়া মাত্র বলিয়া বোধ হয়। সাধনাজগতে অনুমান বা অপ্রত্যক্ষ-যতদিন থাকে ততদিন সাধনার সূত্রপাত হয় না: সাধনার প্রতিপদে কিছু-না-কিছু প্রত্যক্ষ, কিছু-না-কিছু লাভ হইবেই। যখন আসে এইরূপ প্রত্যক্ষতা, তখনই সাধনা হয় সরস ও মধুময়; এবং তখন হইতে আর সাধনাকে একটা নীরস ও কষ্টসাধ্য কর্ম্মবিশেষ মাত্র মনে হয় না। যাঁরা সাধক, অথচ এ পর্য্যন্ত কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তাঁরা, বুঝিতে হইবে, অনুষ্ঠান করিতেছেন সাধনারূপ মৃতকর্ম্মের। তাঁদের উচিত সাধনকর্ম্মকে চৈতন্যময় (=প্রাণশক্তিময়) করিয়া লওয়া, তাহ'লেই সব কর্ম্মই হবে সরস ও মধুময়। সৌর-গাণপত্য-বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত-জৈন-বৌদ্ধ-যবন-ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধক সম্প্রদায়ই যথার্থ অমৃতের সন্ধান পাইতে পারেন, যদি তাঁরা স্ব স্ব সাধনার প্রণালীগুলিকে সত্যের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনকর্ম্মে করা চাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা; প্রাণ-হীন সাধনকর্ম্ম প্রায় মৃতকর্ম্ম বা শবদেহমাত্র; প্রাণহীন কতকগুলি বাহ্য আচার অনুষ্ঠানমাত্র কখনও কর্ম্মানন্দ দিতে পারে না—সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না অর্থাৎ সত্য বা পরমাত্মপ্রকাশে সমর্থ হয় না; বরং অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারকে আরও নিবিড়তর ক'রে তোলে। সম্প্রদায়-গত, নামগত, আকারগত, অনুষ্ঠানগত অসংখ্যভেদ ও বহু বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ বহু বিভিন্নতার মধ্যে একটী অখণ্ড রসপ্রবাহ

= সৎ + চিৎ + আনন্দস্বরূপ প্রাণ সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে অনুস্যূত। ঐ রসপ্রবাহটীর দিকে লক্ষ্য রাখিলেই সকল সাধনাই অভিন্ন ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয়। শুধু এই সত্য-বস্তুটাকেই বাদ দিয়াই ধর্ম্মসাধকগণের মধ্যে নানারূপ সাম্প্রদায়িকতা স্বমতের প্রাধান্যস্থাপন, পরমত খণ্ডনে প্রয়াস প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা পায় প্রকাশ। অকপট সাধকের লক্ষ্য—সচ্চিদানন্দ লাভ; সচ্চিদানন্দই জীবের স্বরূপ। কর্ম্মের সর্ব্বাবয়বে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে সাধককে; তবেই কর্ম্ম হবে জ্ঞানময়; জ্ঞানের ঘনীভূত বিকাশই কর্ম্ম; অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম একই বস্তু; কর্ম্ম নহে অজ্ঞান। যে জ্ঞানের সন্ধানে সাধক করিতেছে সাধনা, যে জ্ঞান অমৃতের নিদান, সেই জ্ঞানই কর্ম্মের আকারে জ্ঞানী সাধকের নিকট প্রকাশ পাইতেছে—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই গীতায় উপদিষ্ট "ব্রহ্মার্পণম্" মন্ত্রটী সিদ্ধ হইবে—চৈতন্যময় হইবে; এবং সাধক উপনীত হইতে পারিবে ব্রহ্মত্বে; তাঁহার জীবত্বের অব্যয় গ্রন্থি হইবে ছিন্ন। যতদিন কর্ম্মের মধ্যে এই শাশ্বত জ্ঞানকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিন কর্ম্ম কেবল পার্থিব ভাবেরই করে সেবা।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ [গী ৪।২৪]

একমাত্র মহতী চিন্ময়ীশক্তির পূজারী বা এই-বিরাটব্রহ্মদর্শন-কারী সাধকই লাভ করেন তাঁর আশীর্ব্বাদ "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্"। যে সাধক দেখিতে পান—তাঁহার প্রত্যেক ইঙ্গিত, প্রত্যেক প্রচেষ্টা, প্রত্যেক চিন্তা, প্রতি অঙ্গসঞ্চালন, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে সেই চিন্ময়ী মহতী শক্তিরই পূজা হইতেছে নিষ্পন্ন, যিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন—"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাত-স্তদেব তব পূজনম্", মাত্র তিনিই "ব্রহ্মার্পণং"-মন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারই জন্মমৃত্যুর ধাঁধা হইয়াছে দূরীভূত চিরতরে।

যতদিন ধর্ম্ম্যকর্ম্মসমূহ, কেবল ধর্ম্ম্যকর্ম্ম নহে—সকল কর্ম্মই

জ্ঞানময় না হয় অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানই যে কর্ম্মের আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এই বোধ যতদিন বিকাশ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন কর্ম্মগুলি "অহং" বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "অহং"-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলেই উহা অকল্যাণকর এবং পরিণাম-বিরস। কর্ম্মমাত্রই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দেবারাধনা। আবার দেবারাধনামাত্রই কর্ম্ম ব্যাপকার্থে কর্ম্ম শব্দটীর অবান্তর বহু বিভাগের মধ্যে প্রধানতঃ কয়েকটীর (যেমন, (i) সেবা—দেবসেবা, পিতৃমাতৃসেবা, পতিসেবা, গোসেবা ইত্যাদি (ii) রোগার্ত্তের পরিচর্য্যা-সেবা, এবং (iii) ভোজনকর্ম্মকেও ভারতীয় বিনয়সূচক কায়দায় বলা যায় "সেবা-করা") আলোচনায় দেখা যায়—সেব্যের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনই কর্ম্মের রূপ। কর্ম্মের সর্ব্বাবয়বের সহিত পরিচয় করাই আনন্দবর্দ্ধক। নিষ্কর্ম্মা-নির্গুণ ব্রহ্মেরই হয় সর্ব্বপ্রথম পরিবর্ত্তন সগুণব্রহ্মে এবং পূজা বা আরাধনা করা হয় এই শেষোক্ত সগুণব্রহ্মেরই। এই সর্ব্বপ্রথম মহাপরিবর্ত্তন থেকে পরবর্ত্তী সব পরিবর্ত্তনেরই রূপ কর্ম্ম। পরিবর্ত্তন, সংসার, জগৎ ও কর্ম্ম—এই সকল পদবোধ্য অর্থ সমান; ইহারা একার্থবোধক, সকলেরই লক্ষ্য পদার্থ এক। পরিবর্ত্তন বা একভাব হইতে অন্যভাবে যাওয়াই সংসারের স্বরূপ। "পরিবর্ত্তন" পদটী নিষ্পন্ন এই রূপে—পরি + √বৃৎ (বর্ত্তনে to exist) + ভাববাচ্যে ল্যুট; "পরি"-উপসর্গ = বর্জ্জন বা ত্যাগ; ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ = পূর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়া অপরভাবে সংক্রমণ। জগৎ সম্বন্ধীয় যে কোন অনুভূতিই হউক না কেন, তাহাই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি। প্রত্যেক জাগতিক ভাবই আদ্যাশক্তি পরিচালিত ভব-সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র; অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল পদার্থই ঘাত-প্রতিঘাতজনিত শক্তিতরঙ্গ। বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য-শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যাদের সংহতরূপই বাহ্যজগৎ তাহারাও লীলাময়ী শক্তিস্রোতস্বিনীর এক-একটী তরঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কি তাপ-তড়িৎ, কি আলোক-চৌম্বকাকর্ষণ, সকলই তাই = আণবিক তরঙ্গ; জাগতিকভাবজাতগুলি

অনন্ত শক্তিসাগরে ক্ষণে উত্থিত, ক্ষণে পতিত, বুদ্বুদ্-বিশেষমাত্র। শব্দ-স্পর্শাদিগুণপঞ্চক সত্ত্বাদিগুণ (বা শক্তি)-ত্রয়েরই পরিণাম; সুতরাং ইহারা তদাত্মক। নিখিলমূর্ত্তক জাগতিক পদার্থও আবার শব্দস্পর্শাদিরই সংঘাতরূপ। অতএব জাগতিক অনুভূতিক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের অনুভূতি ও প্রত্যেক জাগতিক ভাবই মূর্ত্ত-ক্রিয়া। ঋগ্বেদসংহিতা (২।১।২২)-র উপদেশ "একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্তি"। নিয়ত পরিবর্ত্তন—সতত একভাব হইতে ভাবান্তরে গমন বা কর্ম্মই, তাহা হইলে সংসারের স্বরূপ, পরিণামই জগতের প্রকৃত আকৃতি। একভাব হইতে অন্যভাবে যাইতে হইলে, নিশ্চয়ই পূর্ব্বভাবের **ত্যাগ** এবং পরভাবের **গ্রহণ** চাইই চাই, অন্যথায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা কর্ম্ম হ'তে পারে না; অতএব **কর্ম্ম-মাত্রই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক।** ইহার কারণে বলা যায়—ভেদসংসর্গ বৃত্তিক সূক্ষ্মতম পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূল বায়্বাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আবার পরস্পরবিশ্লিষ্ট হইয়া, সূক্ষ্মাবস্থায় করিতেছে গমন। জগৎ যে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক তাহাতে নাই সন্দেহ; প্রত্যেক জাগতিক ভাবই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন, বীজ বীজভাব ত্যাগ করিয়া অঙ্কুর→বৃক্ষ→শাখাপ্রশাখা→পত্রপুষ্প→বীজ; ভ্রূণ ভ্রূণভাব ত্যাগ করিয়া→শিশু→কিশোর→যৌবন→প্রৌঢ়→বৃদ্ধ; পরিশেষে কোন অবস্থাতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া এ জগতের কোন বস্তুতেই যেন রুচি নাই ভাবিয়া যেন কোনও অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পথ খুঁজিতেছে অথবা স্বেচ্ছায়-বা-অনিচ্ছায় এই মায়ারাজ্য ছাড়িতেছে; দেশ সাগরে ও সাগর দেশে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং কালও পরিবর্ত্তনশীল শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত। এইরূপ ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তনের কারণে অনুমান হয়, বর্ত্তমান একটানা একঘেয়ে ভাবে অরুচি, তাই চায় ভাবান্তর অথবা বর্ত্তমান ভাবটী যেন খুঁজিতেছে তাহার কোন অজ্ঞেয় ঈপ্সিততমকে—প্রেয়কে—উপাদেয়কে; তাঁর খোঁজ না পেয়েই যেন ক'রছে ছুটাছুটি

পরিবর্ত্তনরূপে। এই পরিবর্ত্তনরূপ কর্ম্মেরই নামান্তর দেবারাধনা বা দেবপূজা বা দেবসেবা। পূজার স্বরূপ চিন্তা করিলে দেখা যায়,— (১) স্থূল পূজা—**সালোক্য** বা আধিভৌতিক অর্থাৎ প্রতিমারূপ জড়ত্বকে ভেদ করিয়া চৈতন্যলোকে = সূক্ষ্মচিন্তাশক্তিতে উপনীত হওয়া; (২) সূক্ষ্ম—সামীপ্য বা আধিদৈবিক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যলোকে উপনীত হবার পর যে-সমষ্টিচৈতন্যে অবস্থিত ঐ জড়ত্ব, সেই সমষ্টি-চৈতন্যের সমীপস্থ হওয়াই **সামীপ্য** ; (৩) কারণ—সারূপ্য বা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ যে সূক্ষ্মকারণরূপকেন্দ্র হইতে উক্ত চৈতন্য প্রকাশিত সেই কেন্দ্রে অগ্রসর হইয়া পূজারী প্রায় তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হ'ন, সেই অবস্থার নাম **সারূপ্য** ; (৪) কারণাতীত বা তুরীয় অর্থাৎ সর্ব্বশেষে যে অবস্থায় ভাগ্যবান্ পূজারী ভগবৎ কৃপায় নির্ব্বিশেষ "চৈতন্যস্বরূপে হ'য়ে যান্ সম্পূর্ণ সংযুক্ত অথবা নিখোঁজ সেই অবস্থারই নাম **সাযুজ্য** বা নির্ব্বাণ বা মুক্তি।

সর্ব্বভাবপ্রপূরক সর্ব্বভাবময় ভগবানে সকল ভাবকেই মিশাইয়া দেওয়াই, "আমার"—বলিয়া কিছু না রাখাই, "তিনিই সব—"তাঁহারই সব", "আমি তাঁহারই" এইরূপ ভাবকে দৃঢ় ও পূর্ণভাবে চিত্তে স্থান দিয়া তাঁহাতে বিলীন বা তন্ময় হওয়াই প্রকৃত পূজা। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক শুভকর্ম্মমাত্রই পূজা। হৃদয়কে রাগ-দ্বেষাদি দোষরহিত করা, বাক্যকে অনৃতাদি দোষ বা মলমুক্ত করাই পূজা। "পরমাত্মাই সব" ও "সবই তাঁর"—এইরূপ জ্ঞানের বিকাশেই হয় প্রকৃত পূজা। পূজা কী? উপাস্যের স্বরূপ কী?—যথার্থ ভাবে তাহা না জানিলে যথার্থ পূজা হয় না। পূজা-করা জগতের জগত্ব; প্রাকৃতিক নিয়মে আস্তিক নাস্তিক, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, ভক্ত-যোগী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত সারে নিশ্চয়ই করেন অল্পবিস্তর পূজা; অধিক কি পরমাণুপুঞ্জও করে প্রেমাস্পদের পূজা; সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিও অন্তঃস্থ চেতনাপুরুষের করেন পূজা!! পূজ্যের সাথে পূজারীর মিলিত হবার

চেষ্টা, কেন্দ্র হইতে বহির্গতের কেন্দ্রাভিমুখে পুনর্গমনের চেষ্টা, অর্দ্ধের পূর্ণ হবার জন্য অপরার্দ্ধের সহিত সংযুক্ত হবার চেষ্টা, ভোক্তার সাথে ভোগ্যের মিলন চেষ্টা, ধনের (= Positive) সাথে ঋণের (= Negative) মিলন চেষ্টা এবং পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন প্রচেষ্টা মাত্রই পূজাপদবাচ্য। স্থিরচিত্তে জগতের দিকে তাকাইয়া থাকিলে বেশ অনুভব হয় নিখিল জাগতিক পদার্থ যেন পূজা করার জন্যই সতত চঞ্চল নিয়ত গতিশীল। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি লয় আবাহনাদি ক্রিয়াত্মিকা ভূততন্ত্র পূজা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। রসায়নতন্ত্র (Chemistry) ভূততন্ত্র (Physics), প্রাণবিদ্যা (Biology), মনোবিজ্ঞান (Psychology)ইত্যাদি সবই শেখায় পূজাতত্ত্ব। সামান্যের মধ্যে (= সার্ব্বভৌমিক সাধারণের মধ্যে) বিশিষ্টের আবিষ্কার—এই তো বিজ্ঞান। নিখিল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য—যে-সামান্যভাব বা একক হইতে বিবিধ-বিচিত্র বিশেষ-বিশেষ ভাবাপন্ন বিশ্ব নির্ম্মিত, তাঁরই—সেই এককের দর্শন লাভ। তিনিই চিতিশক্তি (One Cosmic Law কিংবা Absolute conscious Principle or Power)। এত কথার সংক্ষিপ্তসার মর্ম্ম এই যে চ্যুত বা পরিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি (Individual) চায় অচ্যুত বা অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টিতে (Aggregate) ফিরে যেতে চিরশান্তির আশায়। সেই প্রচেষ্টার নামান্তরই পূজা-সেবা-আরাধনা। তাই ব্যষ্টি সাধক নির্ব্বিকল্পসমাধিসাহায্যে মিলিত হ'তে চান নির্ব্বিশেষ বিরাট্ সমষ্টিরূপ সাধ্যে বা ঃ: ; কথান্তরে এই চ্যুত-বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি চায় ফিরে যেতে তাহার সেই অচ্যুত-নির্ব্বিশেষ-অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টিরূপ উৎসব্রহ্মে—দেবপূজা বা দেবসেবার চরম লক্ষ্য,—সংক্ষিপ্তসার সূত্রাকারে বলা যায়, "ব্যষ্টি চায় সমষ্টি"। একাধিক ব্যষ্টির যোগ ফলকে বলে সমষ্টি (= Aggregate); units of Individual tend to meet Infinity—the Aggregate of all.

কর্ম্ম মাত্রই যোগ; যোগশাস্ত্রের অষ্টাঙ্গযোগ (যম-নিয়ম-আসন প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা ধ্যান-সমাধি) যে কেবল ভগবৎ লাভের পক্ষেই উপযোগী তাহা নহে; যোগ ব্যতীত জগতের কোন কর্ম্মই হ'তে পারে না সম্পন্ন। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের (সং)-যোগের নামই কর্ম্ম। আনন্দঘনসত্তাবিশেষরূপ বিষয় এবং চিদ্‌ঘন বিশিষ্টশক্তি-প্রবাহরূপ ইন্দ্রিয় এই দু'টীর মধুর মিলন হওয়া চাই প্রতিটী কর্ম্মে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়—ভোজনকর্ম্মে ভোক্তাকে তাহার অন্যান্য কাজকর্ম্ম হ'তে তাহার চিত্তকে আবশ্যকমত কিছুটা অন্ততঃ সংযত করিতে হয়, ইহাই ভোক্তার (১) **যম;** ভোজনের পূর্ব্বে হস্তাদি প্রক্ষালন, ভোগ্য খাদ্যাদি যথাস্থানে সংস্থাপন ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যকীয় নিয়মকানুন অবলম্বন করিতে হয় ইহাই ভোক্তার (২) **নিয়ম;** ভোজনকালে যেরূপভাবে উপবেশন করিলে ভোজন-কর্ম্ম সুসম্পন্ন হ'তে পারে সেরূপ ভাবে উপবেশনের নাম ভোক্তার উপযুক্ত (৩) **আসন;** ভোজনকালে ভোক্তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির তারতম্য নিত্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক নিয়মিত হয়, ইহাই অষ্টাঙ্গের চতুর্থ অঙ্গ (৪) **প্রাণায়াম;** ভোজনকালে ভোক্তার ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে অন্যান্য বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন অভীষ্ট ভোজনকর্ম্মে বিনিয়োগ করার নাম (৫) **প্রত্যাহার;** ভোজনকালে ভোক্তার চিত্তকে ভোজন ও ভোজন হইতে তৃপ্তি-অতৃপ্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তির বা ভোজনাধিক্যের দিকে রাখিতে হয় লক্ষ্য যাহাকে বলা হয় (৬) **ধারণা;** ভোজনকালে ভোক্তার ক্ষুধা-নিবৃত্তি বা তৃপ্তি হইলেই ভোজনের হয় পরিসমাপ্তি, এইরূপ আহারবিষয়ক ভোক্তার একটু চিন্তাও হয় যাহাকে বলা যায় (৭) **ধ্যান;** ভোজনান্তে ভোক্তার পূর্ব্বোক্ত ধ্যান হইতে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী আত্মতৃপ্তিযোগ অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য ভোক্তার মনঃ তাহার আজ্ঞাচক্র স্পর্শ করিয়া আসে ও তাহারই জন্য তাহার ভোজন কর্ম্ম হয় নিষ্পন্ন—ইহাই অষ্টাঙ্গের চরম

অঙ্গ (৮) সমাধি। এইরূপ সর্ব্বত্র ; জীবের সমস্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে সাধিত হইতেছে এই অষ্টাঙ্গযোগ। মনুষ্যজীবনের সাধনায় সমাধিই চরম এবং পরম আনন্দ। আনন্দই সমাধির ধন।

প্রতিনিয়ত প্রতিকর্ম্মে মানবগণ অষ্টাঙ্গযোগের করে অনুষ্ঠান, উহা বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগরূপ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন পরিচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দেশ্যে হয় অনুষ্ঠিত। ঐ পরিচ্ছিন্ন আনন্দ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির, বা নির্ব্বিকল্প সমাধির অথবা সবিকল্প সমাধির লভ্য আনন্দ সিন্ধুর বিন্দু মাত্র। "আনন্দং ব্রহ্ম"। সচ্চিদানন্দময়ী মহতী চিন্ময়ীশক্তির সৎ-স্বরূপটী বিশিষ্ট ভাবে প্রতিভাত এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপ জড়পদার্থে ; তাঁর চিৎ স্বরূপটী প্রকটিত জীবরাজ্যে যেখানে চৈতন্য-সত্তার বিশিষ্টবিকাশ দেখা যায় ; আর তাঁর আনন্দ স্বরূপটি—ধর্ম্মটী বিশেষ ভাবে কেবল তাঁহাতেই বিদ্যমান, আনন্দ আর নাই কোথাও। একমাত্র চিচ্ছক্তিই আনন্দ-ঘনমূর্ত্তিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সুপ্রতিভাত। অবশ্য চিন্ময়ী মহতীশক্তি স্থূল জগদাকারে প্রকটিত হইয়া কথিতা হন জড়শক্তি নামে। প্রতি জীবে যে বিষয়ভোগজনিত আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় উহা সেই বিরাট্ আনন্দ সমুদ্রেরই এক একটি বিশিষ্ট বুদ্‌বুদ্‌মাত্র।

কর্ম্মমাত্রেরই একটা সাধারণ ফল আছে ; উহা হইতে হয় অভিজ্ঞতা যাহা হইতে লাভ হয় জ্ঞান ; এই জ্ঞানের উন্মেষ করাই কর্ম্মরূপিণী শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান নিত্য, সুতরাং অমৃত ; তাই কর্ম্মকে শঙ্কর বলেছেন "কর্ম্মফলং অমৃতম্"।

ইতিপূর্ব্বে কথিত যে (১) দেবপূজা বা দেবসেবারূপ পরিবর্ত্তন তাহা প্রায় পরোক্ষ ; আর পিতৃমাতৃসেবা ও পত্নীর পক্ষে পতিসেবা হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ই ; এখানে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন ; তবে (২) রোগার্ত্তের সেবা পরিচর্য্যাকর্ম্মেও আছে একটা পুণ্য ও আনন্দ তাহা অকপটসেবক মাত্র অনুভব

—ইহা স্বীকার্য্য ; এখানেও সেবা-পরিচর্য্যাকর্ম্মের (= NURSING) রূপ কেবল পরিবর্ত্তন আর পরিবর্ত্তন তাহা সবারই সুবিদিত। এখন (৩) "সেবা করা"-অর্থে যখন ভোজন কর্ম্ম হয় তাহারই **বিজ্ঞান-সম্মত** কথা এখানে আলোচ্য :—ভোজনকর্ম্ম তথা আহারকর্ম্মের আহার্য্যগুলি স্বভাবতঃ জটিল উপাদানে গঠিত যেমন শর্করাজাতীয় শ্বেতসার (carbohydrates C, H, O), অন্নসার (protein C H N, O, S যথাক্রমে কার্ব্বন, হাইড্রজোন, নাইট্রজেন, অক্সীজেন ও সালফার গন্ধক এই গুলির সাংযোগিক = অন্নসার ও দৈহিক উপাদানসার), বসা বা স্নেহসার বা তৈলাক্তবস্তু (fats C, H, O), অজৈব ক্ষারমসলা (Inorganic salts), জল ও খাদ্যপ্রাণবস্তু (vitamins)। অব্যবহিত পূর্ব্বেই কথিত সচ্চিদানন্দপরমাত্মশক্তি—মহতীচিতিশক্তি তাঁহার "সৎ" স্বরূপটী প্রকটিত করার জন্য ঘনীভূত হইয়া হ'য়েছেন জড়াকারে **সত্তম**, এই অবস্থায় কথিত হন জড়শক্তি (Potential Energy) নামে ; কথান্তরে, আহার্য্যগুলির কার্য্যকরী শক্তিটী এই অবস্থায় সুপ্ত-গুপ্ত-বা নিষ্ক্রিয় আহার্য্যগুলির-তথা জড়শক্তিদেবীর এই নিষ্ক্রিয়তা বা সুষুপ্তি সসম্মানে ভঙ্গ ক'রে তাঁর করে সেবা নিশ্চয়ই আহারকারী ; যেহেতু দীর্ঘকাল শক্তিদেবী তাঁর স্বভাবজক্রিয়মাণ গতিশীলতা (Kinetic energy) ভুলিয়া যেন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেন ; এবং আহারকারী সেই জড়শক্তিরূপ আহার্য্য-গুলি—খাদ্যগুলি আহার করিয়া খাদ্যগুলির জড়ত্বভঙ্গে সহায়তা না করিলে জড়শক্তিদেবীকে আরও দীর্ঘকাল জড়ত্বরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। এইরূপে নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদিত হইল যে, আদ্যাশক্তিদেবীকে তাঁহার জড়ত্ব (= আহার্য্যরূপে পরিণত অবস্থা) হইতে পরিত্রাণ করে আহারকারী ; কথান্তরে আহাররূপ পরিবর্ত্তন কর্ম্ম দ্বারা সে সেই আদ্যাশক্তিরই করে **"সেবা"**। অতএব, ইতরজীবের ক্ষুধানিবৃত্তিতে আহারসুখরূপ জগদানন্দ ছাড়াও, যে

-মনুষ্য "সেবা"-শব্দটীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা জানিয়া আহারাদি করে সেই ভগবৎসেবাকর্ম্ম করিয়া আত্মতৃপ্তিলাভ ও ভোজনকর্ম্মের পরমানন্দ করে উপভোগ। এইরূপে স্থূলকার্য্যরূপ পূজা হইতে সূক্ষ্ম-পূজার মাধ্যমে পূজারী অগ্রসর হয় ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতীত কারণপূজায় যেখানে লাভ করেন পরমানন্দ! নবপূজারী অবশ্যই জানিবেন—প্রত্যেক কার্য্যেই প্রয়োজন তিনটী জিনিষের—একটী নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা, একটী উপাদানকারণ বা উপকরণ এবং অপরটী কার্য্য বা বিশিষ্ট ফল। এই জগদ্ব্যাপারে চিন্ময়ীশক্তিই নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ এবং কার্য্যরূপাবিশিষ্ট ফল।

[বিঃ দ্রঃ—অবৈজ্ঞানিক পাঠকদের জন্য এখানে এই পরিবর্ত্তনকর্ম্মের কিছু সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশন করা হইবে না অপ্রাসঙ্গিক। তাই বলা যায় যে,—পূর্ব্বোক্ত খাদ্যতালিকার অন্নসার (বা PROTEIN)-র সরলতর অংশবিশেষের পাশ্চাত্য নাম Albumen ; আয়ুর্ব্বেদোক্ত "ওজঃ" পদার্থের কিয়দংশে সদৃশ পদার্থ এই এ্যাল্‌বুমেন্। সর্ব্বশরীরস্থ শীত, স্নিগ্ধ, স্থির, সোমাত্মক, মৃদুতা-শ্লক্ষ্ণতা-ঘনতা-নির্ম্মলতা-পিচ্ছিলতাবিশিষ্ট, শরীরের বলপুষ্টিকর পদার্থবিশেষকেই বলে "ওজঃ"। বাহিরের বায়ু-বা-জল হইতে জীবের দেহ অধিকতর উষ্ণ ; এই উষ্ণতা বা সন্তাপের কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে, সন্তাপ দ্রব্যাদির অবস্থান্তর-মাত্র ; দ্রব্যের অণুসমূহের কম্পন-বা-স্পন্দন (Molecular Vibrations) হইতে হয় তাপ ; আণবিক কম্পন যে পরিমাণে দ্রুত হয়, দ্রব্যসকল সেই প রমানে উষ্ণ হইয়া থাকে ; আরও আণবিক কম্পন অত্যন্ত দ্রুত হইলে, হয় আলোকের অবির্ভাব।

শারীরপ্রবৃত্তিশক্তির (Kinetic Energy = ক্রিয়মাণ গতিশীল শক্তির) অবাধিত অভিব্যক্তিই শারীরতাপ ; উহাই শরীর অণুসমূহের প্রকম্পন-বা-স্পন্দনকারণ। আহারসহকারে, অপিচ শ্বাসগ্রহণ কালে বায়ুস্থ অক্সিজেন সাথে জীব যে কার্য্যকরী-বা-সঞ্চিত (Potential)-শক্তি আহরণ করে, শারীরতাপের তাহাই অন্তিম প্রভব (Ultimate Source)। প্রত্যেক রাসায়নিক সংযোগ-ও-বিশ্লেষব্যাপারনিষ্পত্তিতে উৎপত্তি হয় তাপের। অঙ্গারক দ্রব্যসমূহের মধ্যে

(**Organic Snbstanee**) যাহারা আহর্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহারা যে, **C,H,O,N.**—এই অমিশ্রভূতচতুষ্টয়ের সাংযোগিক তাহা সুবিদিত। ভুক্ত-অঙ্গারক পদার্থের পরিপাক-বা-সন্দাহকালে কার্ব্বন C সংযুক্ত হয় অক্সিজেন সাথে, ফল কার্ব্বন ডায়ক্সাইড্ (CO_2) এবং হাইড্রজেন সংযুক্ত হয় অক্সিজেন সাথে এবং জলরূপে (H_2O) হয় পরিণত; এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সহকারেও উৎপত্তি হয় তাপের। সন্দাহ বা পাককার্য্য (**Combustion** বা **Oxidation**) দাহক ও দাহ্য এই পদার্থদ্বয়ের সংযোগব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হ'তে পারে না; পার্থিব-ও-জলীয় পদার্থই দাহ্য বা অন্ন। জীবের আহার হওয়া চাই পাঞ্চভৌতিক (ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোম)।]

আনন্দ বা নিরানন্দের হেতু কর্ম্মফল। **মানবদেহই** যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্র; এই দেহেই হয় কর্ম্ম, অর্থাৎ অনুষ্ঠিয়মান কর্ম্মগুলি যজ্ঞরূপে সম্পন্ন করে দেবপূজা। অন্যান্যদেহ অর্থাৎ দেবদেহ বা পশুদেহ ভোগভূমি মাত্র—এ সকল দেহে হয় না যজ্ঞ। "প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং ....তব পূজানম্"—এই মন্ত্রটী সিদ্ধ হয় তখন যখন সাধকের প্রতি কর্ম্মই পরিণত হয় একমাত্র দেবপূজারূপে এবং প্রতিকর্ম্মফল দেবতৃপ্তি রূপে। যেমন রত্নের লোভে মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও গভীর সমুদ্রে করে অবগাহন, ঠিক তেমন ফলের লোভেই মানুষ অবগাহন করে দুস্তর কর্ম্মসমুদ্রে। গীতার কথা—কর্ম্মফল ত্যাগ; দেহটাকে অবশ্য সাধক ভাবিবে দেবপূজার যন্ত্রস্বরূপ এবং বর্জ্জন করিবে জীবকর্ত্তৃত্বাভিমান। কর্ম্ম শক্তিসমূহের একপ্রকার স্ফুরণমাত্র; যখন অব্যক্ত বা বীজাবস্থায় থাকে তখন ইহাদের স্বরূপ হয় না অনুভূত; কার্য্যরূপে প্রকাশ পেলেই শক্তির সত্তা হয় উপলব্ধ। শক্তি যখন পায় প্রকাশ অর্থাৎ প্রবাহশীলা হইয়া কার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন ইহার গতি হয় সর্পবৎ—সত্যের এই সূত্র ধরিয়াই যোগীগণ মূলাধারে কল্পনা করেন ভুজঙ্গরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী। আরও, উপনিষদের কথা, "লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্"; ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য "অমৃত" শব্দটীর অর্থ ক'রেছেন

"কর্ম্মফল"; অমৃত বা যজ্ঞভাগ বা যজ্ঞের তৃপ্তিফলই কর্ম্মফল। কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ; কর্ম্মময় এই ব্রহ্মাণ্ড, সুতরাং এ ব্রহ্মাণ্ড যজ্ঞাগার। কর্ম্মের বা যজ্ঞের যাহা শেষ বা পরিণাম অর্থাৎ ফল, তাহাই যজ্ঞভাগ। এই যজ্ঞভাগ দেবতার প্রাপ্য; কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বর্গের অধিপতি দেবতাবর্গই রূপরসাদি বিষয়গ্রহণরূপ কর্ম্মের ফল গ্রহণ করেন। সরল কথায়—দর্শক দেখিল একটী সুন্দর দৃশ্য (ফল-ফুল-ইত্যাদি); এই দর্শনকর্ম্মের বিজ্ঞানবিচারে বলা যায় যে, সমষ্টি-বিরাট্-মনের (=প্রজাপতি ব্রহ্মার) যে সুন্দর ফলফুলবিষয়ক সঙ্কল্প আছে, তাহা হইতে একপ্রকার স্পন্দন দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়কে করিল স্পন্দিত; অমনি তাহার চক্ষু দৃশ্যের (ফল বা ফুলের) বাহ্যরূপটী গ্রহণপূর্ব্বক দর্শকের ব্যষ্টিমনের নিকট উপস্থিত করিল; ব্যষ্টিমন (দর্শকের মন) ঐ দৃশ্যকে বুদ্ধির আলোকে আলোকিত করিয়া দৃশ্যের (=ফুলের বা ফলের) মনোহর রূপটী গ্রহণ করিল: তাহারফলে চক্ষুরিন্দ্রিয় হইল পরিতৃপ্ত। এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি মানে চক্ষুর অধিপতি আদিত্য-দেবতার তৃপ্তি, অর্থাৎ যে চৈতন্যাংশ প্রকাশ পায় বিশিষ্ট চক্ষুরিন্দ্রিয়-রূপে, তাঁহার=সেই সূর্য্যদেবতার পরিতৃপ্তি। ঐ তৃপ্তিটুকুর নামই যজ্ঞ-ভাগ; রূপরসাদি বিষয়গ্রহণরূপ যজ্ঞের বা কর্ম্মের ঐ তৃপ্তিটুকুই শেষ-ভাগ বা অমৃত এবং উহাই দেবতাগণের প্রাপ্য বা ভোগ্য। গীতার কথায়, "কর্ম্মদ্বারা দেবতাদের তৃপ্তি বিধান করিতে হয়; তাহা না করিয়া যদি কেহ কর্ম্মফলরূপ যজ্ঞভাগ স্বয়ং অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করে তবে তাহা হয় তাহার চুরি করা"—এই চুরিকরা ব্যাপারটা স্থূল দেহাত্মবোধ হই-তেই আসে। মানুষ যতদিন না হয় সাধক, ততদিন থাকে দেহাত্মবোধে বিভোর ও রূপরসাদি বিষয়ভোগ করিয়া স্থূলদেহের ব্যষ্টিমনকেই করে পরিতৃপ্ত। তখন বুঝিতে পারে না যে এই তৃপ্তিরূপ ফল (কর্ম্মফল) বা **যজ্ঞভাগ দেবতাদেরই প্রাপ্য**। পরে সাধক হইলে প্রথম প্রথম স্বীয় ব্যষ্টিমনকেই-মাত্র আত্মা বলিয়া বুঝে; সুতরাং

তখনও যজ্ঞভাগ বা তৃপ্তিরূপ কর্ম্মফল চৈতন্যে হয়না অর্পিত। সর্ব্বশেষে বিজ্ঞানময় কোষে আরোহণ করিয়া তৃপ্তিসাধন করে বিজ্ঞানাত্মরূপী অস্মিতারই। সুতরাং সাধারণ মানুষ হইতে বিজ্ঞানময় কোষের সাধক পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ হরণ করে কর্ম্মফলরূপ যজ্ঞভাগ। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক আহৃত রূপরসাদি বিষয়সমূহ বিজ্ঞানময়কোষে গিয়াও পৃথক্ পৃথক্ রূপেই হয় পরিগৃহীত। যদি উহারা সরাসরি আত্মায় অর্পিত হইত, তবে আর এই পৃথকত্ব থাকিতে পারিত না; সকল ভেদ বিদূরিত করিয়া এক-রসরূপে হইত পরিগৃহীত। অতএব, (অখণ্ডৈকরসস্বরূপে) ধীমান্ সুধী সাধক সমস্তকর্ম্মফলরূপযজ্ঞভাগ অর্পণ করেন সেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে। সাধকের সাধনার সুবিধার জন্য দেয়া যায় নিম্নে একটী স্মারক-লিপি তালিকা—

—ঃ বিষয়-ইন্দ্রিয়াধিপতি তালিকা ঃ

জ্ঞানেন্দ্রিয়	অধিপতি বা দেবতা	বিষয়	কর্ম্মেন্দ্রিয়	অধিপতি বা দেবতা	কর্ম্ম
চক্ষুঃ	সূর্য্য	রূপ	বাক্	অগ্নি	শক্তির শব্দপ্রকাশ
কর্ণ	দিক্	শব্দ	পাণি	ইন্দ্র	শক্তির গ্রহণ
নাসিকা	অশ্বিনীকুমারদ্বয়	গন্ধ-আঘ্রাণ	পাদ	বিষ্ণু	শক্তির চলন
জিহ্বা	বরুণ	রস	পায়ু	যম	শক্তির নিঃসরণ কর্ম্ম
ত্বক্	বায়ু	স্পর্শ	উপস্থ	প্রজাপতি	শক্তির সৃষ্টি-বা-জননকর্ম্ম

কর্ম্মের শ্রেণী বিভাগ ঃ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই হয় কর্ম্ম। গীতায় কর্ম্ম ও অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মভেদে কর্ম্মের যে শ্রেণী বিভাগ আছে, তাহাও একমাত্র বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগরূপ কর্ম্মেরই প্রকারভেদমাত্র।

তবে সাধারণতঃ লোকের ধারণা—কর্ম্ম তিনপ্রকার যথা :—
(১) কতকগুলি **ধর্ম্ম্যকর্ম্ম,** যেমন—সন্ধ্যাবন্দনা-ব্রত-নিয়ম-উপবাস ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিতকর্ম্ম। (২) কতকগুলি **অধর্ম্মকর্ম্ম,** যেমন—হিংসা-দ্বেষ-মিথ্যাভাষণ-পরস্বহরণ ইত্যাদি নিন্দিত কর্ম্ম। (৩) আর কতকগুলি **সাধারণ কর্ম্ম,** যেমন—আহার-নিদ্রা-ভ্রমণ-অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি ; উহাতে ধর্ম্মও নাই অধর্ম্মও নাই।

শাস্ত্রের উপদেশ—একমাত্র ধর্ম্মের সেবা করিলেই যথাক্রমে অর্থ-কাম-মোক্ষ ফল পাওয়া যায়। ইহার উপায় এই যে, প্রতিদিন সকল কর্ম্মই অতিশয় আদরের সহিত ধর্ম্মময়রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং এইরূপ করিতে পারিলেই মানুষ হয় সুকৃতিশালী, তাহারই ফলে স্বর্গ ও মোক্ষ হয় লাভ অহং-বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, তারপর ঈশ্বরার্পণ করা কনিষ্ঠাধিকারীর কার্য্য ; অনুষ্ঠানকালেই কর্ম্মগুলিকে যথাসম্ভব আত্মাযুক্তভাবে করিতে হইবে। আত্মাযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের নামই ধর্ম্ম্যকর্ম্ম। যে কোন কার্য্যের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত আত্মা-কর্ত্তৃত্ব দর্শনই যথার্থ ধর্ম্ম্যকর্ম্ম। বিশ্বময় একটা বিরাট্ কর্ত্তৃত্ব। সেই কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়াশক্তি মানবের বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের ভিতর দিয়া সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে—কিছুদিন যাবৎ এইরূপ চিন্তাধারা ও জ্ঞানের অনুশীলন করিলেই, ঐ আত্মকর্ত্তৃত্ব-দর্শন হয় প্রকৃতিগত। আবার, আত্মার সাথে সম্পর্ক বা যোগশূন্য—আত্মকর্ত্তৃত্বদর্শনশূন্য ব্রত-নিয়ম-উপবাস প্রভৃতি কর্ম্মগুলি বাহিরে ধর্ম্ম্য কর্ম্মের আকারে থাকিলেও উহারা বাস্তবিক ধর্ম্মকর্ম্ম নহে ; কিন্তু আবার আহার-বিহারাদি দৈনন্দিন ব্যবহারিক কর্ম্মগুলিও, যদি আত্মযুক্ত ভাবে হয়, তবে উহারাও ধর্ম্মকর্ম্মরূপে হয় পরিণত। এই সূত্রে স্মর্ত্তব্য গীতার শ্লোকদ্বয় ৪।২৪ (ব্রহ্মার্পণম্) ও ৯।২৭ (মদর্পণম্)।

কর্ম্মের-যে আনন্দঅংশটুকু তাহাই পরমাত্মার খাস অংশ ; পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হয় বুদ্ধিতে (= মহতত্ত্বে)।

এই বুদ্ধি যতক্ষণ মনের পিছু পিছু যায় (মনঃই বিষয়ান্বেষী ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ), কথান্তরে বুদ্ধি যখন ব্যস্ত থাকে ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক আহৃত বিষয়সমূহের প্রকাশকরারূপ কার্য্যে, ততক্ষণ বুদ্ধিমান্ পায় না আনন্দের সন্ধান ; মন প্রতিনিয়ত একটার পর একটা বিষয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহরণ করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে ধরে ও বুদ্ধির আলোকে বিষয়-গুলিকে প্রকাশিত করিয়া লয়। যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটী না পায়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়-মনের নাই বিশ্রাম ; সুতরাং বুদ্ধিরও নাই অবকাশ। কিন্তু অভীষ্ট বস্তু পাইবামাত্র ক্ষণকালের জন্য মন হয় নিরস্ত বিষয়-আহরণ কর্ম্ম হইতে, সুতরাং বুদ্ধিরও হয় একটু বিশ্রাম। তখন—সেই মুহূর্ত্তে বুদ্ধি আপনাতে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া লয় ; ইহারই নাম জীবের বিষয়ানন্দলাভ। সাধারণ মানুষ মনে করে "আমি বিষয় ভোগে পাইতেছি আনন্দ" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ নাই বিষয়ে, আনন্দ আছে বুদ্ধিমানেরই অন্তরে ; ভোগ্যবস্তুতে নাই আনন্দ বিষয় সম্ভোগের আনন্দ বিষয়ে নাই, আছে অন্তরস্থিতবুদ্ধিতে। মানুষের অন্তরস্থিত গুপ্ত আনন্দকে উদ্দীপ্ত প্রকাশিত করিবার জন্যই এই বিষয়-আহরণ (অথবা এই জন্ম-মৃত্যু)। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ যেন একটী মন্থন কর্ম্ম ; বুদ্ধি বা অন্তরটা যেন ক্ষীরসমুদ্র, আর এই মন্থনের ফলে উত্থিত হয় অমৃত বা আনন্দ। একদিকে আত্মাভি-মুখে নিবৃত্তিমুখী **আকর্ষণ**, অন্যদিকে বিষয়াভিমুখে **প্রবৃত্তিমুখী বিকর্ষণ**। প্রতি জীবে প্রতিমুহূর্ত্তে চলিতেছে এই কর্ম্মানন্দলীলারূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণের সমুদ্রমন্থন।

আত্মায় বা বিশুদ্ধচিতিশক্তিতে নানাবিধ লীলাবিলাস হয় প্রকটিত তাব হিরণ্যগর্ভস্বরূপে : এই পরিদৃশ্যমান জড়জগদাকারে আকারিত হইতে গিয়া, অনবরত দ্বন্দ্বের মধ্যে—সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অবস্থান করিয়াও আত্মার আনন্দময় ভাবটীর ব্যতিক্রম কখনই হয় না। যেরূপ শর্করাগঠিত রাক্ষসীমূর্ত্তিরও সর্ব্বাবয়বই মিষ্ট, সেইরূপ

আনন্দঘনমূর্ত্তি আত্মার সর্ব্বভাবেই আনন্দ থাকে অক্ষুণ্ণ; যেমন, রোগে-আনন্দ, শোকে আনন্দ, প্রলয়ে আনন্দ, আর্ত্তনাদে-আনন্দ !

কর্ম্ম-বিজ্ঞান :—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের কারণ যে জড়বিজ্ঞান তাহার শক্তি দ্বিবিধ—আকর্ষণ (Attraction) ও বিপ্রকর্ষণ (Repulsion); সর্ব্বপ্রকার শক্তির সামান্যরূপই এই আকষণ-বিপ্রকর্ষণ। শাস্ত্র বলেন—মোহই ঐ রাগের আকর্ষণ= (ttraction) ও দ্বেষের (বিপ্রকর্ষণ= Repulsion) মূল; কারণ, রাগদ্বেষ-যুক্তের আত্মলাভ মোহাধীন। রাগ-ও-দ্বেষ এই দু'টীই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। রজঃগুণে রাগ, তমোগুণে দ্বেষ; রজঃ ও তমঃ এই দু'টী মানসদোষ—মনোবিকারহেতু; এই মানসদোষদ্বয়েরই বিকার=ষড়রিপু, শোক, মান, চিত্তোদ্বেগ, ভয়, হর্ষ। রজঃ হইতে কাম (attraction) তমঃ হইতে দ্বেষ (Repulsion)। অতএব রজঃ→রাগ (attraction) বা কাম এবং তমঃ→ **দ্বেষ** (Repulsion); এই রাগ-দ্বেষ দু'টী আন্তর (Inner) ও বাহ্য (Outer) সর্ব্বপ্রকার বিকারের কারণ।

কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগগ্রহণাত্মক, কি শারীর—কি মানস; ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের গ্রহণার্থ, এবং ত্যাজ্য-বা-অনীপ্সিতরূপে অবধারিত-পদার্থের পরিহার নিমিত্তই কর্ম্ম করে মানুষজীব। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহারই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। যাহা আত্মার অনুকূলবেদনীয় তাহা সুখ; এবং তদ্বিপরীতে দুঃখ; তাই যাহা অনুকূলবেদনীয় তাহাকে পাইবার জন্য, এবং যাহা প্রতিকুলবেদনীয় তাহাকে ত্যাগ করার জন্যই জীব করে কর্ম্ম।

স্নায়ুযন্ত্রের ধূসরপদার্থ (GREY MATTER) দ্বারাই শরীরের সবরকম গতি-বা-প্রবৃত্তির নিয়মনকার্য্য হয় সাধিত; প্রধানকর্ম্মক্ষেত্র মস্তিষ্ক। পেশীর সহিত সম্বন্ধ অধিকাংশ-স্নায়ুরজ্জু কেন্দ্রাতিগ (efferent), তাহারা ধূসর**পদার্থ হইতে** প্রবৃত্তিবহন করে, এবং এই প্রবৃত্তি পেশীগণকে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য করে; পেশীগণ সঙ্কুচিত হ'লেই,

স্থিতিস্থাপকধর্ম্মবিশিস্টতানিবন্ধন হয় প্রসারিত। তাই কেন্দ্রাতিগ স্নায়ুসমূহ হয় গতিবিধায়ক (= সঞ্চালক—**motor**); আবার যে সকল স্নায়ুরজ্জু ত্বকের সহিত সম্বন্ধ তাহারা বহন করে নোদন কৈন্দ্রিক-যন্ত্রে, তাই তাহাদিগকে বলা হয় কেন্দ্রাভিগ (**afferent**) এবং সুতরাং ইহারা সংজ্ঞা-বাহী (sensory)। অতএব স্নায়ুগণ করে দ্বিবিধ কর্ম্ম :—কেন্দ্রাতিগ (efferent = motor) এবং কেন্দ্রাভিগ (Afferent = Sensory)।

আরও, বুদ্ধিপূর্ব্বক-ও-অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভেদে শরীরকর্ম্মসমূহকে বিভক্ত করা যায় দুই ভাগে :—(১) যে সবকর্ম্ম সংকল্পপূর্ব্বক, মানস কর্ম্ম যাদের আত্মাবস্থা—মনের শাসনাধীন, অধ্যবসায়াদি সূক্ষ্ম অবস্থা সকল অতিক্রম পূর্ব্বক যাহারা স্থূলাবস্থায় উপনীত, তাহারা **বুদ্ধিপূর্ব্বক** কর্ম্ম (voluntary action); আবার, (২) যে সব কর্ম্ম সংকল্প পূর্ব্বক নহে, যাহাতে মনের নাই কোন শাসন, **অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম তদ্বিলক্ষণ** (Involuntary action)। প্রাণন ক্রিয়া,—শরীরের পোষণকর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের দৃষ্টান্ত; অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহ মনের শাসনাধীন নহে; স্নায়ুসমূহের প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া দ্বারা (Reflex action) অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়। প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ায় ত্রিবিধ যন্ত্রের কর্ম্ম, যেমন (ক) কেন্দ্রাভিগ প্রতীচীন (afferant) স্নায়ু, (খ) স্নায়ুকেন্দ্র অর্থাৎ, পরস্পর মিলিতভাবে ক্রিয়াকারিস্নায়ু-কোষশ্রেণী (a group of nerve cells acting together), (গ) কেন্দ্রাতিগ-বা-পরাচীনস্নায়ু (Efferent nerve)।

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা (৩৪।৫৫) মন্ত্রমর্ম্ম—শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছেন সপ্তশক্তি বা প্রাণ যাঁদিগকে বলা হয় সপ্তঋষি যথা ত্বক্-চক্ষুঃ-শ্রবণ-রসন-ঘ্রাণ-মনঃ-বুদ্ধি। ত্বগাদি সপ্তঋষি সদা সাবধানে রক্ষা করেন শরীরকে। মনুষ্য যখন হয় নিদ্রিত, তখন দেহব্যাপক এই সপ্তঋষি হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাত্মাকে হ'ন প্রাপ্ত; এই নিদ্রিতকালে

দেহকে রক্ষা করেন নিদ্রাশূন্য-সদাজাগরণশীল-জীবিতদাতা দীপ্যমান্ দু'টী শক্তি প্রাণ ও অপান। ইহার তাৎপর্য্য—শরীরের পোষণকার্য্য হয় সদাজাগরণশীল প্রাণশক্তিদ্বারা। প্রাণশক্তি পঞ্চবায়্বাত্মিকা= প্রাণ+অপান+সমান+ব্যান+উদান। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলেন **প্রাণশক্তির ক্রিয়াই প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া (Reflex actions);** কাশেরুকামজ্জার (Spinal cord) ধূসরপদার্থে (Grey matter) কোনরূপ নোদন আসিলে, উহাকে অতিক্রম করিতে হয় প্রভূত বাধা। যে সব কেন্দ্রাতিগ (efferent) স্নায়ুরজ্জু, ধূসরপদার্থের যে স্থানে বাধিত হইয়াছে—তৎস্থানের তদ্দিক হইতে বহির্গত হইয়াছে, ধূসর পদার্থের স্বল্পবাধা সেইসব (efferent) কেন্দ্রাতিগ স্নায়ুরজ্জুর অভি-মুখে হয় উপনীত। অতএব স্বল্প উত্তেজনাতেই উৎপত্তি হয় সাধারণ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার। এই প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া শুদ্ধ উত্তেজিত ত্বকের রক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত হয়। বাধা অতিক্রমই কর্ম্মের রূপ, বিনাবাধায় কর্ম্ম হয় না।

শ্রুতির কথায়—কার্য্য স্বরূপতঃ কারণ হইতে নহে ভিন্ন। বিমল স্ফটিকে নানাবিধপদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে উহা যেমন নানারূপে রঞ্জিত দেখা যায়, অখণ্ডসচ্চিদানন্দলক্ষণ পরমাত্মাও সেইরূপ মায়াদ্বারা বিবিধনামরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিচিত্রবিশ্বরূপ করেন ধারণ। একই ব্যক্তি কর্ম্ম-ভেদে যেরূপ ভিন্ন-ভিন্ন নামে কথিত হ'তে পারেন, মহৈশ্বর্য্য পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মভেদে বিবিধ নামে উক্ত হ'ন। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথগ্‌সামগ্রী ভাবেন। আত্মবিদের আঁখিতে আত্মময় এই জগৎ! আত্মবিদ্ আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ দেখিতেই পান না।

আত্মা যখন প্রাণনক্রিয়া করেন তখন তিনি "প্রাণ"; যখন বাক্যোচ্চারণ করেন তখন তিনি বাগিন্দ্রিয়; যখন দর্শনাদি ঐন্দ্রিয়ক কর্ম্ম করেন, তখন তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়; যখন করেন মনন কার্য্য, তখন তিনি মনঃ।

প্রাণ সুস্থ থাকিলে, শরীর-মনঃ সবল ও নীরোগ হইলে, তবেই অন্যান্য কর্ম্ম করার সামর্থ্য থাকে ; প্রাণত্যাগ ঘটিলে সর্ব্বত্যাগই হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রাণানুপালন কর্ত্তব্য। স্বস্থের স্বস্থবৃত্তি—স্বাস্থ্যরক্ষণ (= Preservation of health) এবং আতুর বা ব্যাধিতের বিকার প্রশমনে অবধান (care, attention), রোগবিমোচনে মনোযোগ—এই দ্বিবিধ প্রাণানুপালন-চেষ্টাকে এক কথায় বলা যায় শাস্ত্রীয় শব্দে "প্রাণৈষণা"। ইহার পরেই আসে কর্ম্মক্ষেত্রে "ধনৈষণা" যেমন কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা, অথবা অন্য কোন কর্ম্ম যাহা অবশ্যই সাধুবিগর্হিত নহে, যাহাতে সুখে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ হ'তে পারে। প্রাণৈষণার ও ধনৈষণার পর হিতাহিত-বিবেকক্ষম, লোকালোকদর্শী, ভাগ্যবানের পরলোকৈষণা (=পরলোকের হিত-কামনা) আসিতে পারে। শাস্ত্রের কথা—যাঁদের মনঃ, বুদ্ধি, পৌরুষ, পরাক্রম থাকে প্রায় অবিকলীকৃত (unimpaired), যাঁরা ইহলোক ও পরলোক এই দু এরই সমভাবে হিতকামনা করেন তাঁদেরই হৃদয়ে জাগে এই ত্রিবিধ 'এষণা' (Seeking. Desire)।

সাধারণতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত দুইটী "এষণা"—"প্রাণৈষণা" ও "ধনৈষণা"। বিনাপ্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে হয় না প্রবৃত্ত ; অতএব প্রয়োজনবোধই কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ।

আরও, যাহা গতিশীল এবং যাহার নির্দ্দেশ্যরূপ ক্রিয়া-বা পরিবর্ত্তন, তাহা জগৎ। এখন দেখা যাক 'ক্রিয়া' কি ? 'ক্রিয়া' = পূর্ব্বাপরীভূত ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহ। 'পরিবর্ত্তন' = বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থানের নাম অর্থাৎ পূর্ব্বভাব হইতে অপরভাবে গমনের নাম 'পরিবর্ত্তন'। অতএব ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তনের জ্ঞান পূর্ব্বাপরীভূত-ভাবাত্মক। শাস্ত্রসূত্র—"পৌর্ব্বাপর্য্যং হি দেশকালকৃতম্" অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্য দেশ-ও-কাল কৃত, দৈশিক ও কালিক ভেদে পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বিবিধ।

পরিবর্ত্তনের রূপচিন্তায় ক্রম-ও-যৌগপদ্য বা সামানাধিকরণ্য

(Succession, Simultaneity or Co-existence) এই সব শব্দের অর্থের রূপ স্বভাবতঃই জাগিবে মনে শব্দ সকলের প্রয়োগে ক্রম (Succession) ও যৌগপদ্য (Simultaneity) এই দুইটী উপায়। ক্রম-ও-যৌগপদ্য অতিক্রমপূর্ব্বক কোন প্রকার লৌকিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মূর্ত্ত ক্রিয়াসকল (The phenomena of nature) ক্রম-ও-যৌগপদ্য এই দু'টী ভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ। **প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ** সমানাধিকরণ এবং পূর্ব্ব-ও-পরবর্ত্তী পদার্থান্তরের সহিত সম্বদ্ধ।

একভাবে উপলব্ধ ব্যাপারসমূহের নাম 'ক্রিয়া'। পরমাণু যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে, পরমাণু। অস্তিত্ব যেমন অনুমানগম্য, প্রত্যক্ষ-গম্য নহে, অসংখ্য পরমাণু পরস্পর সমাকৃষ্ট -পিণ্ডীভূত-বা-সংহত হইয়া যাবৎ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় না আসে, তাবৎ যেমন ইহা হয় না প্রত্যক্ষগম্য, সেইরূপ ক্রিয়াও অপিণ্ডীভূতাবস্থায়, বহুক্রিয়াক্রম অতিক্রমপূর্ব্বক স্থূলদশায় আসার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষগম্য হয় না। অমূর্ত্তক্রিয়া পরমাণুর ন্যায় প্রত্যক্ষের অবিষয়। অতএব যাহা করা যায় উপলব্ধ তাহা মূর্ত্ত-বা-সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব, তাহা ক্রমোৎপন্ন পূর্ব্বাপরীভূত ব্যাপার-সমূহ। ক্রিয়া যখন ক্রমোৎপন্ন, তখন ক্রিয়ার স্বরূপ জানিতে 'ক্রমের' স্বরূপ আগে জানা চাই। ক্রম = গত্যর্থক √ক্রম (পাদ বিক্ষেপে—to step) + ঘঙ্ (ভাব বা করণবাচ্যে)। একভাব হইতে ভাবান্তরে বা একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করার নাম "পাদবিক্ষেপ' "ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ"। "ক্রম" হয় (১) ক্ষণ প্রতিযোগী ; আবার "ক্ষণপ্রতিযোগী" শব্দের মানে "ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা" (বেদব্যাস) হইতে দেখা যায় – ক্ষণের (= সূক্ষ্মতম কল্পিত কালাংশের) আনন্তর্য্য (= অব্যবহিতত্ব বা অন্তররাহিত্য— absence of interval হইয়াছে আত্মা—বা ধর্ম্ম যাহার, তাহা "ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা"। একটী ক্ষণের পর অন্য একটী ক্ষণ আসিতেছে, তৎপরে অন্য একক্ষণ, তৎপরে আবার

অন্য এক ক্ষণ—এইরূপে অনন্ত ক্ষণপ্রবাহ চলিতেছে। ক্রমবান্ ব্যতীত 'ক্রম' হইতে পারে না নিরূপিত; এবং মাত্র-একটী-ক্ষণেরও হইতে পারে না "ক্রম"; অতএব "ক্রম" ক্ষণপ্রতিযোগী—ক্ষণপ্রতিসম্বন্ধী = "ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা", "ক্রম" ক্ষণপ্রচয়াশ্রয়।

"ক্রম" হয় (২) পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্য অর্থাৎ 'ক্রম' হয় পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের অপরান্ত (= অবসান, চরমাবয়ব – end) যেমন—এক বৎসর ব্যাপিয়া একখানি বস্ত্র পরিধান করার পর, একদিন হঠাৎ হস্তস্পর্শমাত্রেই পরিধেয় বস্ত্রের কিয়দংশ হইল বিগলিত, তখন বোঝা গেল বস্ত্র জীর্ণ হইয়াছে। ধীরভাবে ভাবিলেই বোঝা যাবে—এই জীর্ণতা একদিনে হয় নাই; বস্ত্রখানি যে ক্ষণে বস্ত্ররূপে পরিণত হ'য়েছে সেই ক্ষণ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে ইহার পাকক্রিয়া। বস্ত্রখানির জীর্ণতা, সূক্ষ্মতম-সূক্ষ্মতর সূক্ষ্ম ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক যখন আসিল (নাশের) স্থূলদশায়, তখনই বোঝা গেল ইহা জীর্ণ। এতদ্দ্বারা বোঝা গেল পরিণামমাত্রই ক্রমোৎপন্ন-ব্যাপারসমূহ; পরিণামের অপরান্ত ও অবসান দ্বারা ক্রম-পৌর্ব্বাপর্য্য হয় অনুমিত; এবং "ক্রম" হয় ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা ও পূর্ব্বাপরীভাব।

"ক্রম" (Succession)—ক্রিয়ামাত্রই অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক ও অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের পরিণাম। জাগতিকপদার্থ মুহূর্ত্তকালও একভাবে (= পরিবর্ত্তিত না হইয়া) থাকিতে পারে না, জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিস্বভাব, আবির্ভাব-তিরোভাব স্থিতি—এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম— সাধারণ নাম, 'প্রবৃত্তি': আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি (Pause), পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া বা গতি (Motion) মাত্রেরই ইহাই স্বরূপ; ঘাত, প্রতিঘাত ও বিরাম, সকল ক্রিয়াই হয় এই নিয়মে সংঘটিত। "ক্রমো হি ধর্ম্ম কালস্য"। 'ক্রম' (succession)

কালধর্ম্ম। শ্রুতির কথা—"সূর্য্যো মরীচিমাদত্তে সর্ব্বস্মাদ্ভুবনাদধি ·
তস্যাঃ পাকবিশেষেণ স্মৃতং কালবিশেষণং" ॥

জগতের এই অবিরাম পরিবর্ত্তনের কারণ—"সূর্য্যরশ্মি"—সূর্য্যের সন্তাপনীশক্তি (Heating effect of the sun's rays) ; সূর্য্য স্বীয় সন্তাপনীশক্তিদ্বারা সন্তাপিত করিতেছেন নিরন্তর এই জগৎ ; জগৎ যে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সূর্য্যের এই পাকক্রিয়াই তাহার কারণ। কোন দ্রব্যকে যখন উত্তাপিত করা হয় তখন উত্তাপিত দ্রব্যে তাপের তারতম্যানুসারে হয় দ্বিবিধক্রিয়া—১ম, উত্তাপিত দ্রব্যের অণুপুঞ্জের পরিস্পন্দন হয় বৃদ্ধি ; ২য়, উহার আণবিক বিশ্লেষণক্রিয়া সংঘটিত হয় অর্থাৎ উত্তাপিত দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণশক্তি (cohesion) হয় শিথিল, তাহাতে দ্রব্যের ধর্ম্ম, লক্ষণ-ও-অবস্থাগত পরিণাম হয় ; ইহাই "পাকক্রিয়া"। সূর্য্য পৃথিবীর সমস্ত পদার্থেই তাপ প্রদান করাতে যে পাকক্রিয়া অহরহঃ চলিতেছে, সেই পাকক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে ক্ষণমুহূর্ত্তাদি কলনাত্মককালের অস্তিত্ব যায় বোঝা। অতএব কলনাত্মক কাল ও মূর্ত্তক্রিয়া এক পদার্থ। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হ'য়েছে ক্রিয়া ক্রমজাত ও পূর্ব্বাপরীভূতাবয়ব সমূহাত্মিকা। ক্রম (succession) ক্রিয়ার ধর্ম্ম ; কলনাত্মক কাল ও ক্রিয়া সমান পদার্থ। অতএব "ক্রম" = কালধর্ম্ম, ক্রমের রূপ কলনাত্মক কাল-বা-ক্রিয়া-জ্ঞানের নিয়ত অনুষক্ত, কাল-বা-ক্রিয়ার রূপ = ক্রমের কালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্যের রূপ।

ক্রিয়াজ্ঞানে ক্রমের (succession) রূপ ভিন্ন অপর একটী পদর্থের রূপ বুদ্ধিগোচর হয়, সেইটাই যৌগপদ্য (Simultaneity)। এই যৌগপদ্যের রূপদর্শন না হইলে শুদ্ধক্রমের রূপদ্বারা 'কোনপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

যৌগপদ্য :—এককালে যুত বা মিলিত, এককালে দুই-এর প্রাপ্তি, গতি বা জ্ঞান। আরও, 'যুগপদ' একদা—এককালে (simul-

taneously, at the same time) এই অর্থের দ্যোতক। আরও, এককালবৃত্তিত্বের বা অনেকের **একক্ষণ-সম্বন্ধের** নাম যৌগপদ্য।

[ব্যাকরণে বিঃ দ্রঃ- যৌগপদ্য=যুগপৎ+ণ্য। যুগপৎ=মিশ্রণার্থক √যু+গপতক্; অথবা যুগপৎ=যুগ-শব্দ+গত্যর্থক √পত্+ডৎ; অথবা যুগপৎ=যুগ-শব্দ+√পদ+ক্বিপ্]।

আরও, "ক্রিয়াদ্রব্যয়োঃ সম্বন্ধং গৃহ্ণাতি বর্ত্তমানঃ" [বাৎস্যায়ন] অর্থাৎ, ক্রিয়া ও তদাশ্রয় দ্রব্য এই উভয়ের সম্বন্ধ দ্বারা "**বর্ত্তমান**" হয় লক্ষিত; যেমন, পত্র পতন-ক্রিয়ার আশ্রয়। পতন-ক্রিয়াশ্রয় পত্রটী যাবৎ পতন ক্রিয়াশূন্য না হইবে, তাবৎ পত্র **পতিত হইতেছে,** এই বর্ত্তমান-ক্রিয়াপদানুষক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে বুঝা যায়— (১) স্থির আলম্বন বা আধারের জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান হইতে পারে না, (২) নিয়তপরিবর্ত্তনশীল পদার্থজাতের একটী আছে স্থির আধার; (৩) ক্রিয়া-বা-পরিবর্ত্তন নিরাধার থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও ঐ মত :—

Mr. Martineau says "In all such instances it is a direct consequence of the duality of intellectual apprehension, that in knowing one thing you must know two : that in so far as one is a change, the other is a permanent" (the study of Religion, Vol 1 P. 121)

উপলব্ধি মাত্রেই "দ্বৈত"; একটী পদার্থ জানিতে হইলে দুইটী পদার্থের হয় উপলব্ধি। একটী পরিবর্ত্তন বা পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বসমূহাত্মিকা ক্রিয়া (change), অপরটি স্থিতিশীল আধার।

Mr. Herbert Spencer—"So that among all the changes there is something permanent"

[Principles of Psychology Vol 11 P. 481

পরিবর্ত্তন সমূহের অন্তরে আছে কোন অপরিবর্ত্তনীয় আধার!

পুস্তকের পৃঃ ৩-এ কথিত সামানাধিকরণ্য শব্দটীর অধিকরণ= আশ্রয়। অতএব, সমানাধিকরণ শব্দটী 'সমান-বা-একাশ্রয়' এই অর্থের বাচক। সুতরাং "সামানাধিকরণ্য"-শব্দেরও অর্থ= সমান-বা-একাশ্রয়ের ভাব, সমান-বা-একাশ্রয়বৃত্তিত্ব। "বৃত্তি"-শব্দটীর অর্থ সন্নিকর্ষ, জ্ঞান, আধেয়ত্ব ইত্যাদি।

আরও, সর্ববীজ-সর্বকারণ-সর্বশক্তিময় ব্রহ্মের অখণ্ড শক্তিকে মহামায়া ক'রেছেন খণ্ডিত; বহুরূপিণী স্থিতিই কালশক্তি। খণ্ড-কাল ও ক্রিয়া একপদার্থ। অতএব, ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্ন-শক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য-ও-ভোগরূপে অনেকধা স্থিতিই ক্রিয়া বা জগৎ। যাহা সকল জন্যপদার্থের জনক, যাহা জগতের আশ্রয়, যাহা পরত্বাপরত্ববুদ্ধির হেতু, যাহা পৌর্বাপর্য্যবুদ্ধির কারণ তাহাই "কাল"। কাল ও ক্রিয়া একপদার্থ; ক্রিয়াই সকল জন্য-পদার্থের জনক, ক্রিয়াই জগতের আশ্রয়, ক্রিয়াই পরত্বাপরত্ব-বা-পৌর্বাপর্য্যবুদ্ধির হেতু। শক্তি= অমূর্ত্তা ক্রিয়া—ইহা বুঝা যায় না যাবৎ কর্তৃকরণাদি-কারক দ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারকশরীরে শরীরিণী না হওয়া যায়; কর্ত্তৃ-করণাদি কারকদ্বারা পরিচ্ছিন্না ও কারকশরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্তক্রিয়াই "জগৎ"।

অচল-নির্গুণ-নিষ্কর্ম্মা ব্রহ্মসত্তায় **আবির্ভাব** হ'লো শক্তির, যাহাতে অচল হ'লেন সচল, নির্গুণ হ'লেন সগুণ, নিষ্কাম হ'লেন সকাম নিষ্কর্ম্মা হ'লেন সকর্ম্মক; এই শক্তিসমন্বিত ব্রহ্মের নামই **প্রকৃতি**—প্রধান বা জগতের ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ, **কর্ম্মকর্ত্রী**। [বিঃ দ্রঃ—ব্যাকরণে যেটী কর্ম্ম সেটী যদি কর্ত্তাও হয় তবে তাকে বলে "কর্ম্মকর্ত্তা"; এই সূত্রে ব্রহ্মের কর্ম্মও প্রকৃতি, আবার কর্ম্মীও প্রকৃতি যেমন ফুটী (=ফল) ফাটিল। পুনশ্চ, অবিভক্ত্যন্ত শব্দ ও ধাতু প্র—√কৃ+ক্তি ক] পূর্বোক্ত "আবির্ভাব"-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ বিচারে দেখা যায় আবিস্ (=প্রকাশ)+ সত্তা অর্থে √ভূ+ঘঙ্ ভা=আবির্ভাব; এই সর্বপ্রথম প্রকাশ-ক্রিয়াই ব্রহ্মসত্তার **প্রথম কর্ম্ম**; মাত্র লীলার জন্য

সত্তার অর্দ্ধাঙ্গিনীশক্তির প্রথম অভিব্যক্তি হ'লেন প্রকাশ প্রকৃতিরূপে। বহুধা লীলাকর্ম্মের জন্য ক্রম-আবির্ভাব হ'লো বাহ্যেন্দ্রিয় দশটী+ অন্তরেন্দ্রিয় ৫টী এবং তৎসঙ্গে এলো কর্ম্মজ সন্তান দুটী জ্ঞান ও ভক্তি নিম্নাঙ্কিত চিত্রানুসারে :—
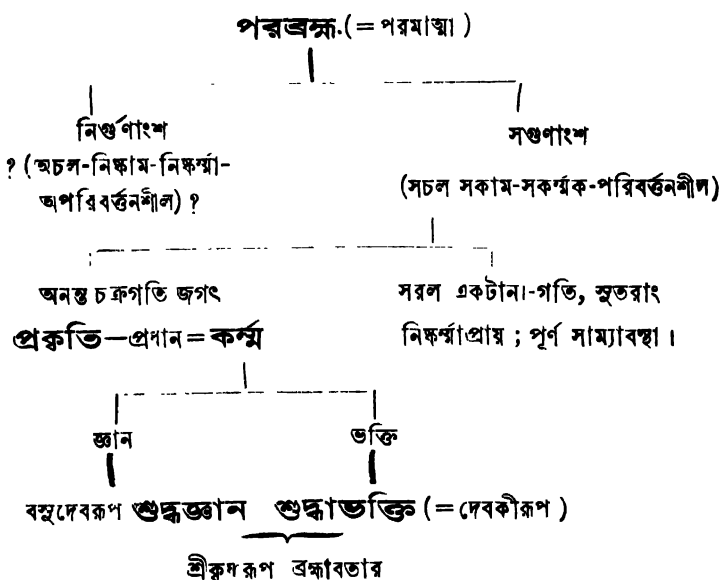
চিত্রে দেখা যায়—কর্ম্ম হইতেই জ্ঞান ও ভক্তির উদয় ; সগুণসচল ব্রহ্ম হইতে সেই আদি তথাকথিত নির্গুণ ব্রহ্মের ব্রহ্মবিচারপ্রচেষ্টা বা অনুশীলন করার যে অভিজ্ঞতা তাহাকেই বলে **জ্ঞান** ; আর পূজ্যের প্রতি অনুরাগ শ্রদ্ধা-সেবা প্রভৃতির নাম **ভক্তি**। তবে যথার্থ অকৃত্রিম অকপট ভক্তির সঞ্চার সম্ভব নহে বিনা জ্ঞানে বা পূজ্যের বিনা পরিচয়ে। জ্ঞান ও ভক্তি যেন কর্ম্মের যমজ সন্তান [অর্থাৎ শরীরসাধনসাপেক্ষ নিত্যকর্ম্ম যে অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম-অঙ্গ **যমা** তাহা হইতে উৎপন্ন এই জ্ঞান-ভক্তি ; যম=(i) অহিংসা+(ii) সর্ব্বভূতহিতকর সত্যভাষণ+(iii) অস্তেয় (=অচৌর্য্য বা পরস্ব গ্রহণ না-করা)+(iv) ব্রহ্মচর্য্য+(v) অপরিগ্রহ অর্থাৎ সর্ব্ববিধভোগ বর্জ্জন]

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসত্তার প্রথম কর্ম্ম যে আবির্ভাব তাহার আলোচনায় দেখা যায়, আবির্ভাব = আবিঃ + ভাব ; আবিস্ প্রকাশার্থবাচী অব্যয় শব্দ; ইহার বিপরীতার্থক অপ্রকাশ বা অন্তর্দ্ধানার্থবাচী অব্যয় শব্দ হয় তিরস্ শব্দ। সকল প্রকার ভাববিকারের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই বিরাজমান; ইহারা এক-মিথুন (**Universally Co-existent**)।

জগদাকারে বিবর্ত্তিত পরমাত্মার স্বরূপ দেখিলে দেখা যায়—মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং উভয় পাশে রজঃ ও তমঃ; রজঃ = রাগ বা কাম (**attraction**) এবং তমঃ = দ্বেষ বা বিরাগ (**repulsion**)। জগৎ যখন ক্রিয়া। মূর্ত্তি এবং ক্রিয়া যখন ত্রিগুণময়ী আবির্ভাবাদি পরিণামাত্মিকা, তখন প্রবৃত্তি (পুং) = আবির্ভাব, সংস্ত্যান্ (স্ত্রী) = তিরোভাব বা বিনাশ এবং স্থিতি—কার্য্যাত্মভাব-বা-ভাববিকারমাত্রের এই পরিণামত্রয়ই স্বরূপ ; জগতের জ্ঞান, আবির্ভাবাদিপরিণামত্রয়াত্মক। তাই আবির্ভাব বা পুংলিঙ্গরজ্ঞান (=প্রবৃত্তি), তিরোভাব বা স্ত্রীলিঙ্গ ও স্থিতি বা নপুংসকলিঙ্গ জ্ঞানবিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না ; এবং স স্ত্যান (= তিরোভাব-বিনাশ বা স্ত্রীলিঙ্গজ্ঞান) কখন আবির্ভাব- ও স্থিতিজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। আবির্ভাবের কথা ভাবিলেই তিরোভাবের রূপ স্বতঃ স্বতঃই অনাহূত হইয়া মনে জাগে ; আবির্ভাব তিরোভাব ছাড়া বা তিরোভাব আবির্ভাব ছাড়া থাকিতে প্রাকৃতিক নিয়মে অপারগ আরও, যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর, যাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় সেই সকল পদার্থকে বলা হয় আবির্ভূত এবং তদ্বিপরীতে পদার্থকে বলা হয় তিরোহিত বা অন্তর্হিত। কোন জাগতিক পদার্থই বস্তুতঃ মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে নাই, গুণ-ত্রয়ের জয়পরাজয়চক্র অবিরাম হইতেছে পরিবর্ত্তিত। প্রবৃত্তি বা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণাম পর্য্যায় ক্রমে প্রতিনিয়তই নিত্যভাবেই চলিতেছে, জগৎ ক্ষণকালের জন্যও

নহে আবির্ভাবাদি পরিণাম বা প্রবৃত্তিশূন্য।

"ভূ সত্তায়াং" √ভূ+অল্=ভাব। আবির্ভাব (আবিস্+√ভূ) ও তিরোভাব (তিরস্+√ভূ) এই পদদ্বয়ের উভয়েই আছে বিদ্যমান 'ভাব'-শব্দটা। প্রকাশার্থবাচী অব্যয় শব্দ 'আবিস্, অপ্রকাশার্থ-বা-অন্তর্দ্ধানার্থবাচী অব্যয় শব্দ 'তিরস্—এই পরস্পরবিপরীতার্থক অব্যয় শব্দ-দ্বয়ের সংযোগবশতঃই ইহারা হইয়াছে ভিন্ন পদার্থ।

পূর্ব্বকথিত প্রবৃত্তি—আবির্ভাব হইতে পুংলিঙ্গজ্ঞান, সংস্ত্যান—তিরোভাব হইতে স্ত্রীলিঙ্গজ্ঞান এবং স্থিতি হইতে নপুংসকলিঙ্গজ্ঞান কিন্তু আদিতে আছে সন্মাত্রলিঙ্গ=**অবিশেষ সত্তা**; এই সত্তাই "ভাব"। শুদ্ধ অনুবৃত্ত-বুদ্ধির (abstract notion) হেতু যে কোন পদার্থই হউক, তাহাই সত্তার গর্ভে ধৃত, সকল পদার্থই ভাব বা সত্তার বিকার। অতএব, ভাবই—সত্তাই (Existence) কেবল (alone) বা পর-সামান্য (chief-common) যেমন, **ব্রাহ্মণ-মনুষ্য-জীব-সত্তা** (=ভাব)—এই সকল শব্দের অর্থে বোঝা যায় যে পর পর শব্দ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শব্দের ব্যাপক—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শব্দ বোধ্য অর্থ পর-পর শব্দ বোধ্য অর্থ হইতে অল্পবিষয় অল্পদেশবৃত্তি (less comprehensive); ব্রাহ্মণশব্দটী মনুষ্যের তুলনায় অল্পদেশবৃত্তি এবং মনুষ্যপদবোধ্য অর্থের অন্তর্ভূত, মনুষ্যনাম ব্রাহ্মণ-নামাপেক্ষায় পর (=প্রধান, শ্রেষ্ঠ) মনুষ্য, ব্রাহ্মণশব্দ-অপেক্ষায় পর বা অধিকদেশ বটে কিন্তু জীব অপেক্ষা অপর বা অল্প-দেশবৃত্তি; এইরূপে জীবও আবার, মনুষ্যের তুলনায় (=প্রধান) হইলেও সত্তার তুলনায় অপর। সত্তাই সুতরাং পরজাতি বা পরসামান্য ইহা হইতে আর পর নাই। বিশুদ্ধ সত্ত্বের (=সন্মাত্রের) উপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তি-দ্বয়কৃত ভাববিকার বা তরঙ্গই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল, কোন জাগতিক পদার্থ একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) মুহূর্ত্তের জন্যও থাকিতে পারে না; তাই কার্য্যাত্মভাবের বা ক্রিয়ার পৌর্ব্বা-

পর্য্যের যুগপৎ উপলব্ধিই জাগতিক উপলব্ধি। এক ভাব বা সত্তাই পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে যথাক্রমে শক্তি ও কার্য্য। আরও জগৎ ষড়্‌ভাব বিকার—এই যে ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি, তাহা দেশ-কাল কৃত ভাবপৌর্ব্বাপর্য্য-ভিন্ন আর কিছু নহে।

ঋগ্বেদসংহিতার (৮।১০।১১৪) উপদেশ "সহস্রং যাবদ্‌ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং" অর্থাৎ ভাববিকার অনন্ত। এই অনন্ত ভাববিকারকে ছয় ভাগে বিভক্তির কারণ—যত প্রকার ভাববিকারই থাকুক না কেন, তাহা জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারেরই বিকার—ইহাদেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র। শ্রেণী বিভাগ (classitication) দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান হয়; অল্পায়াসে মহৎ হইতে মহত্তর পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, সামান্য-বিশেষবৎ লক্ষণ প্রবর্ত্তন। আবার শ্রুতিবচন,

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিস বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি" ॥

এই অনুসারে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বা আবির্ভাব-স্থিতি-তিরোভাব এই তিনটী ভাববিকারকেই লক্ষ্য করেছেন। আবার বেদান্তদর্শন ১।১।২ বলেন, "জন্মাদ্যস্য যত ইতি।"

সর্ব্বকারণ কারণ পরমাত্মা অব্যক্ত; তাঁরই কোলে ওতপ্রোত-ভাবে শায়িনী সূক্ষ্মাশক্তি, এই সূক্ষ্মশক্তিদেবীর সন্তানই "ভাব"—মনোভাব (feelings, sentiments„ emotions, passions), তাহাও সূক্ষ্ম সত্তা। "ভূ সত্তায়াং", ভাব=√ভূ+ঘঙ্; এবং ঐ √ভূ হইতেই নিষ্পন্ন শব্দ"ভূত"=√ভূ+ক্ত ক যাহার মর্ম্মমানে—হইয়াছে এরূপ, অতীত ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত অবিশেষ সত্তা বা সম্মাত্রলিঙ্গরূপ সত্তাই "ভাব" (সৎ+ভাবে তা); অতীতের পূর্ব্বভাব সত্তাভাব পরিত্যাগ করিয়া পরে পশ্চাতে "হইয়াছে এইরূপ", তাই "ভূত" (=√ভূ+ক্ত—past participle); ভূতের অগ্রদূত যেন ভাব। সুতরাং ঐ পূর্ব্বোক্ত "আবির্ভাব" শব্দের ভাব হইতেই উৎ-

পন্ন এই কর্ম্মবিজ্ঞানেরই কার্য্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে **ভূত-পদার্থ।** ইহাই সূক্ষ্ম ভাবের স্থূলাবস্থা বা ব্যক্তাবস্থা। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থা প্রাপ্তি ইহাই জগতের সৃষ্টি বা বিকাশ, এবং ইহার বিপরীতকে বলে জগতের বিলোপ, তিরোভাব, লয় ইত্যাদি। কোন বস্তু যখন সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আসে, তখন উহার পরমাণুগুলি যথাক্রমে হয় গাঢ়, গাঢ়তর ও গাঢ়তমরূপে সংশ্লিষ্ট এবং উহার পারমাণবিক গতির হয় ক্রমশঃ হ্রাস; আবার কোন বস্তু যখন ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় যায় তখন উহার পরমাণুগুলির হয় বিশ্লেষ ও গতির হয় বৃদ্ধি। বাষ্পের মেঘরূপ ধারণ ও মেঘের জলরূপে অবতরণ এবং সেই মেঘের মূর্ত্তির লোপ অনন্ত আকাশে—এই ব্যাপার হইতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কোন অংশে নহে ভিন্ন। আরও, পঠিতব্য পৃঃ ১৪১ শেষ ২ ছত্র—পৃঃ ১৪২।

সংস্ত্যানশক্তি শক্তি অপ্ অথবা এক কথায় "অপ্" কার্য্যক্রমে হয় পরিণত **ভূত-"অপ্"এ!!** যা সৎ—বিদ্যমান, তাহাই ভূত। সৎ পদার্থ কার্য্যাত্মক ও কারণাত্মক; কার্য্যাত্মক—ষড়্ভাববিকার; ভূত শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে বোঝা যায়, ভূত-ও কার্য্যাত্মক ও কারণাত্মক তবে ভূতের কার্য্যাত্মক ভাবই, অপিচ ইন্দ্রিয়গম্য সৎ বা ভাবপদার্থই 'ভূত'-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থূল ভূত, ভাবরাশি ঘনীভূত হইয়াই এই স্থূল জগৎ-আকারে প্রকাশিত। যখন মহতী চিতিশক্তি অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রথম ব্যক্ত অবস্থায় হ'ন আবির্ভূতা তখনই তিনি প্রকটিতা হ'ন ভাবের আকারে। এই ভাবের অগ্রদূতকে বলে মহতীচিতিশক্তির অনুভাব বা অনুকূল ইচ্ছাশক্তি; দুর্বিজ্ঞেয়া ঐ চিতিশক্তির অনু অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই তিনি প্রকটিতা হ'ন ভাব-আকারে, তাই ঐ পূর্ব্বভাবটী অনুভাব—অনু পশ্চাৎ ভূয়ত ইতি অনুভাবঃ। প্রতিক্ষণে জীবের অন্তরে যে ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে উহাই মহতীচিতি-

শক্তির অনুভাব ; কামক্রোধাদি বৃত্তি, রূপ-রসাদি বিষয়, দয়া-ক্ষমাদি গুণ—সব তাঁরই অনুভাব ; এইগুলি তাঁহা হইতে সঞ্জাত ও তাঁতেই হয় বিলীন। যতক্ষণ ঐ চিতিশক্তি থাকেন অনুভাবের আকারে, ততক্ষণ উহা মাত্র মানসগ্রাহ্য, উহা ঘন হইলেই স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায়। ভাবই চিতিশক্তির অনু অর্থাৎ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দ্বিতীয় স্বরূপ ; তাঁহার স্বকীয় নির্ব্বিশেষ স্বরূপটী জীবের নিকট অব্যক্ত প্রায় হ'লেও ভাবময়ী অনুভাবস্বরূপিণী চিতিশক্তি প্রতিজীবের নিকট প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকটিতা ; তিনি প্রতিক্ষণে জীবের নিকট ভাবের আকারে হইতেছেন প্রকটিতা। ভাব উপেক্ষার জিনিষ নহে ; এই জগৎ ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায়— ঐ ভাবরাশি যেন কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে অপর কাহারও ইচ্ছায় হয় আবির্ভূত, আবার কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্রে হয় অন্তর্হিত। উহাদের আবির্ভাব তিরোভাব যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীবভাবীয় জ্ঞানগণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত।

ঐ ভাবরাশির মূল শব্দে ; শব্দ হইতেই ভাবের উৎপত্তি। ঐ শব্দগুলি যদিও ধ্বনির আকারে বাহিরে আসে না, তথাপি উহা যে নীরবতার শব্দ সে বিষয়ে নাই কোন সংশয়। মানুষের মনে যখন যে কোন ভাবই জাগুক না কেন, উহা কতকগুলি শব্দ-সমষ্টিমাত্র। শব্দশূন্য ভাব হয় না ; মানুষ যখন বৃক্ষ চিন্তা করিতেছে তখন একটু স্থিরভাবে আপন মনের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিবে—তারই মনের মধ্যে "বৃক্ষ বৃক্ষ-বৃক্ষ", এইরূপ একটা শব্দ হইতেছে ; অথবা গান শুনিতেছে সেই সময় ধীরভাবে আপন মনের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে শ্রোতার মনের ভিতরই গান হইতেছে। এইরূপ সর্ব্বত্র। বেদান্তের ভাষায় ভাবকে বলে "নাম-রূপ" : শব্দ নাই অথচ নাম আছে—ইহা হয় না।

এমতে সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্রী চিতিশক্তির সন্তান এই ভাবরাশি ও ভূতসমূহ

বিধায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গাইলেন—

"সবিতা সর্ব্বভূতানাম সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥"

পূর্ব্বকথিত (পৃঃ ১৭০) অবিশেষ সত্তারূপ অনন্ত শূন্যের "সন্মাত্রলিঙ্গ"-জ্ঞানে সৎপদার্থকে আহ্বান করিতেছেন ঋগ্বেদীয় শান্তি পাঠের মন্ত্রদ্রষ্টা-ঋষি, মন্ত্রের বাক্যাংশ **"আবিরাবীর্ম এধি"** ইত্যাদি—এই বলিয়া, "হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মন্! তুমি হও আবির্ভূত, অবিদ্যাবরণ অপনোদন করিয়া মেঘমুক্তপ্রভাকরের ন্যায় হও প্রকটিত মোর হৃদয়গগনে" ইত্যাদি অস্পষ্ট-অপ্রকাশ "সৎ"-বস্তুকে স্পষ্ট ও প্রকাশ করিবার জন্য প্রকাশার্থবাচী অব্যয় শব্দ "আবিস্"-কে ধ্যান ধারণা করেন ঋষি এবং মন্ত্রে করেন সাদর সম্ভাষণ ও আহ্বান। এইরূপেই সচ্চিদানন্দময়ের সৎএর কিয়দংশ ঋষির ভক্তি-হিমে যেন বিগলিত হইয়া রূপান্তরিত হ'ন "চিৎ"-পদার্থে (= মহতী চিতি শক্তিতে) সাধকের হৃদয়াকাশে; এই "আবিঃ"-ই শূন্যসত্তার মধ্যে শব্দরূপ প্রথম অভিব্যক্ত পদার্থ; শব্দ হইতেই উৎপত্তি **ভাবের**; এমতে শক্তি (= প্রকৃতি) → শব্দ (= sound ধ্বনি বা words বাক্যাংশ) → ভাবরাশি; সুতরাং ভাবরাশি স্থির হ'লেই শব্দও যায় থামিয়া অর্থাৎ শব্দ হয় স্থির; ঽ তিনিয়ত মানুষের মনটা যেন পাগলের মত বকে; তাই বুদ্ধিক্ষেত্রে মনঃটাকে স্থির রাখিলে, মনে আর কোনরূপ শব্দ কিংবা চঞ্চলতা বোঝা যায় না।

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের যেমন পঞ্চবিধ বিশেষ বিশেষ অবস্থা, প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ারও (= ভাবেরও) তেমন পঞ্চবিধ অবস্থা। পঞ্চভূতের পঞ্চবিধঅবস্থা : স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্ম অন্বয়-অর্থবত্ত্ব।

১ ২ ৩ ৪ ৫
পঞ্চভাবের পঞ্চবিধ অবস্থা :—গ্রহণ-স্বরূপ-অস্মিতা-অন্বয়-অর্থবত্ত্ব

১২। কর্ম্মসংস্কার—

কর্ম্মকর্ত্রী প্রকৃতি রাণীর এই বিশ্বে তথা এই জগতে বা ভবসাগরে তরঙ্গাকারে ভাসিতেছে অজস্র ভাবরাশি ! গুণত্রয়ের মাত্রাতারতম্যানুসারে গুণত্রয়ের সংযোগবৈচিত্র্যজন্য একটীর পর একটী তরঙ্গ পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে পড়িতেছে পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতে অল্প-বিস্তর-স্পষ্ট অস্পষ্ট দাগ (= কলঙ্ক) বা ছাপ্ তথা অঙ্কন (impressions)। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার পরই বৈষম্যের তথা সৃষ্টির সুরু থেকেই ঘটিতেছে এই ঘটনা। ইহাকে বলা যায় প্রকৃতির ভূষিতকরণ বা আদিকর্ম্ম-সংস্কার বা সহজজ্ঞান সহজাত জ্ঞান (যাহা জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে)।

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিত" (গীঃ ৮।৩)

ভূতশ্চ ভাবশ্চ তয়োঃ উদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ (সৃষ্টি) কথ্যতে কর্ম্ম। কোন্ অব্যক্ত অজ্ঞেয় ক্ষেত্র হইতে ভাবরাশি আসিতেছে এবং আবার কোন্ অব্যক্ত অজ্ঞেয় ক্ষেত্রে ভাসিয়া যাইতেছে—কোথাও বা ঘনীভূত হইয়া বাধাপ্রাপ্তে পরিণত হইতেছে সংস্কারে। এমতে অনুমান করা যায় ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই সংস্কার ! কোন কিছু কর্ম্ম করার সহিত আছে "সংযোগ" যে অবস্থার, সেই অবস্থার নাম সংস্কার ; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস-কর্ম্ম করিলেই যাহা হ'য়ে যায় প্রকৃতিগত তাই-ই সংস্কার—বদ্ধমূল ধারণা। সঙ্কীর্ণতামূলক গোঁড়ামি ধারণাকে বলে কু-সংস্কার।

শাস্ত্রে বহুশঃ কথিত এই "সংস্কার"-শব্দটী ; এই শব্দগর্ভে কি বিজ্ঞান নিহিত আছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অনুধাবনীয়। ইহার শব্দার্থ :—(১) স্মৃতিহেতু মনোবৃত্তি-গুণবিশেষ, (২) 'শাস্ত্রঅভ্যাস-জনিত ব্যুৎপত্তি, (৩) পূর্ব্বজন্মের অপূরিত বাসনা,'(৪) পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস যেমন গোশাবকের আমিষ বর্জ্জন, (৫) পাচনকর্ম্ম (পাক) যেমন ধান-গম ইত্যাদি হ'তে নানাবিধ খাদ্য, (৬) শোধনকরণ যেমন সমাজ-

সংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার, (৭) মেরাগত-কর্ম্ম, যেমন গৃহ ও পুষ্করিণী, (৮) দশবিধ সংস্কার, যেমন (i) গর্ভাধান, (ii) পুংসবন, (iii) সীমন্তোন্নয়ন, (iv) জাতকর্ম্ম, (v) নামকরণ, (vi) নিষ্ক্রামণ, (vii) অন্নপ্রাশন, (viii) চূড়াকরণ, (ix) উপনয়ন, (x) বিবাহ।

শেষোক্ত ৫ হইতে ৮নং অত্র আলোচ্য নহে। এখানে মাত্র সংস্কারের চিন্তাবিষয়ক অংশটুকুই প্রধানতঃ হইবে আলোচিত।

অনুভূতি ও স্মৃতি এই দু'টীই বুদ্ধির (জ্ঞান উপলব্ধির) প্রধান অংশ। বুদ্ধিস্থ সংস্কার বা প্রতিভাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞান-বিশ্বাস-বিবেক--ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ইত্যাদি। এই সংস্কার বা প্রতিভাই উহাদের নিয়ন্ত্রী—ব্যবস্থাপিকা। প্রতিভাদ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত।

ইহা সুবিদিত যে কায়মনোবাক্যদ্বারা কৃত কার্য্যের নামই কর্ম্ম, শুভ বা অশুভ। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তার মনেতে জন্মায় সংস্কার শুভ বা অশুভ। এইরূপ বহুতর সংস্কার ক্রমাগতভাবে কর্ত্তার চরিত্রকেই করে রচনা। সেই সংস্কার বা চরিত্রের শুভাশুভ ধাতু অনুসারে নব নব শুভাশুভ কর্ম্ম হয় আচরিত। উক্ত সংস্কার পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল-বিধায় তাহাকে কর্ম্মফলও বলে। ভাবিকর্ম্মের হেতুবিধায় তাহাকে কর্ম্মবীজও বলে। অতঃপর তাহাকে সংস্কাররূপী প্রকৃতিও বলে। কর্ম্ম না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। শুভকর্ম্মের আচরণই বিধি, আর অশুভাচরণ নিষিদ্ধ। বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিলে মানবকে অশুভকর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। সেই ধর্ম্মকর্ম্ম চতুর্ব্বিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রায়শ্চিত্ত। সেই সব শুভকর্ম্মের দ্বারা বিন্যস্ত হয় শুভ চরিত্র। অন্তে তাহা হইতে অদৃষ্টভাবে ফলে শুভফল।

সংস্কার বলে কাকে? মানুষ যাহা কিছুই করে অনুভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাম দ্বারা গ্রহণ করে যে কোন বিষয়, সেই বিষয়ের ছবি প্রতিরূপ—photo copy-image তাহার চিত্তে থাকে লগ্ন অর্থাৎ

তাহার স্মৃতি পথে হয় ধৃত, কথান্তরে তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হয় বিষয়টার ছবি। অনুভূত বিষয়গুলি কালক্রমে স'রে গেলেও অর্থাৎ তাদের অনুপস্থিতিতেও সে তাদের রূপ যথাযথরূপে স্মরণ বা ধারণা ও ধ্যান করিতে পারে। তাহার চিত্তে অনুভূত বিষয়ের ছাপ্ লাগিয়া থাকাই তাহার একমাত্র কারণ; এই সংকল্প ও সংলগ্ন ছাপের নাম তাহার ব্যক্তিগত **সংস্কার**।

আবার, এক বিরাট স্থির জলাশয়ের মধ্যে কতকটা লালরং ঢালা হ'লে, জলের যতটুকু অংশ রঞ্জিত হ'লো ততটুকু রঞ্জিত জলাংশ আপনাকে রঞ্জিত দেখিয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপটী ভুলিয়াই সাধারণতঃ নিজেকে আদি জলাশয় হইতে স্বতন্ত্র-পৃথক্ দেখে এবং তখনই আপন স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে; আরও দৃষ্টান্তে বলা যায়, মহাসমুদ্রে জমাট বাঁধা বরফখণ্ড ভাসিতেভাসিতে যদি আপন পূর্ব্বাবস্থা যে সমুদ্রাংশ তাহা ভুলিয়া আপনাকে এক স্বতন্ত্র-পৃথক জলরাজা ভাবে, তা'হলে এই উভয় ঘটনাই স্বাধিকার হ'তে বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত; এই বিচ্যুতির কারণ যাহা তাহাই **সংস্কার**। উপরোক্ত দু'টী উপমা রঞ্জিত জলাংশ ও সমুদ্রে ভাসমান বরফ চাঙ্গর কাল্পনিক, কিন্তু তৎসদৃশরূপে প্রকৃতবাস্তব রূপে ব্রহ্ম সমুদ্রে ভাসমান জীব-ও ব্রহ্মকে ভুলে আপনাকে একজন পৃথক্ ও স্বতন্ত্র কর্ত্তা সাজাইয়া লাভ করে কতকগুলি বিশিষ্ট জীবভাবীয় সংস্কার।

মানুষ তাহার সংস্কারবিশিষ্ট খণ্ড-খণ্ড জ্ঞানকে "আমি" মনে করিয়া তাহাতেই প্রীতিমান; অখণ্ডের দিকে তাকাবার পায় না অবসর। ইহা মোহসংস্কার বা জীবসংস্কার; মাতৃগর্ভমধ্যে অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন জীব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সেই অন্তর্জ্ঞান হারায় এবং পূর্ব্বজন্মের সংস্কার সমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিন থেকেই জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা হয় আচ্ছন্ন; পরে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পড়িয়া পরে হয় কামাসক্ত এবং ফলে অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত-আমোদনিরত-ব্যসনাসক্ত হয়। এইরূপেই

সুরু হয় তাহার পাপ-পুণ্য সংস্কার ; দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধির শাস্ত্র-নিষিদ্ধ স্পন্দনগুলিকে বলে পাপ। ক্রিয়াকালে ঐ স্পন্দন যাহার ক্রিয়া তাহাতেই থাকে লগ্ন, পরে স্পন্দনটী জীবের সংস্কাররূপে অধিষ্ঠিত হ'য়ে যায় মনে। অনাদি কাল হইতে জীব যত প্রকার নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা পাপ ক'রেছে, তৎসমুদয়ের সংস্কার তাহার মনে রহিয়াছে সংলগ্ন। এই সংস্কার সমূহের মধ্যে যাহা তাহার পূর্ব্ব জন্মের শেষ মুহূর্ত্তে হইয়াছিল উজ্জ্বল, তাহা দ্বারা তাহার প্রারব্ধ-দেহ উৎপন্ন,এবং এই প্রারব্ধদেহই তাহাকে সেই জাতীয় পাপকর্ম্মে দিতেছে প্রেরণা ; অবশিষ্ট সংস্কাররাশি সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কাররূপে আছে বর্ত্তমান। তাহার মনে আছে যেমন অনাদি-সঞ্চিত পাপকর্ম্মের সংস্কার তেমন আছে অনাদি-সঞ্চিত পুণ্য কর্ম্মের সংস্কারও। ধারাবাহিক দেবতাভাবনা দ্বারা পাপসংস্কার হ'য়ে পড়ে আবৃত। জ্ঞানের সূক্ষ্মতম অবস্থাই সংস্কাররূপে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকে জীবের প্রতিটী কোষে। এই প্রতি জীবকোষাধিষ্ঠিত জীবাত্মার ২৪টী তত্ত্ব জীবে একীভূত হইয়াই হয় সেই জীবের ভাব—জীবসংস্কার। সাংখ্যদর্শনের সূত্র "অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ" হইতে জানা যায় উক্ত ২৪টী তত্ত্ব এইরূপ যথা—"অবিশেষ" তত্ত্ব ৬টী=পঞ্চ তন্মাত্রতত্ত্ব (সূক্ষ্মভূত বা স্থূল পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের পূর্ব্বভাব)+১ অহঙ্কার তত্ত্ব (Executor ship) ; "বিশেষ" তত্ত্ব ১৬টী=১১টীইন্দ্রিয় (৫+৫+মনঃ)+৫স্থূল পৃথিব্যাদিমহাভূত ; ১টী "লিঙ্গমাত্র"=মহতত্ত্ব ; ১টী "অলিঙ্গ"=প্রকৃতি-প্রধান (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) ; মোট এই ২৪টী তত্ত্ব ; "অলিঙ্গ" প্রকৃতিকে বাদদিয়ে ২৩টী তত্ত্ব উৎপন্ন হয় ত্রিগুণ ভেদে।

মহতত্ত্বাদি ২৩টী তত্ত্বই সাংখ্য মতে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের বীজ ; মহত্তত্ত্বাদি ২৩টী তত্ত্ব হইতেই স্থূল, সূক্ষ্ম এই শরীরদ্বয়ের হয় পরিণাম। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী বর্ণনা করেন ত্রিবিধ "বিশেষ" পদার্থের যথা :—

(ক) সূক্ষ্ম শরীর, (খ) মাতাপিতৃজ শরীর (স্থূল ষাট্ কৌশিক শরীর) (গ) পঞ্চ স্থূলভূত ও ভৌতিক ঘটপটাদি বাহ্য।

২৩টী তত্ত্বে অবস্থিত জীবাত্মা পুরুষ উক্ত উপাধি দ্বারা (অবিশেষ-বিশেষ লিঙ্গমাত্র-অলিঙ্গ) পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ভোগের জন্য দেহ হইতে দেহান্তরে করে **সংসরণ**। আদি সর্গে (মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি---সর্গ) প্রকৃতি প্রত্যেক পুরুষের = জীবাত্মার (সাংখ্যমতে জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকৃত) এক একটী লিঙ্গদেহ উৎপাদন, করে। ৪ প্রকার এই লিঙ্গদেহ যথা :—(১) অসক্ত (অব্যাহতগতি)—শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে সমর্থ; (২) নিয়ত—আদি সর্গ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী; (৩) মহতত্ত্বাদি ১৮ তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন : (৪) নিরুপভোগ (= নাই উপভোগ যাহার) অর্থাৎ স্থূলশরীর বিনা ইহার ভোগ হয় না। স্থূল ষাটকৌশিক শরীর ব্যতিরেকে সূক্ষ্মশরীরের সুখঃদুখাদি ভোগ হয় না বলিয়া, ইহা পুনঃ পুনঃ (যাবৎ মুক্তি না হয়) স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে।

সংসার—দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণের নামই সংসার। ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহার কারণ; সূক্ষ্মশরীরে যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের নাই সম্পর্ক, তখন সূক্ষ্ম-শরীরের আবার সংসার? উত্তর :—"ধর্ম্মাদি ভাবসমূহ (ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-জ্ঞানাজ্ঞান-বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য-অনৈশ্বর্য্য) দ্বারা অধিবাসিত হওয়ায়, ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে করে সংসরণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবসমূহ বুদ্ধিতে অন্বিত হইয়া থাকে; সূক্ষ্মশরীর হয় আবার বুদ্ধিযুক্ত; অতএব সুরভি-চম্পকের সম্পর্ক বশতঃ বস্ত্র যেরূপ তদ্গন্ধ দ্বারা হয় বাসিত, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবযুক্ত বুদ্ধির সম্পর্কবশতঃ উহাদিগদ্বারা হয় অধিবাসিত বা সংস্কৃত অর্থাৎ কৃতসংস্কার।

আরও, সাংখ্যোক্ত ঐ ২৪টী সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা বিচার করুন শরীর-তত্ত্ব বিদ্। অধুনা উনবিংশতি শতাব্দীতে আবিষ্কৃত প্রতিটী মানব জীবকোষের মধ্যভাগের প্রধানাংশ (nucleus) হইতে উদ্ভূত সূত্রসম V-আকৃতি-বিশিষ্ট রঞ্জনীয় পদার্থেরও (chromosomes or genes

২৪টী chromosomesই (জৈব রঞ্জনীয় পদার্থ)

দর্শনের ২৪ তত্ত্ব

which determine the characteristics inherited by the children from one generation to another) সংখ্যা ২৪।

তথাকথিত ভাবের বা সংস্কারের ২৪টী অন্তঃতত্ত্বগুলির বাহ্যলক্ষণ যেন এই স্পষ্ট অণুবীক্ষণদৃষ্ট ২৪টী chromosomes (জৈবরঞ্জনীয় পদার্থ)। কৌতূহলী পাঠকের দ্রষ্টব্য Dr. J, Duesberg মহাশয়ের Anatomy. Anz. Band XXVIII S 475। মর্ম্ম :—"24 Nos. Chromosomes in each human cell.

In indirect cell division of the generative cells, epithelial cells, connective tissue cells, muscular tissue and nerve cells... .... The nucleus of a cell contains particles of a substance called chromatin imbedded in a homogeneous material called linin ; both being stainable . During the process of cell division the nuclear network of chromatin filament divides into a definite number of V-shaped segments called CHROMOSOMES. The number of Chromosomes varies in different animals, but is constant for all cells in an animal of any given species ; in man the number is given by Mr. Flemming (an English anatomist) in collaboration with Dr, J, Duesberg as **24**".

[v. Dr. J. Duesberg, Anat. Anz ,
Band XXVIII S 475]

সারা সংসারই সংস্কারময়

ইহা সুবিদিত—কর্ম্মকর্ত্রী প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ; এই "গুণ"-পদার্থকে

বৈশেষিকদর্শন বলেছেন "পরমাণু" (দ্রষ্টব্য যোগসূত্র বার্ত্তিক্)। পরমাণু ও ত্রিগুণ সমান পদার্থ। আবার শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৪।১৩) বলেন—

"অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি।
সর্ব্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥"

অর্থাৎ অণু-বৃহৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম, যে-যে পদার্থ আছে প্রসিদ্ধ, সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় দ্বারা সংযুক্ত—সকলেই প্রকৃতি-পুরুষ এই উভয়াত্মক। অতএব মানবও যে চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতির কার্য্য এবং মানবকে বিশ্লেষ করিলে প্রকৃতি-ও-পুরুষ বা পরমাণু-ও-চৈতন্য এই দু'টীর অতিরিক্ত অন্য পদার্থ পাওয়া যায়না—ইহা স্থির। চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা পরমাণুই যদি বিশ্বের একমাত্র কারণ হয় (কেননা পুরুষ বা চৈতন্য পদার্থ তো সর্ব্বগ বা common factor), তাহ'লে সৃষ্টিবৈচিত্র্য কেন ? ইহার উত্তরে = কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ ; পরমাণু-বা-সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিভিন্নরূপ সম্মূর্চ্ছনের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্মবিচিত্রতাই কারণ। মানসপটানুবিদ্ধ কর্ম্মসংস্কারই নির্ম্মাণ করে ভোগায়তন শরীর, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী বিশ্বচিত্রকর পরমেশ্বর কর্ম্ম-সংস্কারানুসারে নিখিলপদার্থের সৃষ্টি করেন, ধৌত-ও-ঘট্টিত আকাশ-মণ্ডলে অখিল পদার্থের চিত্র করেন অঙ্কিত। ∴মানব = চৈতন্যাধিষ্ঠিত পরমাণু বা ত্রিগুণ + মানবীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম বা **কর্ম্মসংস্কার**।

[বিঃ দ্রঃ—সূক্ষ্মচিন্তাশীল পাঠক ধীর-স্থিরচিত্তে ভাবিলে অনুমান করিতে পারিবেন যে শব্দ, পরমাণু, ক্ষণ, ত্রিগুণ, মায়া ইহারা বস্তুতঃ সমান পদার্থ]

শ্রুতির কথায়—আদি কথা = **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** ; পরের কথা—"একোঽহং বহুস্যাম"—এইরূপ অনুভব বা বোধের নাম ঈশ্বর-সংস্কার। নিত্য-নিরঞ্জন-নির্ব্বিশেষ-নির্ব্বিকার-নিষ্কর্ম্মা-নির্ব্ব্যবহার-পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে পরমাত্মা **কেবল-আত্মা**, যেখানে নাই কোন সংস্কারের বালাই ; মাত্র লীলাকৈবল্যবশতঃ কেবল-আত্মার স্বল্পাংশ

আরম্ভ করিলেন ব্যবহার; **সংসার** বাজার হ'লো তাঁহার স্বরূপ এবং **সংস্কার** হ'লো তাঁহার চিরসহচর। এই সংসারবাজারে পরিচিত হ'লেন ব্যবহারিক আত্মারূপে—প্রকৃতিরূপে; এই কর্ম্মকর্ত্রী প্রকৃতির যাবতীয় বিকৃতিই সংস্কার। [বিঃ দ্রঃ—শব্দদ্বয়ের ব্যাকরণ—সন্ধি-বিচ্ছেদে, (i) সংসার = সম্ + সার; সূত্র—উষ্মবর্ণ "স" পরে থাকায় পদের অন্তে স্থিত ম্-স্থানে হয় ং। (ii) সংস্কার = সম্ + কার; এই সন্ধিবদ্ধ পদটী নিপাতনে সিদ্ধ; অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা অসিদ্ধ পদে বর্ণাগমাদি কার্য্য, লক্ষণ বা সূত্র অবলম্বন না করিয়া পদটী সিদ্ধ। আরও, নিপাতন অর্থে অধঃক্ষেপণ, বহুসাধন যাহা আলোচ্য "সংস্কার" শব্দটীর বৈশিষ্ট্য (পরে দ্রষ্টব্য)। ধাতুগত অর্থ হইতে দেখা যায়—সংসার = সম্ + (গড়িয়ে গড়িয়ে গমন করা to creep) অর্থে √সৃ + কর্ত্তৃবাচ্যে ঘঞ্। সংস্কার = সম্ + (কর্ম্মকরা অর্থে) √কৃ + ভাববাচ্যে ঘঞ্। সম্ = অন্তকর্ম্মণি (to end, to finish) অর্থে √সো + কর্ত্তৃবাচ্যে ডম্। "সম্" মানে সংযোগ, সামীপ্য, আভিমুখ্য; সংযোগ-সামীপ্য-আভিমুখ্য অর্থে এবং "সংসার" ও "সংস্কার" শব্দদ্বয়ের সামান্য-সার্বজনীনভাবে উপভুক্ত এই অব্যয় শব্দ "সম্" সূচনা করিতেছে প্রধান শব্দদ্বয়ের গতির লক্ষ্য এক অন্তে; কিন্তু একটী কর্ত্তৃবাচ্যে ঘঞ (= কর্ম্মকর্ত্রী প্রকৃতির ভূত), অপরটী ভাববাচ্যে ঘঞ্ (= প্রকৃতির ভাব, বা তাঁর নিত্য সহচর পুরুষ)।

[এমতে দেখা যায় সংসারের মধ্যেই সংস্কার এবং সংস্কারের মধ্যেই সংসার। উপনিষদের কথায়, "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি"। দ্বৈতজ্ঞান হইতেই হয় ভয়; জীব ও ব্রহ্মের (= পুরুষের) ভেদজ্ঞানই দ্বৈতজ্ঞান—ভেদজ্ঞানই বিরহ, অদ্বয় জ্ঞানই মিলনানন্দ।]

ইতিপূর্ব্বে শক্তি ব্যাখ্যায় বহুশঃ কথিত যে পরস্পর বিরোধী আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি, তাদের সম্মেলনেই ফুটে ওঠে ভাব বা সংস্কার।

একমাত্র "অহং"-ভাবই পাপ, দেহাদিতে যে অহংবুদ্ধি, তাহাই মূল পাপ ; অনাত্মবস্তুতে যে আত্মবোধ, তাহাই সর্ব্বপাপের আকর ; কেবল পাপ নহে, যাকে সাধারণ কথায় বলে পুণ্য তাহাও পাপেরই অন্তর্গত। যেরূপ পরিণামাদি-দোষহেতু পুণ্য বা জাগতিক সুখও বিবেকীর দৃষ্টিতে দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ আত্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে অনাত্ম-বোধ মাত্রই পাপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই পাপ-পুণ্যেরই দার্শনিক নাম—সংস্কার। সংস্কার সমূহ জন্মে "পাপোঽহং" হইতেই। পৃথিবীতে যত রকম পাপ আছে, তাহা এই আমিবোধের উপরই আছে দাঁড়াইয়া। যে কোন কর্ম্মই হউক, তাহার মূলে আছে চিচ্ছক্তির ছায়া ; চৈতন্যাধি-ষ্ঠিত প্রকৃতিই সর্ব্বকর্ম্মের তথা সংস্কারের **মূল কারণ** ; প্রকৃতির প্রধানতঃ তমোগুণ হইতেই সংস্কারের জন্ম। কার্য্য, কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হয়, অতএব কারণে দোষ থাকিলে, কার্য্যও হয় দূষিত। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষ হয় প্রত্যক্ষের কারণ, সুতরাং, ইন্দ্রিয় যদি দূষিত না হয়, এবং বিষয়ের সহিত যদি ইন্দ্রিয়ের যথানিয়মে সন্নিকর্ষ ঘটে, চিত্ত যদি মলিন বা দূষিত সংস্কার দ্বারা আবৃত না হয়, তা'হলে, প্রত্যক্ষ হয় অভ্রান্ত। ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কার দোষ হইতে হয় মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি। অনাদি মিথ্যাসংস্কারই অবিদ্যা।

ব্রাহ্ম্যমানে শতবৎসরান্তে বর্ত্তমান ব্রহ্মার অপবর্গকালে বা মুক্তিকালে (=সংসারবন্ধনমোচন কালে বা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনকালে), সংসারখিন্ন (=সংসারে নানা স্থানে ভূয়োভূয়ঃ শরীরাদি পরিগ্রহহেতু ক্লিষ্ট, বাসাদি বিবিধ দুঃখভোগ পূর্ব্বক অবসন্ন) প্রাণিদের বিশ্রামার্থ সর্ব্ব-ভুবনপতির—সর্ব্বত্র অব্যাহত-প্রভাব-পরমেশ্বরের জগৎ সংহারের ইচ্ছা হইয়া থাকে। তদনন্তর স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূতের আরম্ভক সর্ব্বাত্মাতে সমবেত অদৃষ্টের—কর্ম্মসংস্কারের শক্তির প্রতিবন্ধ—বৃত্তির হয় নিরোধ। এইকালে অণুসকলের সংযোগের নিবৃত্তি ও পরমাণু পর্য্যন্ত হয় বিভাগ। জীবাত্মা অনন্ত, প্রত্যেক জীবের অদৃষ্টও ভিন্ন-ভিন্নরূপ

সুতরাং অদৃষ্টও অনন্ত; অতএব অনন্ত অদৃষ্টের পরিপাক ক্রমশঃ হওয়াই সম্ভব। অদৃষ্টক্ষয় বশতঃ কতিপয় জীব ভোগোপরত হইবে। অদৃষ্টক্ষয় না হওয়াতে কতিপয় জীব ভোগরত থাকিবে, কতিপয় জীব আবার ভোগাভিমুখ হইবে। একপে দেখা যায় সর্ব্বদা বিষয় প্রবৃত্তি হেতু শরীরাদির যুগপৎ অভাব হইবে কিরূপে? ইহারউত্তরে বৈশেষিক্ দর্শনাচার্য্য প্রশাস্তপাদ ব'লেছেন—সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে প্রবোধ ও নিদ্রা ব্যাপারের সদৃশ এবং স্থিতি জাগরণ তুল্য। কর্ম্ম শেষ হউক, আর নাই হোউক, রাত্রিকালে নিদ্রা যায় যেমন সবাই অর্থাৎ রাত্রি যেমন স্বাভাবিক নিদ্রাকাল (বিশ্রামকাল), সেইরূপ প্রলয়কাল স্বাভাবিক বিশ্রামকাল। সৃষ্টি ও লয়, প্রবোধ ও নিদ্রার ন্যায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মহাভূতসমূহের আপরমাণন্ত (= পরমাণু পর্য্যন্ত) বিভাগ, উত্তরোত্তর বিত্তমান থাকিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্বের বিনাশ হয় এই ক্রমানুসারে। প্রবিভক্ত-পরমাণুপুঞ্জ, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারানুবিদ্ধ—ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারবাসিত জীবাত্মাসকল ব্রাহ্ম্যমানে শত বৎসর কাল প্রলয়াবস্থাতে করে অবস্থান। অতঃপর প্রাণিদিগের সঞ্চিত কর্ম্মসমূহ ফলোন্মুখ হইলে, পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা জন্মে; তখন সর্ব্বাত্মগত অদৃষ্ট বা **কর্ম্ম সংস্কার** সকল পুনর্ব্বার বৃত্তি লাভ করে, উদিত বা জাগরিত হয়, ক্রিয়মাণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রলয় কালে পরমাণু সকল প্রবিভক্ত হইয়া করে অবস্থান; সৃষ্টি = সংহনন (= নিবিড় সংযোগ, নীরন্ধ্রতা, জমাট-বাঁধা) ব্যাপার (coalescence); লয় = বিলয়ন ব্যাপার। পরমাণুসমূহের কর্তৃস্বভাব-অধিষ্ঠাতার কল্পনাও ক'রেছেন ঋষি: চেতন-অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে অচেতনের হয় না কোন প্রবৃত্তি। প্রলয়ের পর যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয় আরম্ভ, তখন প্রথমে পবনপরমাণু-সমূহেই উৎপন্ন হয় কর্ম্ম। পবন বা বায়ুপরমাণুপুঞ্জে কর্ম্মোৎপত্তির পবনপরমাণুপুঞ্জ সমবায়িকারণ; লব্ধবৃত্তি (= শান্ত অবস্থা হইতে উদিত অবস্থাতে আগত) অদৃষ্ট বা পূর্ব্ব-কর্ম্মসংস্কার-

বিশিষ্ট আত্মা-ও-পরমাণুর সংযোগ অসমবায়িকারণ (Incoherent cause) এবং অদৃষ্ট নিমিত্তকারণ ; বায়ুপরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগ হইতে ক্রমশঃ দ্ব্যণুক-ত্র্যণুকাদির হয় উৎপত্তি, তদনন্তর স্থূল (মহান্) বায়ুর হয় বিকাশ। উৎপন্ন স্থূলবায়ু আকাশে দোধূয়মান (অপ্রতিহত বা অবাধিত হওয়ায়, অতিমাত্র বেগযুক্ত) হইয়া করে অবস্থান। তৎপরে সেই বায়ুতে আপ্য (জলীয়) পরমাণুসমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান সলিলনিধি উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র প্লাবমানাবস্থায় (প্রতিরোধকের অভাববশতঃ) অবস্থান করে। জলনিধির উৎপত্তির পরে সেই জলনিধির পার্থিব পরমাণুপুঞ্জ হইতে মহাপৃথিবী (স্থূল) সংহত বা মিলিত হইয়া, স্থিরভাবে করে অবস্থান। তদনন্তর উক্ত মহা সমুদ্রে পূর্ব্ববৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে উৎপন্ন তেজোরাশি, কাহারও দ্বারা অভিভূত না হওয়ায় দেদীপ্যমান হইয়া থাকে বিদ্যমান। এইরূপ ক্রমে বায়ু প্রভৃতি মহাভূত উৎপন্ন হইলে, পরমেশ্বরের সংকল্পমাত্র হইতে পার্থিব পরমাণু-সহিত তৈজসপরমাণু দ্বারা মহদণ্ড (=মহদ্ডিম্ব) হয় আরব্ধ। পরমেশ্বর অতঃপর সকল ভুবন-সহিত সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে উৎপাদনপূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টি করিতে বিনিয়োগ করেন। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বিনিযুক্ত অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ব্রহ্মা প্রাণিদিগের কর্ম্মবিপাক জানিয়া, তদনুরূপ (যাহার যেরূপ কর্ম্ম) সৃষ্টি করেন মানস (=মনঃসঙ্কল্পসম্ভূত—অযোনিজ) প্রজাপতি, মনু, দেবর্ষি, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ও অন্যান্য উচ্চাবচ-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম ভূত সমূহ॥ উপরে কথিত অতিশয় জ্ঞান বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিবার অভিপ্রায় এই যে—**জ্ঞানা**তিশয্য বশতঃ প্রাণিদের ধর্ম্মাধর্ম্ম ; যে প্রাণীর যেরূপ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মা যথাযথ ভাবে তাহা বিদিত হয়েন ; **বৈরাগ্য**নিবন্ধন পক্ষপাতশূন্য হইয়া প্রজাসৃষ্টি করেন ; **ঐশ্বর্য্য**হেতু প্রাণীগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করান॥

সৃষ্ট ভূতসমূহের মধ্যে যাহার যেরূপ আশয় (=পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কার) তাহাকে তদনুরূপ জ্ঞানাদিই প্রদান করেন, বিন্দুমাত্র তাহার অন্যথা করেন না।

[প্রলয়ে নিখিল পৌরুষেয় (man-made) আগম (=শ্রুতি-তন্ত্রশাস্ত্র-আপ্তবাক্য ; এবং যাহা শিবমুখ হইতে নিঃসৃত, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক আকর্ণিত এবং বাসুদেবানুমোদিত) বিলয় প্রাপ্ত হইলেও, সর্ব্বাগমের বীজস্বরূপ **অপৌরুষেয় বেদ** থাকেন বিদ্যমান ; এই বীজ অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষগণ কর্ত্তৃক আগম সকল হয় নিবদ্ধ। অতএব বলা যায়—বিশ্বজগতে, ঋষি আর্য্য-যবন-ম্লেচ্ছ যে কেহ যে কোন বিজ্ঞানের—যে কোনও সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসমুদায় নিত্য-বেদেরই উৎসৃষ্ট।

ঋষি, প্রজাপতি, মনু এঁদের শরীর মানস (=অযোনিজ), এঁরা দৃষ্টসংস্কার (=দৃষ্ট বা সাক্ষাৎকৃত হয় **পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার** যাঁদের); সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যেমন পূর্ব্বসংস্কার সমূহের পূর্ব্বজ্ঞানাদির হয় স্মরণ, এঁদেরও তেমন কল্পান্তরে অনুভূত সর্ব্বপ্রকার শব্দার্থ-ব্যবহারের স্মরণ হয়, পূর্ব্বকল্পে যে-যে শব্দ যে-যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান কল্পেও এঁরা সেই-সেই শব্দের সেই-সেই অর্থেই ব্যবহার করেন; এবং এরূপে ব্যবহারপরম্পরায় লোকের শব্দার্থের হয় ব্যুৎপত্তি। এই তো গেল পারলৌকিক বা জন্মান্তরের সংস্কারের উৎপত্তি কথা। এইবার ইহলোকের সংস্কারের উৎপত্তি কথায় বলা যায়—

(১) কতকগুলির উৎপত্তি (Law of heredity)—অপত্যে-সংক্রমণশীলতা বা সন্ততিপ্রবণতা ও (Adaptation)—সঙ্গতিপ্রবণতা এই নিয়মদ্বয়ের অধীনে ;

(২) কতকগুলির উৎপত্তি—ইদানীন্তন বা বর্ত্তমান জন্মের অভ্যাসই ব্যক্তিগত ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কার-বা-বাসনার হেতু ; অবশ্য জন্মান্তরের অভ্যাসই প্রকৃষ্ট কারণ ;

(৩) প্রাণিমাত্রেই স্ব-স্বপ্রতিভায় নির্ণয় করে ইতিকর্ত্তব্যতা, স্ব-স্ব

প্রতিভাকেই সকলে প্রমাণরূপে দেখিয়া থাকে ; ইহা এইরূপ বা এইরূপ নহে ; পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-বালক-বৃদ্ধ প্রৌঢ়-যুবা সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে তাহা করে অবধারণ। পুংস্কোকিলকে মধুমাসে পঞ্চম-স্বরে গান করিতে, মৌমাছিকে মৌচাক নির্ম্মাণ করিতে, বানর কুকুর প্রভৃতি ইতরজীবকে হিতকর, অহিতকরদ্রব্যনির্ব্বাচন ও ভেষজ সংগ্রহ করিতে শিখায় তাদের স্ব-স্বসংস্কার বা প্রতিভা। ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় মৃগ-ও-পক্ষিগণ যে, স্ব-স্ব জাতি প্রসিদ্ধ আহারাদি ক্রিয়াতে (আহার-প্রীতি বা রাগ-দ্বেষ, প্লবন-উড্ডয়ন....) প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রবর্ত্তয়িতা তাদেরই অনাদি প্রতিভা বা অনাদি সংস্কার।

(৪) মহর্ষি কণাদের সংস্কার গুণপদার্থ তিনভাগে বিভক্তঃ (ক) **"বেগ"**-গুণ সংস্কারের উৎপত্তি ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎমনঃ এই পঞ্চদ্রব্যে নোদনাভিঘাতাদি কর্ম্ম (Impulse, Impact) হইতে। (খ) **"ভাবনাগুণ"** সংস্কার হয় আত্মগুণ ; ইহা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত অর্থসমূহের স্মৃতি-ও-প্রত্যভিজ্ঞান (Recognition)-হেতু। পটুপ্রত্যয়, অভ্যাসপ্রত্যয়, এবং আদরপ্রত্যয় হইতে সংস্কারের আতিশয্য—সংস্কারের হয় দৃঢ়তা। কোন আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিলে লোকে তাহা দেখে মনোনিবেশপূর্ব্বক, এবং তজ্জন্য তাহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় সেই পদার্থের সংস্কার—ইহাই পটুপ্রত্যয়জ সংস্কার। বিদ্যা, শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ অভ্যস্যমান হইলে, ইহাদের যে সংস্কারাতিশয় হয়, তাহাই অভ্যাসপ্রত্যয়জ সংস্কার। ভাবনাসংস্কারের প্রধান বা প্রথম কারণ আত্ম-মনঃ সংযোগ। (গ) **"স্থিতিস্থাপক"** সংস্কার (Elasticity) স্পর্শবদ্দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম যেমন, সংকোচন (Compression)-আকর্ষণ (Traction) আনমন (Flexion) —ব্যাবর্ত্তন (Torsion) ; আণবিক সন্নিবেশের তারতম্যেই উৎপন্ন হয় এই সংস্কার।

(৫) জাতিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংস্কার—বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, নিত্য নৈমিত্তিকাদি বহু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ক সংস্কার।

(৬) আয়ুজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংস্কার—বাল্যযৌবনাদি বিশেষ অবস্থা ও তত্তৎ কালোচিত কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য জ্ঞানের সংস্কার।

(৭) ভোগবিষয়ক বহুসংখ্যক বৈচিত্র্যপূর্ণ অবান্তর সংস্কার।

(৮) জীবভাবীয় সংস্কারগুলি, আসলে পূর্ব্বজন্মের বীজ হ'লেও ইহজন্মে হয় অঙ্কুরিত! ইহাদের স্বরূপ যেমন—আহার-নিদ্রা-মৈথুন-মলমূত্র ত্যাগ-ভয় আশা-আত্মরক্ষা! প্রত্যেকটী এক-একটী-সংস্কার।

(৯) বহুজন্মব্যাপী বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, কিংবা যোগ তপস্যাদির সাহায্যে, অথবা জ্ঞান-ভক্তির অনুশীলনে মানব **সঞ্চয়** করে পরমাত্ম-বিষয়ক **সংস্কার সমূহ** যেমন আত্মজ্ঞানের জন্য অহংবোধাত্মক আনন্দ, বহুভাবেচ্ছামূলক, আনন্দ, একান্তনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, দান, যজ্ঞ, সত্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, নির্লোভ, মৃদুতা, লজ্জা, ধীরতা, অদ্রোহ, নিরভিমান! তদ্বিপরীতে **দুষ্টসংস্কার** তালিকায় পড়ে—রজোগুণ, বিক্ষেপ, আবরণ, দর্প, ভয়, দম্ভ, ভোগাভিলাষ, লোভ, মোহ, ক্রোধ, শারীরিক বল, অভিমান, দোষদৃষ্টি, অক্ষমা, নিষ্ঠুরতা, দ্বেষ, ইত্যাদি; "আমি"-"আমি" ও "আমার"-"আমার" ভাব, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, বিপর্য্যয়-জ্ঞান, [ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ং-শঙ্কা-জুগুপ্সা (ভেদজ্ঞান) -কুলাভিমান-স্বভাব-জাতি], দ্বৈতজ্ঞান ।

(১০) সত্ত্বগুণপ্রধান প্রকৃতির পরিণাম হয় চিত্ত বা মনঃ; চিত্ত সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া, বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়ের সহিতই থাকে সম্বন্ধ। বেদব্যাস ব'লেছেন—গ্রন্থিদ্বারা সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত মৎস্যজালের মত, চিত্ত অনাদিকাল হইতে ক্লেশ, কর্ম্ম-ও-বিপাকের সংস্কারগ্রন্থি সমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া ধারণা করে বিচিত্ররূপ। জীবাত্মা ও চিত্ত এই পদার্থদ্বয়ের ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ অনুভব করা দুঃসাধ্য ব্যাপার;

প্রকৃত যোগী না হ'লে সে অনুভূতি অসম্ভব। শুদ্ধ অনুমান প্রমাণদ্বারা জীবাত্মা ও চিত্ত এই পদার্থদ্বয়ের পার্থক্য বোঝা যায় না। ন্যায়দর্শন বলেন—চিচ্ছায়াবিশিষ্ট চিত্তই জীবাত্মা। বেদের চিত্ত—প্রজ্ঞান। সংজ্ঞানার্থক √চিৎ+ক্ত=চিত্ত। অববোধার্থক √মন+অসুন= মনঃ। যাহা জ্ঞানের কারণ তাহাই চিত্ত বা মনঃ। আত্মার সংস্কারাত্মক চঞ্চলতাময় অবস্থাই মনঃ। শরীরের মেদাংশই মনের বাসস্থান; স্নেহার্থক √মিদ হইতে উৎপন্ন এই মেদশব্দ। যাস্কমুনি ও গালবঋষি ব'লেছেন এই স্নেহপদার্থমেদের উৎপত্তি শ্বেতমাংস; প্রাচীনেরা শ্বেতমাংস বলিতেন বর্ত্তমানের কাশেরুক মজ্জাকে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের Spinal cord and Brain matterকে অর্থাৎ সমস্ত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জু সমূহকে। তাই জীবেরই আছে অনুভবশক্তি; অনুভব-শক্তির কেন্দ্র সংস্কার।

সংস্কার-উৎপত্তির উপসংহারে বলা যায়—সংস্কার বশেই পুত্রবতী নারী পুত্রের পালন না করিয়া থাকিতে পারে না। দেহ মনের অধীন; মন কিন্তু দেহের সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অধীন নহে। অবশ্য দেহের ব্যবহার উৎপাদন করিতে পারে মনের বাসনাত্মক সংস্কার; সেই বাসনাত্মক সংস্কার আবার জাগাতে পারে দেহের ক্রিয়া। এরা পরস্পরাপেক্ষ হইয়া একে অন্যের হয় কারণ। বাসনা হয় কর্ম্মের জনক; কর্ম্ম বাসনার ভিতর দিয়া প্রসব করে কর্ম্ম; বাসনা কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রসব করে বাসনা; কখনও কর্ম্ম জনক, বাসনা সন্তান, আবার কখন বাসনা জননী কর্ম্ম সন্তান। এই ভাবে **কামসংস্কার** (=বাসনা) ও **কর্ম্ম সংস্কার** হয় আবর্ত্তিত। কাম ও কর্ম্ম—এই উভয়েরই জননী অবিদ্যা। বাসনার বাসভূমি মনঃ; কর্ম্মের বাসভূমি দেহের কর্ম্মেন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয়। কিন্তু এ-কথা অবিদ্যাবস্থার কথা; বিদ্যাবস্থায় বা সজাগ অবস্থায় অজ্ঞান ধ্বংস হইলে অজ্ঞানজাত অন্তঃকরণ (=মনঃ) হয় বাধিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত। তখন মনে কর্ম্মজনিত

বাসনার উদ্ভব হ'তে পারে না। লৌকিক ব্যবহারে ও যেখানে মনের ব্যাপৃতি ছাড়া শুধুই দেহের ব্যাপৃতি হয় সেখানে জন্মে না বাসনাত্মক সংস্কার; কেবল দেহের ব্যাপৃতিতে মানস জগতের উদ্ভব হইতে পারে না। মনের ব্যাপৃতিতেই সেই মানস জগৎ হয় সৃষ্ট; বাসনাই মানস জগতের স্রষ্টা। মনঃ বাধিত হইলে বাসনার জন্মের আশঙ্কা আর হইতেই পারে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে দেহের তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতে মনের বাসনাত্মক সংস্কার উৎপাদন নিত্য, নিশ্চিত ও আবশ্যিক নহে। যেখানে দেহের ক্রিয়ার পশ্চাতে মনের বাসনাজাত প্রেরণা নাই সেখানে দেহের ক্রিয়া বাসনাত্মক সংস্কার উৎপাদন করিতে পারে না। এই কথা পুনঃ পুনঃ গীতায় উপদিষ্ট (দ্রষ্টব্য গীঃ ১৮।১৭; ৪।১৪,২২,২১,৪২; ৫।৭,৮,৯; ৩।২৭,২৮ ইত্যাদি)।

আরও (যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে)—অবিদ্যাবস্থায় (অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়সমন্বিত মোহনিদ্রাবস্থায়) দেহক্রিয়া মনে বাসনাত্মক সংস্কার জন্মাইবার **নিমিত্ত** হইলেও জ্ঞানাবস্থায় দেহক্রিয়া মনে বাসনাত্মক সংস্কার উৎপাদন করিতে পারে না বা উৎপাদন করার নিমিত্তও হ'তে পারে না; অজ্ঞানাবস্থায়ই দেহ-ক্রিয়ার জননীশক্তি, জ্ঞানাবস্থায় দেহক্রিয়াতে জননীশক্তি থাকে না; তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যাপার তথা দেহক্রিয়া বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানাবস্থার যেদেহক্রিয়া তাহামনের তাৎকালিক সঙ্কল্পবিকল্পজাতও নহে তথা মনের সঙ্কল্পবিকল্পজন্মাইবার হেতুও নহে। যে সঙ্কল্পবিকল্পের পশ্চাতে পারমার্থিক জীবের পারমার্থিক প্রেরণা নাই, সে সঙ্কল্পবিকল্প নূতনের নিমিত্ত হইতে পারে না কেননা সে সঙ্কল্পবিকল্প বাস্তব নহে, আভাস মাত্র; তাই সে সঙ্কল্পবিকল্পজাত কর্ম্ম বাসনাত্মক সংস্কার-জন্মাইতে পারে না; পারমার্থিক জীবই করে গর্ভাধান। পারমার্থিক জীবের জীবত্ব জ্ঞানাবস্থায় হয় নিবৃত্ত; সে অবস্থায় পারমার্থিক জীব সাক্ষী স্বরূপে হয় স্থিত। গর্ভাধান কে করিবে? অজ্ঞানকালীন বাসনা-

ত্মক সংস্কার যাহা যাহা অজ্ঞানকালে অন্তঃকরণে সঙ্কল্পবিকল্পের দিয়াছে জন্ম,তাহা তাহা মাত্র মনঃকে ব্যাপারান্বিত করিতে পারে। কিন্তু যাহা যাহা অজ্ঞানকালে মনে তখনও (জ্ঞানপূর্ব্বাবস্থা) সঙ্কল্পবিকল্পের জন্ম দেয় নাই তাহা তাহা জ্ঞানকালে মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হইয়া নষ্ট হয় বলিয়া আর মনে নূতন সঙ্কল্পবিকল্প জাগৃতির হেতু হ'তে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ডাঃ হরগোবিন্দ খোরাণার অধুনা কৃত্রিম জীবসৃষ্টির আবিষ্কার কথা। •

চৈতন্যের প্রথম উন্মেষণে জড়প্রায়রূপে ক্ষুদ্রতম জীবাণুআকারে হয় উন্মেষিত প্রথম **আত্মরক্ষারূপ-সংস্কার**; ইহার পূর্ব্বে যে কতকাল জড়রূপে অভিব্যক্ত ছিল জীবটী তাহার নাই ইয়ত্তা। দর্শন শ্রবণাদি যে-কোন ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার হয় নিষ্পন্ন, সকলের সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে উঠে জীবের তথা মানবের "অহং"-ভাবটা এবং ঐ অহংভাবকে ছেড়ে ক্ষণকালের জন্যও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা (=চৈতন্যেরই স্বপ্রকাশিত অংশ)। "একমাত্র আত্মাব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই"—ইহা সহস্রবার বুঝিয়া লইলেও, কি জানি, কোথা হইতে বুকের মধ্যে ফুটে উঠে ঐ অহংভাবটী বা "আমিটী"। তখন আত্মা ও "অহংটী বা আমিটা"-র মধ্যে দেখা যায় একটা দুশ্ছেদ্য ব্যবধান। এই সূক্ষ্ম "আমিটী" মানবকে সুনির্ম্মল আত্মক্ষেত্র বা বা চিন্ময়ক্ষেত্র হইতে রাখে অনেক দূরে; শত চেষ্টাতেও ঐ ব্যবধান দূর করা যায় না; আত্মরাজ্যের আত্মসুখ হ'তে বঞ্চিত হওয়াই যেন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতার পক্ষে উৎপীড়ন বা অত্যাচার—ইহারই নাম **সংস্কার**; এখানে এই অত্যাচারই সংস্কারের স্বরূপ; এই অত্যাচার রূপ সংস্কার মানবহৃদয়ে আছে আবহমান কালই; তবে যতদিন কামনা-বাসনা কিংবা কাম-ক্রোধাদি রিপুদলের অত্যাচার দূর করায় ব্যাপৃত থাকেন সাধক ততদিন এই সূক্ষ্ম সংস্কারের দিকে লক্ষ্য করার পান না অবসর এবং সামর্থ্যও থাকে না তাঁহার। বহিঃশত্রুর বা স্থূল ইন্দ্রিয়া-

দির অত্যাচার প্রশমিত হ'লে সূক্ষ্ম স্বরূপের দিকে তাকাইবার সাধকের সামর্থ্য ও অবসর হইয়া থাকে; তাই প্রশান্তচিত্তে একবার নিজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার সুযোগ আসে। স্থূল অত্যাচারের পর সূক্ষ্মতর উপদ্রব হয় বুদ্ধিক্ষেত্রে; ইহাই **প্রারব্ধ সংস্কার।** ইতিপূর্ব্বে কথিত—চৈতন্য বা চিতিশক্তির বিশিষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতারা; ১১টী অধিপতি দেবতা; ইহাদের দ্বারাই সংসারের সূক্ষ্ম উৎপীড়ন ঘটে। বুদ্ধি-সংস্কার পার হ'লে (দূর হ'লে) প্রজ্ঞাক্ষেত্রেই লাভ হয় আত্মজ্ঞান। যদিও দেবতারা চৈতন্যেই প্রতিষ্ঠিত তথাপি-অহংজ্ঞান-অহঙ্কাররূপ অবিদ্যায় অভিভূত হইয়া, স্বাশ্রয় চিদ্-বস্তুকে ভুলিয়া অবিদ্যারই করে সেবা। অবিদ্যা তো আর যথার্থ চিদ্বস্তু নহে; সুতরাং সে দেবতাদিগকে দিতে পারে না চিদ্বস্তুর আস্বাদ। আরও, অবিদ্যা-অজ্ঞান প্রভাবে আকৃতিগত বৈচিত্র্যই প্রীতির বা অপ্রীতির বিষয় হয়; কিন্তু, জ্ঞানী আকৃতিগত বহুত্বের মধ্যে দেখেন একই বস্তু। দৃষ্টান্তে বলা যায়, চিনির নানা আকৃতির মঠ-পুতুল যাহা অজ্ঞান-শিশু আনন্দে করে নির্ব্বাচন; কিন্তু বর্ষীয়ান্ সবেতেই দেখেন এক চিনিই। যে সব কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে, যাহাদিগকে বলা হয়:—(১) স্বয়ংসিদ্ধ (automatic), (২) প্রত্যাবৃত্ত (reflex), (৩ সাহজিক বা যাদৃচ্ছিক (spontaneous) ইত্যাদি, তাদের স্বরূপ) ভাবিলে প্রতিপন্ন হইবে সংস্কারই তজ্জাতীয় কর্ম্মসমূহের কারণ।

সংস্কার বা বাসনার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য; সংস্কার-বা-বাসনার পূর্ব্বভাব অভ্যাস-বা-পূর্ব্বকর্ম্ম। যাঁরা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁদের মতে ইদানীন্তন অভ্যাসই জাতি-বা-ব্যক্তিগত সংস্কারের ভেদের কারণ নহে: জন্মান্তরের অভ্যাসও ইহার কারণ, অপিচ জন্মান্তরের অভ্যাসই প্রকৃষ্ট কারণ॥ অরূপ সংস্কারের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বরূপ অনুধাবন করিলে হ'তে হয় বিস্মিত। দৃষ্টান্তে বলা যায়—

(১) শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানলাভের পথে যে সকল অন্তরায়ের উল্লেখ

আছে তাহার অন্যতম বিঘ্ন পরমাত্মার **'রসাস্বাদ'**; বিশিষ্টভাবে ভগবৎরসের আস্বাদনকে পরম পুরুষার্থ ভাবিলে সহসা উদ্ভাসিত হয় না অদ্বয়তত্ত্ব; আবার এই অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও মুক্তিলাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যাঁরা বলেন—মুক্তি বাঞ্ছনীয় নহে, ভগবৎপ্রেম-রসের আস্বাদনই একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাঁহারা জেনে রাখুন—যতক্ষণ মুক্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ যথার্থ প্রেম অসম্ভব—হইতেই পারে না প্রেম; অনন্য ভক্তিই যথার্থ প্রেম।

(ii) পুরুষকাররূপ সংস্কার—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণকারী সাধক অলস-অকর্ম্মা-শ্রমবিমুখ এবং তাঁর পুরুষকার বলিয়া কিছু নাই। বাস্তবিক কিন্তু আত্মসমপণযোগসিদ্ধ সাধকই যথার্থ পুরুষকারের স্বরূপ বুঝিতে পারেন; তিনি কখনও তামসিক জড়তাগ্রস্ত হ'ন না। আরে! পুরুষ তো পরমপুরুষ পরমাত্মা! তাঁহার যে কার (= কৃতি), তাহাইতো পুরুষকার। যতক্ষণ সাধ্য (= পরমাত্মা) সাধকরূপ একটুও থাকে ভেদ, ততক্ষণই থাকিবে পুরুষকার। যখন সাধ্যসাধকসম্বন্ধহীন এক অদ্বিতীয় নিরঞ্জন সত্তারূপ সাধ্যে পৌঁছেন সাধক, তখন—কেবল তখনই মাত্র থাকে না **পুরুষকার।** যেখানে নাই ইন্দ্রিয়, যেখানে নাই মন, যেখানে নাই বুদ্ধি সেখানে আর কিরূপে থাকিবে পুরুষকার? তাই শাস্ত্রের উপদেশ—সাধনার প্রথম অবস্থা থেকেই প্রয়োজন তীব্র পুরুষকার এবং শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতে হইবে ঐ **পুরুষকার।** যে মুহূর্ত্তে সর্ব্বভাবের (= সংস্কারের) হয় বিলয় সেই মুহূর্ত্তেই পরিসমাপ্তি পুরুষকারের এবং স্থিতি হয় **কেবল-পুরুষস্বরূপে**; ইহাকেই বলে দ্রষ্টৃ-স্বরূপে অবস্থান বা ব্রাহ্মীস্থিতি বা প্রেমে আত্মহারা-ভাব।

(iii) দ্বৈতজ্ঞান ও ভেদজ্ঞান সংস্কার—সমাধিসহায়ে সাধক যেতে চান অদ্বয়স্বরূপে; সেই সময় তাঁর পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারবশে তাঁকে নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইতে অবতরণ করিতে হয় বিশিষ্ট-

চৈতন্যে ; সে বিশিষ্টতা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়রূপ সূক্ষ্মই হউক, অথবা দেহ কিংবা রূপরসাদি বিষয়রূপ স্থূলই হউক, তাঁকে কিন্তু সেই নির্ব্বিশেষ হইতে বিশিষ্টতায় নামিতেই হয় ; সমাধিরূপ সেই নির্ব্বিশেষ অদ্বয়-ক্ষেত্রে অবস্থান অসম্ভব। আরে, "শ্রীভগবান্‌কে দেখিতেছি"—"শ্রীভগবানের করিতেছি ধ্যান"—"শ্রীভগবানের সাক্ষাতকার লাভ করিতেছি"—এই গুলিও তো দ্বৈতজ্ঞান। উহারাও তো জীবভাব। সাধক পরমাত্মা হইতে একটী পৃথক্—এইরূপ একটু সূক্ষ্মভাব থাকে বলিয়াই তো পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদজ্ঞানগুলি উঠে ফুটিয়া—উহারাই তো জীবসংস্কার ; উহাদের বিলয় করিতে হইলে সর্ব্বসংস্কারের একান্ত বিলয় আবশ্যক। নতুবা কোনরূপ কিছু বিশিষ্টতা থাকিলেই নির্ব্বিশেষ ক্ষেত্রটী হইবে কলঙ্কিত। ইহাই দ্বৈতজ্ঞান ও ভেদজ্ঞান সংস্কার।

(IV মূর্ত্তিপূজা সংস্কার—পুরাণে ও তন্ত্রে মূর্ত্তিপূজার বিধান বহুল ; আবার শাস্ত্রও বলেন যে, মৃৎ-শিলা-ধাতু-দারু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত মূর্ত্তিতে পূজাদি করিলে ঈশ্বরলাভ হয় না। এই দুইটা সত্য কথার বিচার যদি মাত্র মৃদাদি গঠিত মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে পূজা করা হয়, তবে সত্য সত্যই যথার্থ ঈশ্বর লাভ হয় না ; কিন্তু মূর্ত্তিটীকে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী মহতী চিতিশক্তির ঘনীভূত বিকাশরূপে বিরাট চৈতন্যসত্তার কেন্দ্ররূপে—আত্মপ্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করিয়া পূজা করিলে, উহা কখনও হয় না নিষ্ফল। প্রাচীনের মনীষিগণ ঐরূপ ভাবেই বিভিন্ন মূর্ত্তির পূজা করিয়াই অদ্বৈতজ্ঞান ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতেন। নাস্তিক হিন্দু, একেশ্বর-নিরাকারবাদী খৃষ্টান মুসলমান বলেন—স্থূলবুদ্ধি মানবের জন্যই মূর্ত্তিপূজার বিধান! মূর্ত্তির যথার্থ রহস্য বুঝিয়া, সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা করিতে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই পারগ ; নচেৎ মূর্ত্তির বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ সংস্কার লইয়া স্থূলবুদ্ধি কনিষ্ঠাধিকারীদের পূজা নহে প্রকৃত পূজা। স্ত্রীজাতির সর্ব্বাবয়বে দুগ্ধ থাকিলেও যেমন স্ত্রীর স্তন ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ

হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তেমন বিশ্বব্যাপী চৈতন্যসত্তার বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশিষ্ট মূর্ত্তির আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র হয় না সম্ভব। যাঁরা স্থূলাতিরিক্ত চৈতন্য-সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁরাই মূর্ত্তিপূজার যথার্থ অধিকারী; যতদিন স্থূলদেহ আছে, ততদিন মূর্ত্তিপূজা থাকিবেই। অহর্নিশ পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই কোন না-কোন প্রকারে মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া মূর্ত্তিপূজাসংস্কার রাহিত্যের ভাণ করা আত্ম-প্রবঞ্চনারই লক্ষণ। মূর্ত্তিকে জড়জ্ঞানে পূজা করিয়াই কিছুদিন যাবৎ ভারতে এসেছে জড়ত্ব।

(v) আত্ম-অনাত্ম বহুবিধ সংস্কার যথা :—জন্ম-মৃত্যু, শুচিসংস্কার (ছুঁচীবাই) মায়া, মমতা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, ক্ষান্তি, শান্তি, শ্রদ্ধা, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি, আহার-বিহারাদি, রাগ-দ্বেষ, হিংসা, ষড়্‌রিপু, দান, যাচ্ঞা। স্ত্রীসংস্কার, শিশু-বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধসংস্কার অষ্টপাশসংস্কার (=ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-শঙ্কা-জুগুপ্সা কুলং-শীলং-জাতি), ভেদ সংস্কার। প্রবৃত্তি সংস্কারের দুই দিক, যথা বিষয়াভিমুখী ও আত্মাভিমুখী; বিষয়াভিমুখী বেগের ফলে কামনা-বাসনা ইত্যাদি উপসংস্কার এবং আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তির ও দৈবিক উপসংস্কার বহু। পক্ষান্তরে নিবৃত্তি বিষয়বিরতি সম্পাদন পূর্ব্বক প্রবৃত্তির হয় সহায়। এতদুভয়েরও আছে বিভিন্ন কর্ম্ম; কর্ম্ম থাকিলেই কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ত্তব্যত্ব প্রভৃতির থাকে সংস্কার। যদিও ইহারা সূক্ষ্ম—উন্নতস্তরে তথাপি ইহারাও অনাত্মভাবের পরিপোষক; বিন্দুমাত্র অনাত্মভাব থাকিতে আত্মার যথার্থ স্বরূপটী হয় না উদ্ভাসিত। তাই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অনুচর-রূপ অনাত্মসংস্কার গুলির নাশই বাঞ্ছনীয়।

সংস্কার মাত্রেরই আছে একটা বিশিষ্টমূর্ত্তি, ঐ মূর্ত্তি ভাবময়ী; সংস্কার সমূহের যে মুহুর্মুহুঃ চঞ্চলতা তাহাই সংস্কারের গতিশক্তি

(=চরণ); উহাদের অভিলাষ বা গ্রহণ করার ইচ্ছা (=বাহু), উহাদের প্রকাশ ভাব (=অক্ষি)। আরও, যেমন বৈদ্যুতিক কার্য্যে পরস্পর বিরোধী শক্তিদ্বয়ের মিলন (+ও—), যেমন জীবের ভোগায়তন দেহ গঠনে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির মিলন, তেমন—ঠিক তেমন জীবের সংস্কারসমূহ (=মনোভাব) ফুটিয়া উঠে তাহার অন্তঃস্থ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ রূপ পরস্পর বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সম্মেলনে।

অথ সংস্কারনাশ কথা—জীবত্বই প্রথম-প্রধান-প্রাচীন সংস্কার; জীবত্বের অবসানে সংস্কার নাশ। সংস্কারের অন্যতম আধার যে মনঃ, সেই সম্পূর্ণ মনঃটাকে ভগবানের চরণে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবত্বের হয় অবসান তথা নাশ হয় সর্ব্বসংস্কারের। উহা—ঐ অর্পণ কর্ম্ম-রূপ ঘটনা এক'দিনে হঠাৎ অকস্মাৎ ঘটে না; পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের বলে যখন সাধক এমন এক অবস্থায় আসেন যে, কিছুকাল তাঁহার বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করার হয় সামর্থ্য, তখনও আবার মমত্ববোধে আকৃষ্ট হইয়া—প্রারব্ধ সংস্কারের প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া নানারূপ স্থূলবিষয়ক চিন্তা আসে এবং বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা তাঁহাকে হইতে হয় উৎপীড়িত। প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিয়া, বিষয়ভুলিয়া, সেই মুগ্ধকর বুদ্ধিজ্যোতিতে হ'য়ে পড়েন মুগ্ধ; ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্বে থাকার কাল যত দীর্ঘ হইতে থাকে ততই সেখানে থাকিয়াও স্থূলদেহাদি-বিষয়ক চিন্তা যেন আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত। বহুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম যদি সহসা মুক্ত আকাশে উড়িবার সুযোগ পায়, তথাপি যেমন সে বেশী দূরে না গিয়া, আবার সেই চিরাভ্যস্ত বাসস্থান—পিঞ্জরটিতে ফিরিয়া আসে, তেমন বহুদিন দেহাত্মবোধে আবদ্ধ সাধক যদি ভগবৎ কৃপায় সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহের সন্ধান পান, তথাপি তাহাতে তিনি থাকিতে পারেন না বেশীক্ষণ। চিরচঞ্চল—চিরমলিন জীব বুদ্ধিময় ক্ষেত্রের সে বিশালতা সে নির্ম্মলতা, সেই উদাসীনভাব, বজ্রবৎ কঠোরতা, সেই পর্ব্বতবৎস্থিরতা অধিকক্ষণ পারেননা সহ্য করিতে; আবারজাগে দেহাদিবিষয়ক স্মৃতি।

কথান্তরে কৃপাময় শ্রীভগবান্‌ই কৃপাপূর্ব্বক এইরূপে একবার নীচের দিকে একবার উপরের দিকে গমনাগমন করাইয়া, সাধকের প্রাণের সঙ্কীর্ণতা দূর করেন এবং ক্রমে ক্রমে সাধকের বলবৃদ্ধি করিয়া, বিশালতার দিকে অগ্রসর হওয়ার দেন সুযোগ। ৺করুণাময়ের কৃপায় অকপট সাধক সাক্ষাৎ পায় প্রথমেই দু'টী মূল সংস্কারের—(১) অহংবোধাত্মক আনন্দ, ও (২) বহুভাবেচ্ছা; বহুভাবেচ্ছামূলক আনন্দটী কিন্তু সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মার স্বরূপানন্দ হইতে ভিন্ন প্রকার। নিঃসন্দেহে দারুণ দুরপনেয় এই সংস্কারদ্বয়; যেহেতু "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-রূপ ৺পরমেশ্বরের তথা ৺ইচ্ছাময়ের আদি "একোঽহম্ বহুস্যাম"—এই ইচ্ছাই পরমেশ্বর-ভাবের; সুতরাং অমোঘ সে সংস্কার "বহু হইব, বহুভাবের আনন্দ উপভোগ করিব"। মৌলিক সংস্কারবশে জীব অনন্তকালব্যাপী জন্মমৃত্যুর খরস্রোতে ছুটিয়া চলিতেছে, সেই আদি-সংস্কার—সেই বহুত্বমূলক আনন্দ ও বহুভাবেচ্ছা প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি দ্বারা স্থূল বা পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়াই বহুত্ব হইতে হয় বিমুক্ত। তখন সাধক বুঝিতে পারে:—(১) স্ত্রী পুত্রাদি, দেহাদি সকলই ৺ইচ্ছাময়ের কল্পনামাত্র; (২) তাই দূরীভূত হ'য়ে যায় ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষাও। ইহাই আগামী বা ভবিষ্যৎ কর্ম্মফল নাশ; কর্ম্মফলনাশ বিষয়ে গীতা বলেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে"; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন—জ্ঞানলাভ হইলে আগামী ও সঞ্চিতকর্ম্ম নাশ হয়; কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না জ্ঞানলাভে। সেইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে, বর্ত্তমানে যে কর্ম্ম ভবিষ্যৎকর্ম্মের বীজস্বরূপ হইতেছে অথবা যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই এখনও, পরন্তু রহিয়াছে সঞ্চিত, সেই উভয়বিধ কর্ম্মই বিনষ্ট হইতে পারে! কিন্তু যে কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ আরম্ভ হ'য়েছে, তাহার সম্যক্ ভোগ না-হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নাশ হয় না। শাস্ত্র বলেন, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" অর্থাৎ অভুক্ত কর্ম্ম কোটিকল্প কালেও হয় না বিনষ্ট। তাই মনে হয় গীতার কথায়

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে"—এই অনুসারে যথার্থ জ্ঞান লাভে সর্ব্বকর্ম্ম নিশ্চয়ই হয় বিনষ্ট। জ্ঞান যতটা উজ্জ্বল হইলে—জ্ঞানের যে অবস্থায় পৌঁছিলে, সাধকের প্রারব্ধকর্ম্মফলরূপ এই স্থূল দেহটী পর্য্যন্তের ও বিলয় হইয়া যায়, জ্ঞানের সেই উন্নত স্তরে উপস্থিত হইতে পারিলে যথার্থই সর্ব্ব-কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া যায়। জ্ঞান যতটুকু উজ্জ্বল হইলে আগামী ও সঞ্চিত কর্ম্মমাত্র ক্ষয় পায়, সাধক দৃঢ় অধ্যবসায়-বলে ততটুকু পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যাহাতে প্রারব্ধ পর্য্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তত উজ্জ্বল জ্ঞানলাভ করা অতিদুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা বারংবার সমাধিস্থ হইয়া, আবার দেহাত্মবোধে বুত্থিত হন, বুঝিতে হইবে—তাঁহারা জ্ঞানের সেই উজ্জ্বলতম ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারেন নাই। কাজেই থাকিয়া যায় তাঁদের প্রারব্ধ-ভোগ ক্ষেত্ররূপ দেহটা; দেহাভিমান বিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক চিন্তাস্রোত। জ্ঞানের উন্মেষ হ'লেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি শিথিল হয় আসক্তির মূল; অথচ বহুজন্ম সঞ্চিত সেই অনুরাগ দূরীভূত হয় না একেবারে। তাই, উদাসীন বুদ্ধি-জ্যোতিতে থাকিয়াও প্রকাশ পায় বৈধকর্ম্মবিষয়ক চিত্ত-চাঞ্চল্য; কিন্তু সাধকের এমন একটী দিন আসিয়া যায়—যেদিন সমাধিস্থ হইয়া আর দেহাত্মবোধে করেন না প্রত্যাবর্ত্তন; "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"; ইহাই জ্ঞানের উজ্জ্বলতম স্বরূপ এবং জ্ঞানের এই অবস্থায় আসিলে যথার্থ সম্যক্ জ্ঞান অধিগত হয়। ঐ কর্ম্মকাণ্ডের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বাক্য সমূহ—ঐ আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মই সাধকের আত্মলাভের প্রবল এবং চরম বিঘ্ন বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সাধকের অধর্ম্মগতি রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মপথে আনয়ন পক্ষে, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের ন্যায় বৈধকর্ম্মাদিই হয় প্রধান সহায়। অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাঁহার কর্ম্মকাণ্ডাদির সম্যক অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে তাঁহার পক্ষে বৈধকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও আত্মলাভ সম্ভব হ'তে পারে। আগে ধর্ম্ম পরে আত্মানুসন্ধান; তাই ধর্ম্মসংস্কারকে

মুক্তির সোপান বলা যায়। অধর্ম্মসংস্কার দূর করা তত কষ্টসাধ্য নহে যত কষ্ট শাস্ত্রবিধির সংস্কার গুলির নাশ; মদ্যপায়ীর মদ্যপানজনিত সংস্কার যত শীঘ্র দূরীভূত হয়, একজন ত্রিসন্ধ্যাকারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদির সংস্কার দূরীভূত করা তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর। বৈধকর্ম্মের সংস্কার আত্মলাভেচ্ছু সাধককে বড়ই উৎপীড়িত করে; উহার অনুষ্ঠান করিয়াও যথার্থ আনন্দ পায় না অথচ ছাড়িতেও পারে না। শাস্ত্র বলেন, "স্বল্প প্রতিপক্ষাঃ স্থূলা বৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষাঃ"। আবার ব্যবহারিক সংসারক্ষেত্রেও দেখা যায় পুনঃ পুনঃ পুরুষকারের নিষ্ফলতা দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ আশাভঙ্গ ও অচিন্তিত ঘটনার উৎপীড়নে উৎপীড়িত, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া মানুষ হয় **ভগবৎমুখী**; দুস্ত্যজ্য সংসার-সংস্কারশ্রেণীর উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণের জন্য চেষ্টা করিয়াও যখন আত্মসংস্থ হ'তে পারে না তখন সে হতাশে অবসাদে ঘোষণা করেন **"ভগবৎ-লাভ"** অতি দুরূহ। তাহার জন্য শাস্ত্রের উপদেশ—ভগবৎমুখী সাধকের নানাবিধ বাধাবিঘ্নের কারণঃ—(১) ভগবানের পরীক্ষা; কতটা প্রাণ দিয়া সাধক ভগবান্‌কে চায়; (২) কর্ম্মফল-ভোগ; তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কার গুলি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে এবং যে সকল সংস্কার-নাশের জন্য সাধককে বহুজন্ম স্বীকার করিতে হইত, শ্রীভগবান্ দয়া করিয়া সেই সংস্কারগুলি দুই এক জন্মেই করেন নাশ। তাই অনেক-জন্মবিনাশ্য কর্ম্মসংস্কারগুলি একেবারে ফলোন্মুখ হয়। লক্ষ জীবনের কর্ম্মফল একজীবনে ভোগ করিতে গেলে যুগপৎ বহু বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতেই হইবে। শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিলে অর্থাৎ তাঁহার স্নেহ-কৃপা-করুণা অনুভব করিলে জন্মস্রোত হ্রাস বা বন্ধ হ'য়ে যায়। ইহাই সাধকের প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ।

পরমাত্মামুখী সাধক প্রথমে মনে করেন সংসারসংস্কারই বন্ধনের কারণ; পরে ক্রমশঃ চৈতন্যোদয়ে শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি উপলব্ধি

করেন—আপন অন্তরের সূক্ষ্ম সংস্কাররাশিই যথার্থ বন্ধন এবং সংসার-সংস্কার গুলি মাত্র স্থূল কারণ; সংসার আপন অন্তরেই অবস্থিত; যতই নির্জ্জনে থাকা যাউক না কেন, কিছুতেই ছাড়ে না সংসারসংস্কাররাশি। সাধক যখন এইরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া সংসার চিন্তার মূল উৎপাটনে হ'ন যত্নবান্, তখন জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে শ্রীভগবানের কৃপায় সাধকেরই অন্তঃস্থিত সুপ্তপ্রায় প্রাণশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া **আগামী** কর্ম্মের বীজরূপী বিঘ্নদ্বয়কে—(অহংবোধাত্মক আনন্দ ও বহুভাবেচ্ছা মূলক আনন্দ) নাশ করে। এইরূপে সংসারবৃক্ষের একটী মূল (বাহ্যমূল) হয় উৎপাটিত। কিন্তু অপর দু'টী মূল আরও গভীরভাবে প্রোথিত থাকায়, উহা সহসা হয় না উন্মূলিত।

আগামী বা ভবিষ্যৎ কর্ম্মসংস্কারবীজ বিধ্বস্ত হ'লেও, সাধকের নাই স্বস্তি; তাই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার ফলে বুঝিতে পারে যে এখনও নাশ হয় নাই তাঁর সঞ্চিত কর্ম্মগুলি। উহারা যে বহুত্ব বিষয়ক ফল ফলাবে, তাহার কোন প্রতীকারই করা হয় নাই। ভবিষ্যৎ কর্ম্মবীজ নাশে সাধকের হৃদয়ে নূতন আর কিছুর জন্য বা নূতন বিষয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটী বা নূতন আশার আলোয় মত্ত হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত নাই-বা হ'তে হ'লো সাধককে; কিন্তু **অতীতে** তিনি যে বহুত্ব চেয়ে এসেছেন, বহুদিন বহুজন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যে অগণিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রে এসেছেন হৃদয়ে, তাহারা যে পুঞ্জীভূত বহুত্বের সংস্কাররূপে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আছে এখনও অক্ষুণ্ণভাবে স্বাধিকার বিস্তার করিয়া **সঞ্চিত** সংস্কার-রাশিরূপে। উহাদিগকে নাশ না করিলে সাধকের নিরবচ্ছিন্ন ভূমানন্দের নাই আশা। বহুজন্মব্যাপী নানাবিধ বৈধকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে, কিংবা যোগতপস্যাদির সাহায্যে, অথবা জ্ঞানভক্তির অনুশীলনে **সঞ্চয়** করে জীব পরমাত্মবিষয়ক **সংস্কারসমূহ**। জীবের মনঃ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়সমূহের যে পরমাত্মাভিমুখী গতি বা মিলনপ্রয়াস উহাই দেবশক্তি

বা দেবতা—সুর ; আর, উক্ত মনঃ-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির যে বিষয়াভিমুখী লালসা উহারাই অসুর—সুরবিরোধী বা অ—সুর। সূক্ষ্মসংস্কারের স্বরূপ কামনা-বাসনা-লালসা।

বেদান্তের কথায়, "পূর্ব্বোত্তরয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ। প্রারব্ধস্য তু ভোগাদেব ক্ষয়ঃ"। অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হইলে, পূর্ব্ব অর্থাৎ অতীতে সঞ্চিতকর্ম্মের হয় অশ্লেষ (=ফলসংযোগের অভাব); উত্তর অর্থাৎ ভবিষ্যৎকর্ম্মের হয় বিনাশ। বাকী প্রারব্ধের হয় ক্ষয় ভোগের দ্বারা।

পূর্ব্বকর্ম্মের অশ্লেষই কামনা-বাসনা-লালসাদির নাশ। আগেই স্থির হ'য়েছে "আর নূতন কিছু চাই না" ; "অতীতে যাহা চাহিয়াছি, তাহারও ফলভোগ করিব না"—ইহা এখন হয় স্থির। প্রারব্ধ তো নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল বীজ পুঞ্জীভূত হইয়াছে এখনও ফলোন্মুখ হয় নাই, তাহার ফলপ্রদান-ক্ষমতা বিনষ্ট করা খুব কঠিন। সঞ্চিত সংস্কারসমূহই সাধকরূপ ব্যষ্টিপ্রাণকে প্রকাশিত হইতে দেয় না মহাপ্রাণে। সাধকের বহুজন্মার্জ্জিত বাসনারাশিকে ধরিয়া রাখেন স্থিতিশক্তি বিষ্ণু ; প্রত্যেক জীবেই এই বিষ্ণুসত্তা বিদ্যমান ; আর যিনি এই বিরাটব্রহ্মাণ্ডে অনাদি সঙ্কল্পকে ধরিয়া রাখিয়াছেন তিনি লীলাময় মহাবিষ্ণু।

পূর্ব্বকথিত সংস্কারগুলি স্থূলভাবে নাশ হইলে জগতের যাবতীয় অত্যাচার যে উপশান্ত হয় তাহা সুবিদিত। আব সূক্ষ্মসংস্কার যে কামনা-বাসনাগুলি, তাদের বৃদ্ধির অবসর না দিয়ে নাশ করা যায় তাহ'লে জীব যথার্থ শান্তির সন্ধান পায়। কারণ, ব নার চরিতার্থতায় যে সুখলাভ হয়, কামনার উদ্বেলনশূন্যতা প্রদান করে তদপেক্ষা বহুশত-গুণে অধিক সুখ। বিক্ষুব্ধ চিত্তে বিষয়ভোগ করিয়া যে সুখ হয়, প্রশান্তচিত্তে বিষয়ভোগের অনভিলাষে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ মিলে। অতএব জগৎকে যথার্থ সুখী যদি করিতে হয়, তবে নিশ্চয়ই বাসনারাশিরূপ সংস্কারের অকপটে নাশ করিতেই হইবে। এইরূপে

বিশ্বময় মহাপ্রাণে—মহাবিষ্ণুর কর্ত্তৃত্ব দর্শনে সাধকের জীব-কর্ত্তৃত্ববোধ অস্তমিতপ্রায়; সাধক এখন সর্ব্ববিধ সংসারচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু এখনও প্রক্ষীণ হয় নাই প্রবল প্রারব্ধ সংস্কারসমূহ। কি যেন এক অজ্ঞেয় মহতী শক্তির প্রবল অনুপ্রেরণায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হইয়া পড়ে কর্ম্মের আরম্ভ; সাধক বেশ জানেন যে "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ", তথাপি কর্ত্তৃত্ববোধ ক্ষণেকের তরে আসিয়া উপস্থিত হয় ও সমস্ত জ্ঞানকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাঁর প্রভুকে পাওয়া-না-পাওয়া বা জানা-না-জানার ধাঁধায় পড়েন সাধক; কারণ, সাধক চান ব্রহ্ম হ'তে, সুতরাং যতদিন তিনি পুনঃরায় ব্রহ্মত্বে পৌঁছাতে না পারিবেন, ততদিন তাঁর এ-অতৃপ্তি দূর হতেই পারে না। অতৃপ্তিই তো মহাপ্রাণের গতিমূর্ত্তি। মহাপ্রাণ—মহতী চিতিশক্তি বা চৈতন্যসত্তা ঐ গতিমূর্ত্তিতে প্রতি জীবহৃদয়ে নিত্য বিরাজ করেন বলিয়াই তো মানুষ দিনের পর দিন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মহাপ্রাণের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে। এই অতৃপ্তিপ্রভাবেই ভবিষ্যৎ ও সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হইলেও, দুরপনেয় **প্রারব্ধ**-সংস্কার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই হ'তে পারে না স্থির। প্রারব্ধটা যে দুঃখ নয়, উহা যে আনন্দেরই লীলা-বিলাসমাত্র, ইহার সম্যক্ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্তই প্রারব্ধ সংস্কারগুলি দুঃখদায়ক বলিয়া বোধ হয় মাত্র।

যেকর্ম্মের ফল এই শরীরে ভোগ করিতে হইবে অর্থাৎ যেকর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ ক'রেছে—তাহা প্রারব্ধ। মানুষ যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ভোগ করে অথবা জীবনকালেই মুহর্মুহু ভাবচাঞ্চল্য বোধ করে, উহা অব্যক্তবীজেরই (কর্ম্মসংস্কারের) ব্যক্ত ভাবমাত্র।

শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের কথায়, "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"-তে মনে হয় **স্থূল** সংস্কারগুলির প্রলয়ের কথা সূচিত হ'চ্ছে আর **সূক্ষ্ম** সংস্কার সমূহ যেমন (১) **ভবিষ্য**তেরতমোগুণের অহংবোধাত্মক আনন্দ-

সংস্কার ও বহুভাবেচ্ছামূলক আনন্দসংস্কার; (২) সুদূর অতীতের সঞ্চিত রজোগুণের দেবাসুর সম্পদ্‌রূপ অসংখ্য কামনা-বাসনারূপ সংস্কাররাশি; ইহাদের নাশের কথা যথাসম্ভব বলা হ'য়েছে এই প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই। এখন কিছু বলা যায় **বর্ত্তমানের** প্রারব্ধ সংস্কার নাশের কথা; ইহাই কারণ-শরীরগত সূক্ষ্মতম বীজরূপ সংস্কারসমূহ। সাধকগণ যেমন স্তরে স্তরে জ্ঞানের উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, সংস্কারগুলিরও ঠিক তেমনি স্তরে স্তরে ভেদ হয়। জ্ঞানের এই সকল উচ্চস্তরে উন্নত হবারপক্ষে শ্রীভগবানের চরণে একমাত্রশরণাগতিভাবই সহজ ও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা। সাধক যে পরিমাণে ভগবানের শরণে অর্থাৎ আশ্রয়ে আসিতে থাকে সেই পরিমাণেই হইতে থাকে জ্ঞানের বিকাশ; শরণাগতভাবের পূর্ণতা আত্মজ্ঞানে; যখন আর "আমি" বলিতে কেহ থাকে না, অথচ একমাত্র আমিই থাকে তখনই পূর্ণ হয় শরণাগতভাব! আবার একমাত্র আস্তিক্যবুদ্ধিই এই শরণাগত হওয়ার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। মানুষ যেপরিমাণে ভগবৎ সত্তায় বিশ্বাসবান্ অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইতে থাকে, শরণাগত ভাবটীও সেই পরিমাণে হয় বর্দ্ধিত। অনাত্মসংস্কারসমূহকে (=ভেদজ্ঞানের বীজগুলিকে) নাশ করিতে মহাপ্রাণ-চিতিশক্তি ভীষণ ভয়প্রদা প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হওয়ায় জীবের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে তাঁর আচরণ নিষ্ঠুর প্রতীয়মান হ'লেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁর ঐ আচরণ পরমকল্যাণকর—সংস্কারাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে উহা "শাপে বর"। সুতরাং সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত করিবেন সাধক স্থিরবুদ্ধিতে যে তাঁর দুর্ভোগরূপ প্রারব্ধটীর পশ্চাতে আছে আনন্দের লীলা এবং তিনি অবশ্য উপলব্ধি করিতে অভ্যাস করিবেন যে একমাত্র অখণ্ড আনন্দসত্তা ব্যতীত আর কোথাও কিছু নাই এবং একই আনন্দ ত্রিবিধ স্পন্দনে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে—ত্রিপুটী আনন্দ = আনন্দ + আনন্দের অনুভব + আনন্দের অনুভবকর্ত্তা; তাহ'লেই সম্যক্ অপনীত হবে তাঁর ভেদজ্ঞান; এবং

ভেদজ্ঞান গেলেই জীবের ঘৃণা-সংস্কার চিরতরে হবে বিলুপ্ত। প্রারব্ধ-সংস্কারের মধ্যে অষ্টপাশের (ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-শঙ্কা-জুগুপ্সা-কুলং-শীলং-জাতি) সংস্কার অতি প্রবলভাবে থাকে। সঞ্চিত ও আগামী সংস্কারের মধ্যে ইহারা যে থাকে না, তাহা নহে, তবে ইতিপূর্ব্বেই ভগবৎকৃপায় তাহাদের অশ্লেষ ও বিনাশ হ'য়েছে। বিশুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানে উপনীত হওয়ার পক্ষে প্রবলপ্রারব্ধই বিশেষ বিঘ্ন। তাই মহাপ্রাণশক্তি ইহাদিগকে নানারূপে যথা, কতকগুলিকে ভোগের ভিতর দিয়া, কতক-গুলিকে সংযমের ভিতর দিয়া, কতকগুলিকে স্বপ্নের ভিতর দিয়া করেন বিনাশ। একবার অদ্বয়তত্ত্ব বোধগম্য হইলে সাধকের ভেদভ্রান্তি বন্ধনভয় মৃত্যুভয় চিরতরে যায় ঘুচে; তারপর যতদিন স্থূলদেহ থাকে, ততদিন সাধক মাত্র প্রারব্ধ সংস্কারক্ষয়ের অপেক্ষা করে এবং প্রারব্ধক্ষয়ে কলেবর-কৈবল্য-লাভ করে। প্রবল প্রারব্ধসংস্কার থাকিতে যথার্থ অদ্বৈততত্ত্ব হয় না উদ্ভাসিত। প্রারব্ধ সংস্কারের মধ্যে যেগুলি আত্ম-জ্ঞানলাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় তাহারাই প্রবল প্রারব্ধ। এই প্রবল প্রারব্ধ নাশ হ'লেই আত্মজ্ঞান হয় উদ্ভাসিত। বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, অনাত্মা বলিয়া কোথাও কিছু নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না।

প্রারব্ধক্ষয়ের কৌশল—ঐ প্রতিকূল প্রারব্ধসংস্কার নাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে ধীরভাবে, অধীর হইলে আরও বিলম্ব হইবে। একমাত্র ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কাতরপ্রাণে অকপটে কাঁদিতে হইবে। ইহার ক্ষয় হয় ভোগে সংযমে ও স্বপ্নে।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টপাশই (ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-শঙ্কা-জুগুপ্সা-কুলং-শীলং-জাতি) জীবত্বের সুদৃঢ় বন্ধন; এ গুলিকে নাশ করিতে বাহ্য উপায় অবলম্বন—প্রতিকূল কার্য্যাদির অনুষ্ঠান প্রচেষ্টায় আবার কতকগুলি নূতন সংস্কার হয় সঞ্চিত। অবশ্যই জানা চাই—বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই জ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র, যতক্ষণ বিমল-বিশুদ্ধবোধের উদয় না হয়

ততক্ষণ কিছুতেই সমূলে ছিন্ন হয় না অজ্ঞানমূলক অষ্টপাশ বা অষ্টবন্ধন। গীতার কথায়, ২।৫৯ শ্লোকের মর্ম্ম—বিষয়গ্রহণে অসমর্থ আতুর বা বিষয়ভোগবিমুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হন বটে ; কিন্তু তদ্‌বিষয়ক রস বা অনুরাগ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সংস্কারটী থাকিয়া যায়। আর আত্মদর্শন ঘটিলে ভেদজ্ঞানমূলক বিষয়রস বা সূক্ষ্মসংস্কার সম্যক্ হয় নাশ। আত্মজ্ঞানে আসে আত্মসমর্পণ ও বন্ধনমোচন।

নির্গুণ নিরঞ্জন আত্মাকে ভাবরঞ্জনাময় অবস্থায় আসিতে হইলেই তাঁহাকে সহায়তা লইতে হয় শক্তির ; এই শক্তি আবার আত্মা হইতেই সমুদ্ভূতা হইয়া আত্মার আশ্রয়েই পায় প্রকাশ—ইহাই সুবিদিত হইয়া আত্মজ্ঞ পুরুষ হ'ন নিরহঙ্কার অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞ পুরুষের তথাকথিত স্বকীয় মিথ্যা "অহংটী" (=প্রতিবিম্ব অহংটী) হয় অস্তমিত ; আত্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্ সর্ব্বতোভাবে হ'ন অহঙ্কারশূন্য। আত্মজ্ঞ না হইলে কিছুতেই যায় না অহঙ্কার ; অহঙ্কার দূর করার জন্য অবশ্য সাধক আপনাকে অতীবদীন-হীন-পতিতবলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না ; কারণ, ঐ রূপ মনোভাবের ভিতরও থাকে অহঙ্কার। যথার্থ "অহং" যে আত্মা তাঁকেই দেখিতে অভ্যাস করিলে মিথ্যা অহংটী (=অভিমান) আপনিই পলায়নপর হইবে।

বহুদিনের বহুজন্মের সাধকের সাধের সংস্কার—"কালীকে" "মা" বলিয়া ফেলা ; কালী মূর্ত্তি দেখিলেই পাছে তাহার বড়-সাধের পুত্রত্বটী পর্য্যন্ত হ'য়ে যায় বিলুপ্ত, তাই ভয়ে ভয়ে "ম"-ব'লে ফেলে, বুঝিতে হবে সাধকের ইহাও দ্বৈতপ্রতীতি সংস্কার। সাধকের চরম লক্ষ্য যে অদ্বৈত অবাঙ্‌মনসোগোচর পরমাত্মক্ষেত্রে পৌঁছানো ; সুতরাং তাহার অদ্বৈত সাধনায় মাতাপুত্র সম্বন্ধ বিহীন হ'তে হবে! প্রলয়ঙ্করী "কালীকে" "মা"-বলা ছাড়্‌তে হবে! সূত্রপাতে অবশ্য "মা"-বলিয়া শ্যামাপূজা কবিতে হইবে এবং শেষে "জয়-কালি" বলিয়া পূজা শেষ করিয়া সোঽহং-ভাবে ভাবিত হ'তে হবে। দ্বৈতজ্ঞানই প্রবৃত্তি সংস্কারের

হেতু ; অদ্বৈতজ্ঞান দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হ'লে ছুটে যায় প্রবৃত্তিসংস্কার। জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয়—(১) অতীতের বহুজন্ম সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্ম ; (২) ইহ-জন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃত সমস্তকর্ম্ম ; (৩) সজ্ঞানে ভাবী সমস্ত কর্ম্ম। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট না হইয়া ক্ষয় হয় ভোগে, সংযমে ও স্বপ্নে। যে কর্ম্মের ফল এই শরীরে ভোগ করিতে হইবে অর্থাৎ যে কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম।

কারণতত্ত্বে সংস্কারনাশ কথায় বলা যায় যে স্থূল সূক্ষ্ম সংস্কারের মত শীঘ্র নষ্ট হয় না কারণসংস্কার। কারণসংস্কার উপলব্ধি করিতে সাধকের একটু বেশী সময় আবশ্যক হয়, যেহেতু বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে বিনষ্ট-অবিদ্যায় কার্য্য সমূহ পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ কিছুদিন কিছুকাল করে অনুবর্ত্তন ; যেমন (১) রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হ'লেও পূর্ব্বলব্ধ ভীতি-জনিত হৃৎকম্পাদি কিছুক্ষণ থাকে, (২) কুলালচক্রের ভ্রমী বন্ধ করিয়া দিলেও পূর্ব্ববেগ বশতঃ কিছুকাল সেই ভ্রমীটা থেকে যায়।

পূর্ব্বসঞ্চিত ভেদজ্ঞানমূলক দুরপনেয় সংস্কারের সূক্ষ্মতম প্রকাশ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় নাস্তিকের ভিতরে যখন সে আস্তিক্যবুদ্ধির বিরুদ্ধে বারবার করে বিরোধিতা অথবা কুতর্ক। অন্তরে অন্তরে আস্তিক হ'লেও, [যেহেতু সে বেশ বোঝে যে আস্তিক্য বুদ্ধিতে আছে শান্তি, কিন্তু নাস্তিকতায় নাই শান্তি], কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে চায় না। তাহার বহু জন্মসঞ্চিত অভ্যাস বা সংস্কার বশতঃ স্বকীয় সেই বিশিষ্টতাটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাই তাহার অন্তরের আস্তিক্যতা পরিণত হয় বাহ্যিক নাস্তিকতা রূপে।

সংস্কারনাশের উপায় (?)—শঙ্করাচার্য্যের কথায়, "অমৃতম্ কর্ম্মফলম্"। মুক্ত পুরুষের নিকট হইতে সংস্কার (=বেদান্তের মায়া বা সাংখ্যের প্রকৃতি) সরিয়া দাঁড়ায় মাত্র ; উহা হয় না সর্ব্বথা ধ্বংস বা অপচয়। উহা প্রবাহরূপে নিত্য।

জ্ঞানের উন্মেষ হ'লেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি আসক্তির মূল শিথিল

হয়বটে, কিন্তু বহুজন্মসঞ্চিত সেই অনুরাগ (= সংস্কার) একেবারে যায় না।

শরীরস্থ যে সকল স্থূল যন্ত্রাদির সাহায্যে আসুরিক সংস্কারসমূহ উদ্বুদ্ধ হইয়া চিত্তের স্বভাবকে করে বিধ্বস্ত তাহাই আসুরিক শক্তির পরিচালক; আসুরিক শক্তি গেছে অথচ শক্তির স্থূল কার্য্য অবশিষ্ট থাকিলে প্রশান্ত হয় না চিত্তক্ষেত্র, তাই সাধক চিত্তের গভীর তলদেশে গিয়াও খুঁজে পান না সিদ্ধি; উদাহরণে বলা যায়, যেমন—বহুদিনের ক্ষতঘা সেরে গেলেও তাহার দাগ (ক্ষতচিহ্ন) সহসা মিলায় না, তেমন চিত্তের চাঞ্চল্য গেলেও সংস্কারের অবশেষটুকু যায় না একেবারে। গীতা ৪।৩৭ বলেন জ্ঞানাগ্নি যাবতীয় কর্ম্মসংস্কারকে করে ভস্ম; যদিও ব্রহ্মজ্ঞানই সর্ব্বকর্ম্মের নাশক, তথাপি কেবল বিচারের সাহায্যে জগৎ-সংস্কারকে মিথ্যা বলিয়া কখনও আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না; বিচারের সাহায্যে যাহা লাভ হয় তাহা জ্ঞানের আভাসমাত্র। জ্ঞান মানে জানা, অনুভব করা; শ্রবণ-বা-অধ্যয়নজ জ্ঞানে কর্ম্মসংস্কার নাশ হয় না। কর্ম্মসংস্কার অবিদ্যা—উহাকে মিথ্যা বলিয়া চক্ষু বুঝিলে মৃত্যুভয়সংস্কার যাবে না। কর্ম্মসংস্কার রহিয়াছে—বহুত্বের উপলব্ধি হচ্ছে, অথচ মুখে সহস্রবার মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া আর একটী নূতন সংস্কার গঠন করা হয় এবং পুরাণোসংস্কারটী মৃত্যুভয়সংস্কারটাও কখনও যায় না। তাই উপায় এ ক্ষেত্রে সব কর্ম্মকেই করিতে হইবে ব্রহ্মময় অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে হইবে "ব্রহ্মার্পণ" ও "মদর্পণ" বুদ্ধিতে।

আবার, পার্থিব ভাবগুলি বহুদিন হইতে সাধকের চিত্তে যে ঘন-স্থূল-সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে, উহা নাশ করিতে হইলে, পুনঃ পুনঃ ভাবগুলিকে **বোধময় সত্তায়** লইয়া যাইতে হইবে। যাহাকেই দেখা যায় যেমন জল-মাটী বৃক্ষ-পর্ব্বত-জীব-জন্তু অতি স্থূল জড়পদার্থ-রূপে, উহাদেরই বাস্তব সত্তা যে **বোধ** বা-চৈতন্য বা প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে—(অভ্যাস সহায়তায়) এইরূপ উপলব্ধিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। "যথার্থই এ-জগতে ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য কিছুই নাই"—এরূপ

দৃঢ়জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টাতেই সংস্কারনাশের কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা।

সংস্কারনাশের আরও কতকগুলি উপায় মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় এই প্রসঙ্গে যথা :—(১) অজপা অর্থাৎ "হংস"-মন্ত্র জপরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ-গ্রহণ : (২) আত্মসমর্পণান্তে মন্ত্রচৈতন্য করিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ ; (৩) ত্রিপুটী জ্ঞান সহায়তায় ত্যাগ-গ্রহণাত্মক বিচার ; (৪) উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তনাদি ; (৫) সংস্কারসমূহ যে মহতী চিতিশক্তিরই বিশেষ বিশেষ স্ফুরণমাত্র—ইহা পুনঃ পুনঃ ধারণা করা ; (৬) কুসংস্কার গুলিকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ মন্ত্রশর "ওঁ" প্রয়োগ ["প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"] (৭) কখনও কখনও সাধকের চিত্তে নাই আসক্তি, নাই কোন অনুষ্ঠান, তথাপি তাঁর চিত্তক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠে আসুরিক সংস্কার অর্থাৎ জপকালে অন্তরে নানা-রূপ বৈষয়িক ব্যর্থ সংস্কার ফুটেছে এমন সময় প্রণবাদি মন্ত্রজপ ও কাতর প্রার্থনা ইষ্ট দেবতার নিকট ; এবং জেনে রাখা চাই ঐ গুলো ভগবানেরই ছদ্মবেশে লীলামাত্র ; ও গুলোকে মিথ্যাচার মনে করিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। গীতায় উপদিষ্ট "মিথ্যাচার" মনে করিয়া সুধী সাধক নিজের দুর্ব্বলতা ভাবিয়া আপন আত্মাকে করিবেন না অবসাদ গ্রস্ত ; অবশ্যই তিনি জেনে রাখবেন যে, এরূপ মিথ্যাচার করিয়াই উপনীত হ'তে হয় সত্যাচারে ; (৮) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযমে সংস্কার সমূহের প্রবুদ্ধভাবমাত্র হয় তিরস্কৃত, দৈবাৎ সংযমের একটু শিথিলতা আসিলেই আসুরিক অত্যাচার আবার হয় আরম্ভ ; সুতরাং ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধি:তে পরমাত্মচরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন চাই ; পরমাত্মাকে দেখিলেই বিষয়ানুরাগ সম্যক্ হয় নিবৃত্ত। (৯) দগ্ধবীজবৎ সংস্কার আসুরিক সংস্কার সমূহও সাধকের আত্মসাক্ষাৎকারে, হইয়া উঠে আত্মময় ; তখন বহুত্বের ছাঁচগুলি থাকিলেও সাধকের থাকে না আর ভেদজ্ঞান ; একই আত্মা বা সচ্চিদানন্দ বস্তু, সংস্কারের ছাঁচে পড়িয়াই যে বিভিন্ন নামরূপ প্রকাশ পাইতেছে ইহা সাধক অবশ্য

উপলব্ধি করেন। এখানে স্মর্ত্তব্য চিনির পুতুলাদির কথা; চিনি জ্ঞান হইলে চিনির হাতী-ঘোড়া-মঠাদি সবই যে চিনিমাত্র। তখন বিভিন্ন নামরূপের ভেদজ্ঞান হইলেও উহার যথার্থ স্বরূপ যে চিনি তাহা বোঝা যায়। ভেদজ্ঞান পরিপুষ্ট থাকে বলিয়াই ত্যাগ ও গ্রহণ থাকে; ভেদজ্ঞান গেলে তখন আর ত্যাগ-গ্রহণ থাকে না। এইরূপে আত্ম-দর্শনে অভ্যস্ত হইলে সঞ্চিত সংস্কারসমূহ হ'য়ে পড়ে দগ্ধবীজবৎ অর্থাৎ উহারা আর কখনও কর্ম্ম ও ফলভোগের হেতু হইবে না। এইরূপে সঞ্চিত সংস্কার গুলির ফলভোগ না করিয়াই সাধক লাভ করেন মুক্তি।

আরও, সংস্কারনাশের অন্যতম উপায় যে নিরোধ, তাহাও একটী সংস্কার। কোন বিশেষ সংস্কারের ব্যুত্থানের ক্রমশঃ হ্রাস, এবং নিরোধ-সংস্কারের বৃদ্ধিতে পরিশেষে সংস্কারনাশোন্মুখী সাধকের চিত্তে আসে প্রশান্তাবস্থা—প্রবৃত্তির হয় নিবৃত্তি (=পরিণামের নিরোধ)। নিরোধ-সংস্কারের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইলে উহাতে যখন জন্মে দক্ষতা, তখন ইচ্ছামাত্রেই সাধক নিরোধ করিতে পারেন; তখন চিত্ত হইতে ব্যুত্থানজনিত সমস্ত সংস্কার তিরোহিত হইয়া, নিরোধসংস্কারের পরম্পরারূপ প্রশান্তবাহিতা জন্মে। এই নিরোধসংস্কার যাবৎ সুদৃঢ় না হয়, যাবৎ উহা মন্দ ও ক্ষীণভাবে সঞ্চিত হয়, তাবৎ বলবৎ বুত্থান-সংস্কার দ্বারা উহা হয় অভিভূত।

আত্মার সংস্কারাত্মক চঞ্চলতাময় অবস্থাই মনঃ। সুতরাং মনের নাশই সংস্কার নাশ; অতীব দুরূহ ব্যাপার। ঋষি বাক্য:—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" (১)

"সংসারবীজং মন এব বিদ্ধি, ন পুত্রদারাদ্রবিণাদিকং হি।
সংসারনাশো মনসো লয়েন, ন তদ্‌গৃহস্থাশ্রমবর্জ্জনেন॥" (২)

"মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্" (৩)

সংস্কারনাশরূপ প্রশান্তবাহিতার জন্য আবশ্যক অভ্যাসকর্ম্ম; [এই অভ্যাসশব্দ নিষ্পন্ন—অভি (ভিতরে ভিতরে)+ক্ষেপণার্থে (to

throw) √অস + ঘঙ্‌, ভাববাচ্যে]। বুঝিতে অভ্যাস করিতে হইবে ও উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এই জগৎ—স্ত্রীপুত্রাদি—দেহ সবই মহতী চিতিশক্তিরূপ আত্মার কল্পনামাত্র এবং বিরাট্‌ মনের (=ব্রহ্মার) কল্পনাই বিশ্বরূপে প্রতিভাত ; মনঃ যে অজ্ঞানবশতঃ প্রতিনিয়ত সঙ্কল্প করে বহুত্বের ও তাহাতেই পায় আনন্দ সেই অজ্ঞান দূর করার **অভ্যাস** করিতে হইবে। যতদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি না হয়, ততদিন অবশ্য দেহাদি অনাত্মবস্তুর ভাণ হইবেই। প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইলে সাধক লাভ করেন বিদেহ-কৈবল্য, তখন আর অনাত্মবস্তুর ভাণও হয় না ; আত্মজ্ঞানলাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় প্রবল প্রারব্ধ। প্রবল প্রারব্ধ সংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লেই আত্মজ্ঞান লাভ হয় বটে কিন্তু বার বার **অভ্যাস** দ্বারা সংযম ও ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ হয় না ক্ষয়। বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, অনাত্মা বলিয়া কোথাও কিছু নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না। জগতের সত্ত্বা তিনকালেই সমান, এক অদ্বিতীয় আত্মা নিত্য বিরাজিত ও আত্মারিক্তি কেথাও কিছু নাই, যাহা চিন্মাত্রস্বরূপ তাহাতে **চেত্য** বলিয়া কিছু নাই বা থাকিতে পারে না, যাহা অনুভূতিমাত্রস্বরূপ তাহাতে **অনুভাব্য** বলিয়া কিছু নাই বা থাকিতে পারে না : বাস্তবিক পক্ষে এই পরমাত্ম-স্বরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কিছুই নাই ; পরমাত্মক্ষেত্র নিত্য স্বচ্ছ নিত্যনিরঞ্জন, নিত্যবিশুদ্ধ ; রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হয় বটে কিন্তু সেজন্য রজ্জুতে সর্প-বলিয়া কখনও কিছু থাকে না, রজ্জুর সর্পভাব যেমন কখনও নাই, ঠিক তেমন পরমাত্মার জগদ্‌ভাব নাই কখনও ; এইরূপ প্রতীতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করিয়া হৃদয়ে বসাতে হবে সংস্কারনাশেচ্ছুক সাধক মহাশয়কে।

তবে লীলাকৈবল্যবশতঃ পরমাত্মা (কেবল-আত্মা) যখন প্রসারিত হ'ন ব্যবহারিক আত্মারূপে তখনই, কেবল তখনই সর্ব্বময়-সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পুরুষের পুরুষকাররূপ সংস্কারাদির হয় আবির্ভাব ; কথান্তরে এই

সংস্কাররাশিই তাঁহার অনুভাবমাত্র; পুরুষকারের অহঙ্কারই ১ম্ সংস্কার। অতএব, তাঁর কৃপা ব্যতীত সংস্কার সমরে সাধক হ'তে পারেন না বিজয়ী—ইহাই স্মরণপথে রাখিয়া তাঁর শরণাগত হ'তে হবে অকপটে সাধককে :—নান্য পন্থা ॥—

অদ্বয়তত্ত্বে পৌঁছিলে বিলুপ্ত হয় সর্ব্বসংস্কারই; তাহা হইতে পুনরায় ব্যুত্থিত হইলে প্রকাশ পায় কতকগুলি জীবভাবীয় সংস্কার। যতদিন স্থূল দেহ থাকে, ততদিন উহারা থাকে বটে, কিন্তু কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না অর্থাৎ পুনরায় ভ্রান্তিজ্ঞান ঘটায় না; কারণ উহাদের পার্থিকত্ববুদ্ধি নষ্ট হয় একেবারেই। আর কতকগুলি সংস্কার থাকে যেমন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা-জ্ঞানদান-লোকশিক্ষা প্রভৃতি, তাহারা পরিচালিত হয় সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে ও শ্রীভগবানের ইচ্ছায়; তাঁর বিশিষ্ট প্রেরণা ব্যতীত সে সকলের বিশেষ কোনও কার্যকারিতা থাকে না, যেহেতু উহা সর্ব্বতোভাবে মহতী ইচ্ছারই করে অনুবর্ত্তন। একবার অদ্বয়তত্ত্বের সাক্ষাৎ পেলে সাধকের দূর হয় চিরতরে ভেদভ্রান্তি, বন্ধনভয় ও মৃত্যুভয়। তারপর যতদিন থাকে স্থূল দেহটা ততদিন সাধক মাত্র প্রারব্ধ সংস্কার ক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে থাকে, এবং প্রারব্ধ-ক্ষয়ে লাভ করে বিদেহকৈবল্য॥ প্রারব্ধসংস্কারের মধ্যে অষ্টপাশের সংস্কার থাকে অতি প্রবলভাবে; সঞ্চিত ও আগামী সংস্কার মধ্যে অষ্টপাশসংস্কারও থাকে তবে তাহাদের আগেই অশ্লেষ ও বিনাশ হ'য়ে গেছে। বিশুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানে পৌঁছানো পক্ষে প্রবল প্রারব্ধই বিশেষ অন্তরায়। কতক ভোগে, কতক সংযমে, কতক স্বপ্নে হয় নাশ। কোন সংস্কার কিভাবে নাশ হয় তাহা নিশ্চিত বলা অসম্ভব।

সংস্কারনাশের উপায়াদির উপসংহারে দেয়া যায় শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ যথা—জ্ঞানীর স্বদৃষ্টিতে জ্ঞানীর অখিল প্রারব্ধভোগের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন এবং সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ থাকিবার জন্য প্রযত্নপরায়ণ হইয়া প্রারব্ধজনিত প্রাপ্ত-সুখদুঃখ নিরুদ্বেগে ভোগ করিয়া জীবন-

যাপন। জ্ঞানীর প্রারব্ধ যুক্তিতঃ অসিদ্ধ; নিদ্রাভঙ্গে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগত-ব্যবহার এবং তজ্জনিত সুখদুঃখ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, ঠিক তেমনই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়াম্বিত মহামোহনিদ্রাভঙ্গে তদানীন্তন জগদ্ব্যবহার ও তজ্জনিত সুখদুঃখভোগ পর্য্যবসিত হয় মিথ্যাত্বে; সুতরাং প্রারব্ধভোগের থাকে না বাস্তবতা। জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলভোগ প্রারব্ধভোগ নামে হয় কথিত। মহামোহনিদ্রাভঙ্গে জন্মান্তরও পর্য্যবসিত হয় মিথ্যাত্বে; কাজেই জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলভোগ কথাও মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হইয়া হয় অর্থহীন। দেহাদি জগৎ ও জগদ্ব্যবহার মাত্র অধ্যস্ত হইয়াছিল আত্মাতে; যাহা অধ্যস্ত বা আরোপিত, তাহার জন্মই বা কী, মৃত্যুই বা কী? যাহা নাইই তাহা কি করিয়া বাস্তব সুখদুঃখভোগ দিতে পারে? অজ্ঞানোপহিতচৈতন্যই বিষয়-বিষয়ী এবং তদুভয়ের সম্বন্ধরূপ জগদ্ব্যবহারের অভিন্ন নিমিত্তো-পাদান কারণ।

চৈতন্য সদা একরূপ; অজ্ঞানকালে বা অজ্ঞাননিবৃত্তিকালে কোন ইতরবিশেষ হয় না চৈতন্যের। জীবজগৎ ও তদ্ব্যবহার এবং তজ্জনিত সুখদুঃখভোগ ত্রিকালে অসৎ হইয়াও অজ্ঞানবশতঃ প্রতিভাত হইতেছিল মাত্র। অজ্ঞান ধ্বংসে জীবজগৎ প্রতীতি, তদ্ব্যবহার প্রতীতি এবং তজ্জনিত সুখদুঃখভোগ প্রতীতির দৃঢ় মিথ্যাত্ববোধ জন্মে। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহই যখন পর্য্যবসিত মিথ্যাত্বে, বিশ্বজগৎ যখন পর্য্যবসিত মিথ্যাত্বে, সর্ব্বপ্রকার জগদ্ব্যবহার যখন পর্য্যবসিত মিথ্যাত্বে; তখন প্রারব্ধভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখভোগের বাস্তবত্ব বা সত্যত্ব কল্পনা করা বাতুলতা নয় কি?

সংস্কার বিভাগ

পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যে **বেদব্যাস** চিত্তসংস্কারকে ভাগ ক'রেছেন **দু'ভাগে**:—(১) জ্ঞানজ বা অনুভব-জন্য সংস্কার = স্মৃতির

কারণ; (২) অজ্ঞানজ সংস্কার যেমন অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ মরণত্রাস = ক্লেশের কারণ।

ধর্ম্মকর্ম্মরূপ সংস্কারই জাতি-আয়ু-ভোগরূপ বিপাকের কারণ; (১) স্মৃতি ও (২) ক্লেশ হেতু বাসনারূপ সংস্কার, এবং বিপাকহেতু ধর্ম্মা-ধর্ম্মরূপ সংস্কার—এই দ্বিবিধ সংস্কারই স্ব-স্ব কারণ দ্বারা পূর্ব্বজন্মে নিষ্পাদিত, চিত্তে বিদ্যমান, পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবনরূপ চিত্তধর্ম্মসমূহের ন্যায় অতীন্দ্রিয়; পরিণাম-চেষ্টাদি চিত্তধর্ম্ম সকল যেমন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, সেইরূপ বাসনারূপ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ চিত্তধর্ম্মসমূহও বিষয়ীভূত হয় না প্রত্যক্ষের। কণাদ বলেন সংস্কার হয় গুণপদার্থ: বৈশেষিকদর্শন সংস্কারকে ভাগ ক'রেছেন ৩ ভাগে, (১) "বেগ", (২) "স্থিতি-স্থাপক", (৩) "ভাবনা"। (১) "বেগ"-নামক সংস্কার আসে পৃথিবী অপ্-তেজঃ-মরুৎ-মনঃ এই পঞ্চ দ্রব্যে নোদনাদি নিমিত্ত—বিশেষাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে। (২) "স্থিতি-স্থাপক" সংস্কার—অখিল জাগতিক পদার্থ অগ্নীসোমাত্মক; অতএব জাগতিক পদার্থ মাত্রই অল্পবিস্তর আকুঞ্চন-প্রসারণশীল। স্থিতিস্থাপকধর্ম্ম (Elasticity) স্পর্শবদ্দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম। আর, সংকোচন বা আপীড়ন (Compression), আকর্ষণ (Tractioa), আনমন (Flexion) ও ব্যাবর্ত্তন (Torsion) এই চতুর্ব্বিধ যান্ত্রিক ক্রিয়াদ্বারা স্পর্শবদ্ দ্রব্যের স্থিতি পরিবর্ত্তন হয় সংঘটিত। স্থিতিস্থাপকধর্ম্মের চাতুর্ব্বিধ্য প্রদর্শনার্থ বুঝিতে হইবে—আণবিক সন্নিবেশের তারতম্যই স্থিতিস্থাপকধর্ম্মের চাতুর্ব্বিধ্যের কারণ। (৩) "ভাবনা" সংস্কার—আত্মগুণ ইহা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত অর্থসমূহের স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞানের (Recognition)-হেতু। পটুপ্রত্যয়, অভ্যাস প্রত্যয় ও আদরপ্রত্যয় হইতে সংস্কারের হয় আতিশয্য বা দৃঢ়তা। কোন আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিলে লোকে তাহা মনোনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করে এবং তজ্জন্য তাহার মনে তৎপদার্থের সংস্কার অঙ্কিত হয় দৃঢ়রূপে। কি ভৌতিকরাজ্য, কি উদ্ভিদ্রাজ্য, কি সঙ্কীর্ণ-

চেতনরাজ্য, কি বিশিষ্টচেতনরাজ্য, সর্ব্বত্রই হয় সংস্কারশক্তির লীলাভিনয়, কর্ম্ম হইলেই তাহার থাকে সংস্কার; অতএব যে রাজ্যে কর্ম্ম হয় সেই রাজ্যে থাকিবেই সংস্কারের অস্তিত্ব।

কালবশে সংস্কারবিভাগ এইরূপ যথা :—

(ক) অতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে **সঞ্চিত—প্রাক্তন** ও অপক্ক কর্ম্মফল সংস্কার।

(খ) বর্ত্তমানের অথবা পূর্ব্ব-মৃত্যুর ঠিক-পূর্ব্বে অর্জ্জিত কর্ম্মজনিত সংস্কারের শেষ স্মৃতি—**প্রারব্ধ** পক্ককর্ম্মফল সংস্কার।

(গ) ভবিষ্যৎ—**আগামী** বা অনাগত, হতোদিত-ও বলে। যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে বর্ণিত কালের সংস্কার গুলি।

এই একই সংস্কারকে বৈদান্তিক বলেন "মায়া", সাংখ্য বলেন "প্রকৃতি", মীমাংসক বলেন "অপূর্ব্ব এবং নৈয়ায়িক বলেন, "অদৃষ্ট"।

মানবের উপলব্ধি বা প্রত্যয়ের (feelings) দ্বিবিধ অবস্থা—অনুভূতি ও সংস্কার। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে পর যেরূপ যেরূপ বিষয় সম্বন্ধে অনুভূতি হয়, সূক্ষ্মভাবে সেই-সেই **অনুভূতি** বা বিষয়ের প্রতিবিম্ব চিত্তে থাকে বিদ্যমান; তাই অনুভূত বিষয়ের অনুপস্থিতিতেও চিত্তে লেগে-থাকা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের ছাপ মানব ধারণা ভাবনা করিতে পারে—ইহাই তাহার **সংস্কার**।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি রোগ-বা-বার্দ্ধক্যে হয় দূষিত এবং তাই বস্তুর যথাযথ রূপ তাহার চিত্তে ফোটে না; এই ইন্দ্রিয় দোষের মত আছে সংস্কার দোষও। এই সংস্কারদোষের কারণ পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়দোষ (ইন্দ্রিয় বৈকল্য বা ইন্দ্রিয়াদির অসম্পূর্ণতার জন্য শক্তিহীনতা)। সাধরণ সূত্রে—কার্য্যগুণ কারণগুণপূর্ব্বকই হয় অর্থাৎ কারণের বশেই হয় কার্য্য; প্রত্যক্ষ (sensation) যখন সংস্কারের কারণ, তখন প্রত্যক্ষে দোষ থাকিলে অবশ্যই সংস্কারও হইবে দূষিত। দূষিত সংস্কার = মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা; কথান্তরে কারণের করণশক্তির

অসম্পূর্ণতাই হয় মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা বা দূষিত সংস্কারের হেতু। ∴এই শক্তিবৈকল্য যতদিনের, সংস্কারদোষও ততদিনের। যাহা পূর্ণ তাহা অখণ্ডিত ও অপরিচ্ছিন্ন (unconditioned) তদ্বিপরীতে অপূর্ণ, এবং অপূর্ণ ই চেষ্টা করে হ'তে পূর্ণ; অনাপ্তকামই ঈপ্সিত-তমকে পাইতে চায় ও প্রবৃত্ত হয় কর্ম্মে। অপূর্ণ বা অভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিই কর্ম্মপরায়ণ, ঈপ্সিত যাহার মিলে নাই, তাহারই কর্ম্মে অধিকার ও কর্ম্মভূমিতে অবশভাবে করে যাতায়াত সেইই। সংসার বা জগৎ কর্ম্মভূমি, সংসার সততচঞ্চল-নিয়তপরিবর্ত্তনশীল; কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তনই জগতের রূপ, মূর্ত্তক্রিয়াই জগৎ, কোন জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্য হইয়া ক্ষণকালের জন্যও থাকিতে পারে না। বোঝা গেল যাহা অপূর্ণ তাহাই কর্ম্মশীল, সংসারও কর্ম্মশীল, অতএব সংসার নিশ্চয়ই অপূর্ণ (Imperfect)। সংসার যখন অপূর্ণ, তখন পূর্ণ হ'তে পারে না কখনও সাংসারিক; যাহা সাংসারিক বা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা ষড়্‌ভাববিকারময় তাহা অপূর্ণ, সাংসারিক জ্ঞান অপূর্ণ, সাংসারিক সত্তা অপূর্ণ, সাংসারিক আনন্দ অপূর্ণ। কথান্তরে যাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল, যাহা আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক, তাহাই অপূর্ণ—তাহাই মিথ্যা, আর যাহা পূর্ণ তাহাই **সত্য**।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, সংসার বা জগৎ বা পরিচ্ছিন্নশক্তির জীবন যাবৎকালাত্মক—যতদিনের, সংস্কারদোষও তাহ'লে ততদিনের। সংসার অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত—সংসারের আদি নাই, সংস্কারদোষও সুতরাং অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংস্কারেরও নাই আদি।

সুখীদের সুখের কথা স্মরণ করিয়া, সুখ বা সুখসাধনে অর্থাৎ সুখের কারণ পদার্থে যে তৃষ্ণা, পুনর্ব্বার তাহাকে পাইবার জন্য যে লোভ (= Avarice, Attraction) তাহাকেই বলে **রাগ**। আর, দুঃখী-দের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া, দুঃখ বা দুঃখসাধনে অর্থাৎ দুঃখের কারণ পদার্থে যে অরুচি—বিরাগ, তৎ প্রতি যে জিঘাংসা বা ক্রোধ (= Aversion, Repulsion) তাহাকেই বলে **দ্বেষ**।

যাহা আত্মার অনুকূলবেদনীয় (Agreeable to the perception) তাহা সুখ; আর যাহা হয় প্রতিকূলবেদনীয়—বাধনা-লক্ষণ (Disagreeable to the perception) তাহাই দুঃখ। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানই রাগ-দ্বেষের কারণ।

সংস্কারাধীন জীবের মধ্যে যে যাহাকে আত্মীয় মনে করে, যে যাহা সুখকর বা আত্মার অনুকূল বলিয়া বুঝে, সে তাহাকে **পাইতে চায়,** উহাকে গ্রহণ করিবার জন্য হয় উৎসুক, তাহার প্রতি জন্মে তাহার রাগ (= Attraction)। তদ্বিপরীতে জীব তাহাকে করে ত্যাগ যে মনোভাবে তাহার সেই মনোভাবই হয় দ্বেষ বা বিরাগ (= Repulsion)। এই রাগ-বিরাগই হয় যথাক্রমে গ্রহণ-ত্যাগের হেতু এবং সকলপ্রকার কর্ম্মের মূলীভূত কারণ। রাগ-বিরাগ না থাকিলেই শেষ হয় কর্ম্ম, প্রবৃত্তির হয় নিবৃত্তি, পরিণাম-স্রোত হয় অবরুদ্ধ এবং প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় সাম্যাবস্থা (Equilibrium) রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত পুরুষই শাশ্বত শান্তি পান। প্রবৃত্তিশূন্য হইতে না পারিলে, সাম্যাবস্থা সম্ভব নয়; সাম্যাবস্থা না পাইলেও মৃত্যুর রাজ্য বা কর্ম্মভূমি অতিক্রম করিয়া পরমাত্মক্ষেত্রে পৌঁছান যায় না। আধুনিক গণিতবিজ্ঞান তাহাই করিয়াছে প্রতিপাদন :

"A particle acted on by forces is said to be in equilibrium when it has no accelartion in any direction".

"Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusion, that the changes which EVOLUTION presents, cannot end until equilibrium is reached; and that Equilibrium must at last be reached".

কি করিলে দুরন্ত ভবরোগের যাতনা একেবারে হইবে উপশম

তাহা অনুমান করা যায় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভবরোগের ভেষজ দুর্লভ ! কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, নিত্যক্ষেমঙ্করী-সাম্যাবস্থা মিলিবে, তাহা বলা কঠিন ।

জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে রাগ-বিরাগের যোগেই ; সংসার রাগ-দ্বেষ সম্ভূত । আবার রাগ-দ্বেষের কারণ অনুসন্ধানে পাতঞ্জলদর্শন বলেন, "সুখানুশয়ী রাগঃ" "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" এবং বৈশেষিকদর্শনও বলেন, "সুখাদ্রাগঃ" । সুখভোগের পর তজ্জাতীয় সুখে ও তৎসাধনে (=সুখের হেতুভূত পদার্থে) রাগ (=আসক্তি) এবং দুঃখ ভোগের পর তজ্জাতীয় দুঃখে ও তৎসাধনে বিরাগ বা দ্বেষ জন্মায় । ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সুখ দুঃখ-ভোগেত্তরকালে ও সুখদুঃখ ভোগ হইয়া যাইবার পরও সুখদুঃখের প্রতি যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ থাকিয়া যাবার কারণানুসন্ধানে মহর্ষি কণাদের সূত্র, "তন্ময়ত্বাচ্চ"—৬।১। ১ স্মর্ত্তব্য ; অর্থাৎ বিষয়াভ্যাস নিমিত্ত সংস্কারই তাহার কারণ। বিষয়াভ্যাস নিমিত্ত সংস্কারের নাম তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়ত্ব বশতঃ সুখ ও সুখসাধনের, কিংবা দুঃখ ও দুঃখসাধনের অবিদ্যমানেও চিত্তে বিদ্যমান থাকে রাগ-বিরাগ। বিষয়োপভোগ হইবার পরে চিত্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে তাহার সংস্কার; সুতরাং বিষয়ের অনুপস্থিতিতেও রহিল রাগদ্বেষ ; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান দেহে যে সকল বিষয়ের উপভোগ হয় নাই—ইন্দ্রিয়ের সহিত যাদের কখনই সন্নিকর্ষ ঘটে নাই, তাদৃশ বিষয়সমূহের প্রতিও লোকের রাগ-দ্বেষ হয় ; যা দেখি নাই, শুনি নাই, এ জীবনে যে যে বিষয় কখন প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত হয় নাই তত্তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব রাগদ্বেষোৎপত্তির কারণ অণুসন্ধানে বৈশেষিকদর্শন বলেন, "অদৃষ্টাচ্চ"—৬।১।১২ অর্থাৎ, অদৃষ্ট—জন্মান্তরকৃত সংস্কারবিশেষই ইহার কারণ। বর্ত্তমান দেহে অননুভূত সুখদুঃখের প্রতি যে রাগদ্বেষের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মানুভূত বিষয়সংস্কারই তাহার হেতু। জাতি-বা-জন্ম বিশেষ হইতেও স্বাভাবিক রাগদ্বেষের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মনুষ্য-

প্রকৃতিতে যে সকল পদার্থের প্রতি সাধারণতঃ অনুরক্তি বা বিরক্তি হয়, পশ্বাদি ইতরজীবপ্রকৃতিতে তাহা হয় না। মনুষ্যদের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদি গুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে রাগদ্বেষের হয় ভিন্নতা। মাতাপিতা সমান হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায় সহোদরগণের রুচি হয় ভিন্ন। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মাতাপিতা হইতে জাত সন্তানের বিশুদ্ধ বিষয়ে অনুরাগ ও অশুদ্ধ বিষয়ে বিরাগ হয়। আবার মলিনচিত্ত মাতাপিতা পাপপ্রবণ কুরুচি সন্তানই করেন উৎপাদন।

এই প্রসঙ্গের শেষে বলা যায়—দারুণ বিপদ্‌জনক এই দ্বেষ-সংস্কার; দ্বেষ্যের প্রতি অনিষ্টচিন্তা ছাড়াও দ্বেষী আপন স্বাশ্রয়কেও করে বিধ্বস্ত; ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি এই দ্বেষেরই অন্তর্গত। পরগুণে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ভাবগুলি মানুষকে করে অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও সন্তপ্ত। পরদুঃখে দুঃখী হয়—পরের চক্ষুতে জল দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, এরূপ মহানুভব ব্যক্তি আছেন অনেক। কিন্তু পরের সুখে যথার্থ আনন্দিত হয়—পরের হাসিতে সরল প্রাণে আপন হাসি মিলাইয়া দেয় এরূপ ব্যক্তি দুর্ল্ভ। "রসো বৈ সঃ"; এই রসতত্ত্ব হইতেই সঞ্জাত রাগদ্বেষাদি ভাল-মন্দ সংস্কারের সন্তানসন্ততিগুলি। অনুরাগ বা আসক্তিই জীবকে রাখে আবদ্ধ করিয়া; আপত্তি হইতে পারে—জীবের বন্ধন কেবল আসক্তি-অনুরাগ থেকেই তো হয় না, দ্বেষ থেকেও হয়। কথা ঠিক! তবে মনে রাখিতে হইবে—অনুরাগেরই রূপান্তর মাত্র এই দ্বেষ; অনুরাগ যেখানে পায় বাধা, সেখানেই অনুরাগ প্রকাশ পায় দ্বেষের আকারে। আবার, শ্রীকৃষ্ণের কথা-"রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"; অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখিলেই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয় সম্যক্। পরমাত্মায় অনুরাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেই বিষয়ের প্রতি অনুরাগের থাকে না অবকাশ এবং আসুরিক সংস্কার রাশিরও হয় নাশ। সম্মুখে রসসমুদ্র! ইচ্ছা করিলেই মানুষ উহাতে চিরনিমগ্ন হইয়া লাভ করিতে পারে চিরশান্তি! অথচ কি অজেয় **মোহ**—জীবনের অনন্ত

কর্ম্ম-সংস্কার-শ্রেণী পিছনদিক থেকে দেয় টান; তাই, পরিচ্ছিন্ন দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব স্বতঃই আসে। এ-মতাবস্থায় যদি ভগবৎ কৃপায় সেই সাধক নিজেকে বিবেকান্ধ মূঢ় বলিয়া সম্যক্ বুঝিতে পারে, তাহ'লে শ্রীভগবানই ধীরে ধীরে সাধককে বুঝাইয়া দিবেন যে ঐ পরিচ্ছিন্নতার প্রতি বিদ্বেষরূপ বা আসক্তিরূপ যে মোহ উহাও শ্রীভগবানেরই অংশমাত্র। মাত্র লীলাকৈবল্যবশতঃই ঐ আসক্তি-অনুরাগ বা বিদ্বেষের আকারে প্রকাশ—ইহা অনুভব করিতে পারিলেই কাটে সাধকের মোহ। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—মোহ কাটে না একদিনে; পুনঃ পুনঃ অনুশীলনরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য ফলে ধীরে ধীরে কাটে মোহ। কামক্রোধাদি রিপুগণের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ; কারণ, যে মোহাচ্ছন্ন তাকে অন্য রিপুগুলি সহজেই করে আক্রমণ, যথা শাস্ত্রবচন, "তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্ নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ"।

স্বাভাবিক মোহের দৃষ্টান্তে উল্লেখ করা যায়—

(১) **রূপ**—রূপমোহের বলি পতঙ্গ (যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আলোতে) (২) **রস**—রসমোহের বলি মীন (মাছ টোপ্ রূপ রস খায়) (৩) **স্পর্শ**—স্পর্শমোহের বলি মাতঙ্গ (খেদার হস্তিনী) (৪) **শব্দ**—শব্দমোহের বলি কুরঙ্গ (হরিণ ছোটে শব্দের দিকে) (৫) **গন্ধ**—গন্ধমোহের বলি ভৃঙ্গ (ভ্রমর বসে পদ্মে) এমতে দেখা যায় মোহাচ্ছন্ন প্রতিটা জীবের দুর্গতির বা নাশের কারণ হয় **মোহ**।

১৩। বন্ধন-মুক্তি ও মোক্ষ-মুমুক্ষু কথা।

ভক্তপ্রবর জীবন্মুক্ত সুপ্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা সাধক-মহাপুরুষ রাম প্রসাদ সেন মহাশয় (খৃঃ ১৭২৩-খৃ ১৭৭৫)-এর সুরে সুর মিলাইয়া

মুক্তিকামী সাধককে গাইতে হবে সুললিত রামপ্রসাদীসুরে রামপ্রসাদ রচিত গান খানি যথা, "ধর্ম্মাধর্ম্ম দু'টী অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে রাখবি, যদি না মানে বারণ, (ওরে মন) জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি"। এই সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বাক্যটীর মধ্যে সংক্ষেপে সন্ধান দেয়া হইল মোক্ষপথের।

মানুষের অধর্ম্মগতি রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মপথে তাহাকে আনয়ন পক্ষে বৈধ ধর্ম্মকর্ম্মাদিই প্রধান সহায়; শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি পালন করিতে করিতেই মানুষের প্রাণে জাগে আত্মলাভের প্রবল বাসনা। বহুদিন শাস্ত্রীয় আদেশগুলির অনুষ্ঠান করিতে করিতে তবে সে বুঝে যে ভগবান্ ধর্ম্মের অতীত, অধর্ম্মের অতীত, কর্ম্মের অতীত, পরন্তু তিনি এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দময় অদ্বিতীয় বস্তু। ধর্ম্মই মুক্তির সোপান; আগে ধর্ম্মরাজ্য পরে আত্মরাজ্য। বিনা ধর্ম্মসোপানের সহায়তায় আরোহণ করা যায় না আত্মরাজ্যে; যদিও বা কখনও কাহাকে দেখা যায় যে শাস্ত্রীয় বৈধকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও আত্মান্বেষী হইয়াছেন কেহ, তবে বুঝিতে হইবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ডাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। যাই হোক্ অধর্ম্ম সংস্কার দূর করা তত কষ্টসাধ্য নহে; কিন্তু শাস্ত্রবিধির ধর্ম্মসংস্কার গুলি দূর করিতে সাধকের সমধিক হয় কষ্ট। মাতালের মদ্যপান সংস্কার যতশীঘ্র দূর করা যায়, একজন ত্রিসন্ধ্যাকারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদির সংস্কার দূরকরা তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর। এইরূপ অধর্ম্ম সংস্কার অপেক্ষা ধর্ম্মসংস্কার প্রবল ও কষ্ট শত্রু। কিন্তু সাধকের সৌভাগ্যে এমন একটা দিন আসে যখন করুণাময়ের অভাবনীয় করুণার এমন একটা প্রবাহ আসে যে, ঐ সকল সংস্কার প্রবল প্লাবনে তৃণরাশির ন্যায় যায় কোথায় ভেসে। সাধক রামপ্রসাদের তাহাই ঘটিয়াছিল স্বজীবনে; তাই পরবর্ত্তী সাধকদের জন্য অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন ঐ গানে। সাধনার পরিসমাপ্তি হয় তখন, যখন সাধক উপনীত হ'ন এইরূপ বোধে যথা, "আমি বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ মাত্র জ্ঞ-পদার্থ";

"আমি নিত্যানন্দময় মহান্ চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ"....ইত্যাদিরূপ তুল্য-বোধে। উপাসনা দ্বারা এই পর্য্যন্তই পাওয়া যায় যেখানে জগৎ-সংস্কার বীজবৎ অবস্থিত—"বটকণিকায়াং বৃক্ষ ইব"। এখানে আসিলে জগদ্বীজ বা সংস্কাররাশি সাধককে বদ্ধ করিতে পারে না; সে নিত্যমুক্ততার পায় আভাস। যেরূপ পরমেশ্বরে অনন্তকোটি ভুবনের সংস্কার বা বীজ থাকা সত্ত্বেও তিনি নহেন বদ্ধ, যেরূপ এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্য্যে নিয়ত নিরত থেকেও, তিনি পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত; ঠিক সেইরূপই সাধক আনন্দময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলে, জগদ্ভাবে আর বদ্ধ হ'ন না; এ-অবস্থায় নিয়ত নিত্যানন্দ রসের হয় উপভোগ। ইহাই সাধকের সাধনলভ্য—ইহাই তাঁহার প্রকৃত শান্তিনিকেতন। ইহার পর পারে যিনি, তিনি "অবাঙ্মনসোগোচর"—বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সাধনারও অতীত, স্বসংবেদ্যমাত্র।

সাধনার প্রণালীরূপ ধর্ম্ম সংস্কার গুলি—অসংখ্য শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ গুলি আত্মলাভের পক্ষে প্রথম-প্রথম হিতকর হইলেও ইহাও তো বন্ধন! ইহাও তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের অধীনতা! স্বাধীনতা প্রয়াসী মুক্তিকামী সাধক-আত্মার উন্মুক্তক্ষেত্রে বিচরণশীল সাধক কি আর অত ভাবিয়া—অত বিচার করিয়া অগ্রসর হ'তে চায়? অথচ ও-গুলিকে উপেক্ষা করিতেও সাহস হয় না। এইরূপে বৈধকর্ম্মের সংস্কারগুলি সাধককে করে বড়ই উৎপীড়িত; উহার অনুষ্ঠান করিয়াও যথার্থ আনন্দ পায় না, অথচ ছাড়িতেও পারে না; তাই সাধকের নিত্যানন্দের বিঘাতক ঐ বৈধকর্ম্মসংস্কারগুলি। পতঞ্জলিদেবের কথায়, স্বল্পপ্রতি-পক্ষাঃ স্থূলাবস্থাঃ ক্লেশানাং সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষাঃ"। মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে কামক্রোধাদিবৃত্তিগুলি তত অন্তরায় বলিয়া মনে হয় না, যত অন্তরায় এই সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি—এই বৈধধর্ম্মকর্ম্মসংস্কারগুলি; এই ধর্ম্মশত্রুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার: সর্ব্বত্রই হইতে হয় নির্জ্জিত। এখানেই সাধকের আসে চরম বিষাদযোগ;

ইহার পর আর বিষণ্ণ হইতে হয় না। এইখানেই সুধী সাধকের স্মর্ত্তব্য এইরূপ—"জীবভাবে প্রকাশিত অজ্ঞানসম্ভূত "আমি", ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত যথার্থ "আমি"-র সন্ধান পাইলেই, জীব ও ঈশ্বরের মিলন ঘটিল। আবার ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত "আমি", পরমভাবে পৌঁছালেই পরমপুরুষার্থ বা কৈবল্য হয় লাভ। জীবকে পরমভাবে প্রকাশিত হইতে হইলে, মধ্যবর্ত্তিস্বরূপ যে ঈশ্বর-"আমি", তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। জীবকে প্রথমে হইতে হইবে-ঈশ্বর, ঈশ্বর উপনীত হবেন পরমভাবে—ইহাই মুক্তি। ঈশ্বর-আমির সেবা করার নামই কর্ম্ম, কর্ম্ম মাত্রই সাধনা বা ধর্ম্ম"। সূচনাতেই এই বৈধধর্ম্মকর্ম্ম-কথার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে—কর্ম্মান্তে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসরের পর মুক্তিকামী-প্রকৃতমুমুক্ষুর কাছে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধপূর্ণ বৈধধর্ম্মকর্ম্মসংস্কারগুলিও তাঁর মুক্তিপথের নিত্যানন্দবিঘাতক। তাই জীবন্মুক্ত সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের উপদেশ—বিবেকজজ্ঞানবিচারে অধর্ম্ম তো বটেই তথাকথিত ধর্ম্মকেও হৃদয় থেকে মুছে ফেলিতে হইবে।

মানবসাধারণ সাধারণতঃ আপন-আপন সংসারের স্ত্রী-পুত্রাদিকেই বন্ধন ব'লে ধারণা করে, বিশেষ যখন সংসারের অভাব অভিযোগে সংসারসন্তাপে হয় বিদগ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে যতদিন বিশুদ্ধচৈতন্যের আভাস না পায় ততদিন সংসারবন্ধন মনেই করিতে পারে না সাধক। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে হইলে যে ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেই ক্ষুদ্রতার (= পরিচ্ছিন্নতার) যে একটা আছে যাতনা, মানুষ যতদিন উহা উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন মুখে সহস্রবার বন্ধন-বন্ধন বলিলেও, যথার্থ বন্ধন-জ্ঞান হ'তে পারেই না। এক কথায় আত্মদর্শন না ঘটিলে বন্ধন-জ্ঞানই হয় না। একবার খোলা আকাশে না উড়িলে খাঁচায় থাকা যে কষ্টকর তা পাখীর মনেই হয় না। মানুষ যখন জীবব্রহ্মের একত্ব বুঝিতে পারে তখনই ধীরে ধীরে তাহার জীবত্ববন্ধন, কর্ম্মসংস্কার, দেহাত্মবোধ প্রভৃতি শ্বলিত

হ'তে আরম্ভ হয়। মানুষের মনটী যতক্ষণ তাহার মনে আছে ততক্ষণই বন্ধন, ততক্ষণই সংসার। অন্তরের সংস্কাররাশিই যথার্থ বন্ধন; সংসার অন্তরেই অবস্থিত। যতই নিভৃত স্থানে পর্ব্বতকন্দরে থাকা যাউক না কেন কিছুতেই সংসার ছাড়ে না।—ইহাই যখন সাধক মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন এবং সংসারের মূল উৎপাটন করিতে চান, তখন জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠায় দেখেন সংসারও তো সত্য! এমতাবস্থায় অগত্যা সাধক তাঁহার আগামী বা ভবিষ্যৎ কর্ম্মের বীজরূপ "একোঽহং" "বহুস্যাম"—এই দু'টী দুরপনেয় সংস্কার (অহংবোধাত্মক আনন্দ+বহুভাবেচ্ছামূলক আনন্দ) প্রাণপণ চেষ্টায় ছাড়েন। কিন্তু, এইরূপে ভবিষ্যৎ কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইলেও, সাধকের বহুদিন বহুজন্মজন্মান্তর ধরিয়া চাওয়া যে বহুত্বের অগণিত আশা আকাঙ্ক্ষা তাহারা যে বহুত্বের পুঞ্জীভূত সংস্কাররূপে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চিত্তে রহিয়াছে। ইহারাই সাধকের সঞ্চিত সংস্কাররূপ বন্ধন।

আবার বিশ্বরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বদর্শনে জীবকর্ত্তৃত্ববোধ যখন অস্তমিতপ্রায়, তখন সাধক সর্ব্ববিধ সংসার চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস! কিন্তু, এখনও প্রক্ষীণ হয় নাই প্রবল প্রারব্ধ সংস্কার সমূহ; কি যেন এক অজ্ঞেয় মহতীশক্তির প্রবল অনুপ্রেরণায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়ে পড়ে কর্ম্মের আরম্ভ। সাধক বেশ জানেন যে, "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ"। তথাপি এসে পড়ে ক্ষণেকের তরে কর্ত্তৃত্ববোধ, ও ঢেকে ফেলে সমস্ত জ্ঞানকে। জীব এসেছে ব্রহ্ম হইতে, যতদিন সে পুনরায় ব্রহ্মত্বে ফিরে না যায় ততদিন থাকে অতৃপ্ত; এই অতৃপ্তিই ব্রহ্মের গতিমূর্ত্তি। এই অতৃপ্তির প্রভাবেই পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যৎ ও সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় হইলেও, দুরপনেয় প্রারব্ধসংস্কার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ কিছুতেই হ'তে পারে না স্থির। প্রারব্ধটা যে দুঃখ নয়, উহা ব্রহ্মেরই লীলাবিলাসমাত্র ইহার সম্যক্ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধ সংস্কারগুলি দুঃখদায়ক মনে হয়।

আরও, পুরুষের প্রকৃতিযুক্ততাই পুরুষের বন্ধন বা জীবভাব; আবার প্রকৃতির পুরুষবিমুখতাই প্রকৃতির বন্ধন, পক্ষান্তরে পুরুষের সাম্মুখ্যই প্রকৃতির মুক্তি। এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক হইলেই পুরুষ প্রকৃতিবিযুক্ত হইয়া মুক্তস্বরূপে করেন অবস্থান।

প্রকৃত প্রস্তাবে মনেরই মুক্তিকে বলা যায় মোক্ষ; বিষয়ভাব-বর্জ্জিত হ'লেই মনের হয় নাশ; তখন চিৎপ্রতিবিম্বটী ফিরে যায় মহা চৈতন্যে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে। মন নাশশীল হ'লেও উহার নাশ সহজ-সাধ্য নয়। জীব গঠিত ২টী উপাদানে, যাহার একটী হয় উৎপন্ন (=জন্য) পদার্থ; উৎপন্ন পদার্থমাত্রই নাশশীল, কিন্তু জীবের নাশ সহজ সাধ্য নহে, যেহেতু উহাব একটী উপাদান চিদাভাস নাশশীল নহে, কারণ উহা অবিনাশী ব্রহ্মের বা আত্মার আভাস। আর, অন্যতম উপাদান মন অর্থাৎ সংস্কার বা স্মৃতিসমষ্টি হয় নাশশীল, যেহেতু সংস্কার জড় (নাশ্য সন্দেহ নাই) কিন্তু উহা অনাদিকাল প্রসিদ্ধ (অল্পদিনের সঞ্চিত নয়) তাই উহা নাশ্য হইলেও, উহার নাশ নহে সহজসাধ্য। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মনঃ (=বাসনা-বা-ভাবসমষ্টি মাত্র) সমূলে দাহ্য বা নাশ্য। এই বাসনাসমষ্টিরূপিণী মায়া কোন দেবী বা অপদেবী নহেন, উনি বাসনরূপিণী। জাগতিক মহাবাসনারূপিণী মায়াকে নাশ করার শক্তি কাহারও নাই, কিন্তু মানব জ্ঞানবিচার দ্বারা স্বীয় হৃদয়স্থ মায়ারূপী বাসনাজাল কাটিতে হয় সমর্থ। সিদ্ধ সাধকের বাণী—"সংসারবীজং মন এব বিদ্ধি, ন পুত্রদারাত্রবিণাদিকং হি। সংসারনাশো মনসোলয়েন, ন তদ্ গৃহস্থাশ্রম-বর্জ্জনেন"। মনঃই হইতেছে সংসারের কারণ; মনের লয় হইলেই স সারবন্ধনভাব দূর হয়; গৃহস্থাশ্রম ছাড়িলেই সংসার ত্যাগ হয় না। যে মুহূর্ত্তে ফুটিবে যথার্থ বন্ধনজ্ঞান সেই মুহূর্ত্তেই জীব নিত্যমুক্ত। বন্ধন অবস্থাই বেশ প্রীতিকর বোধ হয় মানুষ যতই কিছু করুক না কেন তার বন্ধনটী বজায় রাখিতে খুবই ভালবাসে। জীবত্বই বন্ধন, আর ব্রহ্মত্বই মুক্তি। আবার ব্যাপকদৃষ্টিতে

সৃষ্টিই বন্ধন, স্থিতিও বন্ধন এবং প্রলয়ও একপ্রকার বন্ধন; এত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও পরব্রহ্ম নিত্যমুক্ত! আর সেই নিত্যমুক্তের আশ্রয়ে অপত্যরূপে থাকিয়াও জীব বদ্ধ! ধিক্ ব্রাহ্মণের (=ব্রহ্মের অপত্যের) সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে! ধিক্ ব্রাহ্মণের (=ব্রহ্মের অপত্য) ব্রাহ্মণত্বে! যে ব্রহ্মপুত্র নিত্য উন্মুক্ত ব্রহ্ম-বক্ষে লালিত পালিত হইয়াও, আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে তাহার পুত্রত্ব বিড়ম্বনামাত্র। যতক্ষণ বন্ধনজ্ঞান প্রাণে না ফোটে, যতদিন খাই-দাই-বেড়াই বেশ আছি, বন্ধন আবার কি?—এ ভাবটা না যায়, ততদিন বুঝিতে হইবে ব্রহ্মণ্যদেব এখনও তাঁহার জীবত্বকে বন্ধনজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হন নাই। জীব চাইবামাত্রই তিনি সেইরূপে হ'ন আবির্ভূত; তখন জীবের হয় অসহনীয় বন্ধন-যাতনাবোধ; সেই যাতনা হইতেই ফোটে মুক্তির কামনা। তখন ব্রহ্মণ্যদেব ক্রমে ক্রমে জীবকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে তোলেন। যদি সেই সকল উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রবল মুক্তিকামনা জাগ্রত রাখিতে পারে, তবেই ব্রহ্মণ্যদেব স্নেহের মুক্তিকামী সন্তানকে আপন বক্ষে মিলাইয়া ল'ন।

আবার মানুষ যখন প্রথম মুমুক্ষু হয়, তখন স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনকেই মনে করে **বন্ধন**; ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে—দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইহারাই বন্ধন, কিন্তু সর্ব্বশেষে দেখে যে তাহার যথার্থ বন্ধন তাহার **অজ্ঞান**। "আমাকে আমি জানি না"—এই মূল অজ্ঞানই বন্ধনের যথার্থ স্বরূপ। কোন্ অনাদিকাল হইতে, কি খেয়ালে এই অজ্ঞানটাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে সে! ঐ এক বিন্দু অজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, কত জন্মমৃত্যুরই স্রোত বহিয়া যাইতেছে, কত সুখ-দুঃখের স্বপ্নই দেখিতেছে! আবার ঐ অজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়াই উহাকে বিলয় করিতে কত চেষ্টা, কত প্রাণপাত তপস্যা, কত কঠোর ব্রত-নিয়ম ধর্ম্ম-চর্য্যার অনুষ্ঠান! এই অবস্থায় সাধক বুঝিতে পারেন যে—বুদ্ধি-

নিরোধ, বাসনা-ত্যাগ, কিংবা সাময়িক সমাধি, যাহাই করা যাক্ না কেন, বাসনার অত্যাচার হইতে একেবারে পরিত্রাণ কিছুতেই পাওয়া যায় না। যতক্ষণ কৌশলে বৃত্তি-নিরোধ পূর্ব্বক শূন্যবৎভাবে সুষুপ্তবৎ থাকা যায়, ততক্ষণ বেশ কাটিয়া যায়; কিন্তু নিরোধ তো চিরস্থায়ী হয় না, আবার ব্যুত্থিত হইতে হয়। তখন যে পুনরায় কামনাদেবী দেন দেখা! যতক্ষণ আত্মসংস্থ হইয়া থাকা যায়, ততক্ষণ উহাদের নাম গন্ধও থাকে না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার অনাত্মভাব উঠে ফুটে। পুনঃ পুনঃ এইভাবে উৎপীড়িত হওয়ায় কামনাজয় একান্ত অসম্ভব মনে করেন সাধক এবং হ'ন খুবই ব্যথিত; "হায়! এই অব্যক্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনের হাত হইতে পরিত্রাণের নাই কোনই উপায়"। এইরূপ ভাবিয়া সাধক কিছু দিনের জন্য যেন হন হতাশ। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা যায়—সাধক যখন আপনাকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন, তখনই তিনি বদ্ধ। বাস্তবিক, বন্ধন বা মুক্তি বলিতে কিছুই নাই। নিত্যমুক্ত নিত্যস্বাধীন পরমাত্মার বন্ধনজ্ঞান কল্পনামাত্র—একটা লীলামাত্র; পরমাত্মায় পরমাণুর প্রাদুর্ভাব—তাঁর—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা—অভেদে ভেদোপচার। মুক্ত পরমাত্মায় বদ্ধ পরমাণুর আবির্ভাবেই সুরু হয় সৃষ্টি-লীলা। তথাপি সাধকের পক্ষে কিন্তু এই বন্ধনজ্ঞানই সুদুর্লভ। বহু জন্মের পর, বহু সাধনার ফলে, মহামায়ার কৃপায় সাধক আপনাকে যথার্থই বদ্ধ বলিয়া মনে করেন। অহো! বন্ধনজ্ঞান হওয়াটাই তো সাধনার ফল! মুক্তি সাধনার ফল নহে। মুক্তি তো নিত্য—চিরমুক্ত। বন্ধনবোধ হয় কই? সহস্রবার মুখে বলা যায়—"আমি বদ্ধ"; কিন্তু বন্ধন যে কোথায় তাহা মানুষ প্রথমে বুঝিতে পারে না। সাধারণ মানুষের বন্ধনজ্ঞান—সংসারের উৎপীড়নজন্য একপ্রকার আনুমানিক জ্ঞানমাত্র। বদ্ধ অবস্থার যথার্থ উপলব্ধিই তাদের হয় না। কিন্তু ব্রহ্মণ্যদেব স্নেহের সন্তানকে মুক্তির আস্বাদ ভোগ করাইবেনই;

ক্ষণকালের তরেও মুক্তির আস্বাদ না পাইলে, যথার্থ বন্ধভাবের উপলব্ধি হয় না, তাই।

ইহজগতে "বন্ধন"-"বন্ধন" বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ বহুদিন হইতে উঠিয়াছে। আজকাল নয়, দার্শনিক যুগের বিষয় আলোচনা করিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়—বন্ধন-জ্ঞানটা এ-দেশে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। "আমরা বদ্ধ জীব" এইরূপ ভাবনা করিতে ভারত যেদিন হইতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে কেবল যে মায়ার বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহা নহে, বাহিরের বন্ধনও ভারতবাসীকে জর্জ্জরীভূত ও অবসন্ন করিয়াছে।

যোগশাস্ত্র বলেন—বিষয়াসক্ত-চিত্তই বন্ধন, আর নির্বিবষয়চিত্তই মুক্তি। যাঁরা বিষয়কে আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ একটা সত্তারূপে দেখেন, তাঁদের চিত্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, বিষয়াসক্তি থাকিবে, সুতরাং তাঁরা নিশ্চয়ই দেখিবেন বন্ধন ও প্রাণপণে বিষয় হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যাঁরা দেখেন—সবই ব্রহ্ম, সবই আত্মা, তাঁদের বিষয়ের প্রতি নাই অনুরাগ, বিদ্বেষও নাই। ত্যাগ নাই, গ্রহণ নাই ; তাই তাঁদের বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই।

আবার, ইন্দ্রিয়াধিপতিদেবতারা আপনাদের স্ব-স্ব চিৎভাব (= পরমাত্ম-সংযোগভাব) বিস্মৃত হইয়া স্থূলাভিমানী জড়ত্বপ্রিয় অর্থাৎ জড়শক্তিরূপে প্রতিফলিত ; কথান্তরে ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশসমূহ পরমাত্ম-গতি ছেড়ে বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট ; এই জড়ত্ববোধের নামই **বন্ধন**। প্রসঙ্গত বলা যায় চৈতন্য-মাত্র উপলব্ধির নাম **মুক্তি**। এই হিসাবে আরও সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গুণত্রয় বা বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয় অবধি যাবতীয় দৃশ্যবর্গের নাম জড় বিধায় তাহারাও এক প্রকার বন্ধন ; এবং যিনি এই যাবতীয় দৃশ্যাদৃশ্যের দ্রষ্টা বা প্রকাশক তিনিই চেতনপুরুষ—পূর্ণমুক্ত। সাধকের স্মরণ রাখা চাই—সবারই স্বরূপ একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্য, "পূর্ণ মুক্তাবস্থা" ; এবং মায়োপহিত চৈতন্যকে বলা যায় বদ্ধ।

ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মা, আর জীব অশুদ্ধ-অনিত্য-অজ্ঞান-অনাত্মবোধযুক্ত ; তাই জীব তাঁতে পারে না মিলিতে। ভক্ত সাধক (=জীব) অনেক সময় অগত্যা বাধ্য হইয়াই বলে—মুক্তির নাই কোনও প্রয়োজন, যদি অমুক্ত অবস্থায় থাকিয়াই পূর্ণভাবে ব্রহ্মামৃত-রস ভোগ করিতে পারিতাম! ব্রহ্মণ্যদেবকে প্রকৃত ভালবাসিতে গেলে—যথার্থ ব্রহ্মরস উপভোগ করিতে গেলে ব্রহ্মকে জানিতে হলে জীবকেও হইতে হইবে ব্রহ্মণ্যদেবের মত অথবা ব্রহ্মণ্যদেব ("To know is to become"—ইংরাজমনীষির কথায়) অর্থাৎ হইতে হবে নিত্যশুদ্ধমুক্ত। যতদিন জীবের আছে "আমিত্ব"-র লেশমাত্র, ততদিনই বুঝিতে হইবে যে সেই সমষ্টিপ্রাণে—মহাপ্রাণে, জীবের ব্যষ্টিপ্রাণবিন্দুটুকু ঢালিয়া দিতে পারে নাই জীবসাধক। বদ্ধ-প্রাণ কিরূপে মুক্ত মহাপ্রাণকে বাসিবে ভাল? তাই বৈষ্ণবগণ বলেন, "জীব কখনও ঈশ্বর হ'তে পারে না; জীব চিরদিনই থাকিবে জীব, জীবের পক্ষে ঈশ্বর-হওয়ার চিন্তা করাও পাপ।" একপক্ষে এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে; বিন্দুমাত্র জীবভাব থাকিতেও ব্রহ্মত্বলাভ হ'তে পারে না। জীবত্ব ও ব্রহ্মত্ব আলো-আঁধারের ন্যায় পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ; জীবত্ব থাকিতে আসে না ব্রহ্মত্ব, আবার ব্রহ্মত্বে পৌঁছালে জীবত্বের গন্ধও থাকে না। তবে জীব যখন সন্ধান পায় পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার (=ব্রহ্মের), তখন একটু একটু করিয়া মুগ্ধ হইতে থাকে তাঁর প্রেমে। ক্রমে পরিপক্কাবস্থায় ঐ প্রেম ঘনীভূত হইয়া আত্মহারা করিয়া দেয় ভক্ত সাধককে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন সত্তাই পায় না খুঁজে সাধক। এই অবস্থায় ভক্ত সাধক হইয়া যায় ব্রহ্মভাবাপন্ন। স্মর্তব্য গীতার কথা, (৯।২৯) "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্"। এ অবস্থায় থাকে ভক্তের সাথে ভগবানের একটা ভেদের অচিন্ত্য কাল্পনিক রেখামাত্র; বস্তুতঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে ক্ষণে ক্ষণে অভেদ অদ্বয় স্বরূপটাই। ইহাই ভক্তের বহুবাঞ্ছিত জীবন্মুক্ত

অবস্থা। ঐ ভেদের রেখাও থাকে না বিদেহ-বা-কৈবল্য অবস্থায়। পূর্ণ প্রেম বা পরম সাযুজ্য ইহাই। যাহা চিন্মাত্রস্বরূপ তাতে চেত্য বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না; যাহা অনুভূতিমাত্রস্বরূপ, তাতে অনুভাব্য বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে এই ক্ষেত্রে, এই পরমাত্ম-স্বরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কিছুই নাই। আত্মা বা ব্রহ্ম নিত্য স্বচ্ছ, নিত্য নিরঞ্জন, নিত্য বিশুদ্ধ। আরও, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হয় বটে, কিন্তু সেজন্য রজ্জুতে কখনও সর্প বলিয়া থাকে না কিছু; রজ্জুর সর্পভাব যেমন কখনও নাই ঠিক তেমন আত্মায় বা ব্রহ্মে জগদ্ভাব কখনও নাই:—এইরূপ ভাবে ব্রহ্মোপলব্ধির পর, ব্যুত্থিত অবস্থায় ব্রহ্মের প্রতি যে স্বাভাবিক একান্ত অনুরাগ থাকে, উহাকেই বলে **অহৈতুকী ভক্তি**। আত্মার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং জগৎসত্তার অভাব-বিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান, এই উভয়ই সাধককে ক'রে রাখে সর্বথা নিস্পৃহ বা পরবৈরাগ্যবান্। এইরূপেই জীবন্মুক্ত হ'ন সাধক; ঘুচে যায় তাহার সকল বন্ধন এবং নিত্যমুক্ততার আস্বাদ পান তিনি! সংক্ষেপে বলা যায়—ব্যবহারিক জগতের বিভিন্ন বিশিষ্ট পদার্থের, বিষ্ণুর পরমপদ মাধ্যমে, জগৎস্বামীর নিত্য-নিরঞ্জন—নির্বিবশেষ ক্ষেত্রে যেন **দ্বিরাগমন** এই মুক্তিমিলন।

আরও, নিজেদের অস্বতন্ত্রতার কথা যে পরিমাণে বোধ হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে মানব জীবত্ব হইতে মুক্ত হবার জন্য তথা স্বাধীন হবার জন্য হইবে লালায়িত। এ জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্য অসম্ভব। মানুষ কিরূপ দুশ্ছেদ্য নিগড়ে চির আবদ্ধ! পরমাত্মক্ষেত্রই একমাত্র স্থান যাহা পূর্ণ স্বাধীনতার তথা মুক্তির ক্ষেত্র।

জগৎ গতির মূর্তি বটে, কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিলে বোঝা যায়, গতির লক্ষ্য গতি নহে; জীব মাত্র চলার জন্য চলে না, স্থিতিই গতির লক্ষ্য। একেবারে স্থির হবার জন্য—চিরশান্তিনিকেতনে চিরদিনের জন্য প্রশান্ত ভাবে থাকিবে, এই উদ্দেশ্যেই জীব সদাচঞ্চল নিয়তগতিশীল। গতির

লক্ষ্যবিন্দুসাম্য-অবস্থা (=Equilibrium)=প্রশান্তবাহিতা, কথান্তরে মুক্তি। যাহারা গতিশীল তাহারাই যে সত্ত্ব বা কেন্দ্র অভিমুখে যাইতে চেষ্টা করে, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু, যাবৎ কামনা-বাসনা না যায়, সকামকর্ম্মজনিত সংস্কার ভোগ দ্বারা যাবৎ মন্দীভূত না হয়, জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার যাবৎ নাশ না হয়, তাবৎ সত্ত্ব বা কেন্দ্র-অভিমুখীন্ গতি হয় না; রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ তাবৎ গন্তব্যস্থানের বিপরীত দিকে যায়। যখন হৃদয়ের কামনা-বাসনা গুলি প্রলীন হয়, আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র কমনীয় পদার্থ এই জ্ঞানসূর্য্যের প্রখরকরে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার বিষয় বাসনা হয় সমূলে বিশীর্ণ, তখন মানব মরণধর্ম্মা হইয়াও বর্ত্তমান শরীরেই লাভ করে অমরত্ব। অজ্ঞান লক্ষণ—অনাত্ম বিষয়কামনাই মৃত্যুসম; উহা চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ নানাবেশে নানাদেশে করে ভ্রমণ, পুনঃ পুনঃ জন্মাদি ভাববিকারে হয় বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত। বিষয়ান্তর হইতে মনঃ উপরত হইয়া আত্মস্থ হইলে অর্থাৎ অনাত্মবিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া যখন মানুষ হয় অন্তর্মুখীন, তখন তাহার মনের হয় নিরোধ-পরিণাম (=Equilibrium mobile); তখন মনঃ প্রাপ্ত হয় সর্ব্বদুঃখহর অনারম্ভাবস্থা। কামনা-শূন্য না হইতে পারিলে মানুষ কদাচ যে ঈপ্সিততম অবস্থায় আসিতে পারিবে না—ইহাতে নাই সন্দেহ। এই কথা জড়বিজ্ঞানও বলে যেমন:—পদার্থ রাজ্যের অবস্থা ত্রিবিধ, (ক) কঠিন, (খ) তরল ও (গ) বায়বীয়। (ক) দ্রব্যের কঠিনাবস্থায় অণুগুলি পরস্পর গাঢ়-বা-ঘনভাবে হয় সংযুক্ত (firmly cohere), অণুগুলির মধ্যবর্ত্তী অবকাশ (inter-molecular spaces) হয় স্বল্প, এমতাবস্থায় ভেদবৃত্তিশক্তি (=Repulsion)-র পরাজয় এবং বিপরীত সংসর্গবৃত্তিশক্তি (=molecular attraction or cohesion)-র জয়, তমোগুণের জয় ও রজোগুণের পরাজয় ঘটে; সুতরাং, এই অবস্থায় হ্রাস হয় আণবিক গতির এবং দ্রব্যের জড়ত্ব-বা-স্থিতিশীলত্ব-বা-প্রতীঘাতধর্ম্মকত্ব

(the property of offering resistance) হয় বর্দ্ধিত ; এমতে দ্রব্যগুলি হয় নির্দ্দিষ্ট-রূপ বা আকারবিশিষ্ট। (খ) দ্রব্যের **তরল** অবস্থায় অণুগুলির সংসক্তি (=contiguity or cohesion) হয় শিথিল ; কঠিনাবস্থা হইতে এই অবস্থায় ভেদবৃত্তিশক্তির (Repulsion) বা রজোগুণের হয় প্রাবল্য, তাই অণুগুলি স্বাধিকরণে অপেক্ষাকৃত অনিরুদ্ধ বা-নিরর্গলভাবে, কথঞ্চিত স্বচ্ছন্দতায় স্পন্দিত হ'তে পারে (of course the atoms or molecules have greater freedom of motion than in the solid state) ; তরল দ্রব্যের নাই নির্দ্দিষ্ট নিজ আকার, যখন যে আধারে থাকে তখন ইহা তদাকারে হয় আকারিত ; তরলপদার্থ মধ্যে কোন বস্তু নিমজ্জিত করিলে ইহা দেয় না অধিক বাধা ; তরলপদার্থ সকল বস্তুতঃ অসঙ্কোচনীয়। (গ) দ্রব্যের **বায়বীয়** অবস্থায় অণুগুলির ভেদবৃত্তি-শক্তি হয় অধিকতর প্রবল, বর্দ্ধিত হয় গতিশীলত্ব, লঘুত্ববশতঃ বায়বীয় পদার্থ পারে উদ্গমন করিতে ; তরল পদার্থের মত ইহারও নাই নিজরূপ, বায়বীয় পদার্থ অতিমাত্র সঙ্কোচনীয় ও বিস্থর বা বিস্তারী (very compressible and expansive), তরল অবস্থায় অণুগুলি স্বাধিকরণেই হইতে পারে না সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দভাবে স্পন্দিত, ইহাদের গতি ক্ষিতিতল অতিক্রমপূর্ব্বক পারে না ঊর্দ্ধে গমন করিতে ; কিন্তু বায়বীয় অবস্থায় ইহারা স্বচ্ছন্দতঃ আকাশপথে করিতে পারে বিচরণ। কঠিন-তরল-ও-বায়বীয়, এই ত্রিবিধ ভৌতিক পদার্থের উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম-বা-গুণের স্বরূপ দর্শন করিয়া বলা যায়—**সঙ্ঘাতের গাঢ়ত্বে বৃদ্ধি হয় জড়ত্বের**। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে কঠিন-তরল বায়বীয় এই ত্রিবিধ ভৌতিক অবস্থার ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মসমূহের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মরাজ্যে উহাদের সম্প্রয়োগ করিলে বোঝা যায় সহজেই যে, যে-কারণে কঠিন হইতে তরলের এবং তরল হইতে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণশীলতা বা ব্যাপকত্ব অধিকতর, সেই কারণে তত্ত্বদর্শী হয়েন

সর্ব্বজগৎস্বরূপ, সেই কারণে তাঁহার আত্মপরবুদ্ধি হইয়া যায় বিলুপ্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Cook সাহেবের কথায়—"A molecule, in the midst of the mass, moves freely, because the attractions are equal in all directions, but a molecule near the surface is in a very different condition".

যাঁর আকর্ষণ সর্ব্বভূতে সমান, যাঁর প্রেম বিশ্বব্যাপক, যিনি আত্মাকে বা ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন, তিনিই স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র করেন বিচরণ, তাঁরই গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত, ভূতগুলি যেমন কঠিন অবস্থা ছেড়ে তরল অবস্থায় এবং তরল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায় আসিতে পারে, মানবও তেমন উপযুক্ত সাধনাদ্বারা স্বল্পাত্মকতা (= পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধি) ছেড়ে সর্ব্বাত্মক হ'তে পারে, সার্ব্বভৌম হ'তে পারে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপে হ'তে পারে পরিণত। কঠিন দ্রব্য কিরূপে তরল অবস্থা এবং তরলদ্রব্যই বা কিরূপে বায়বীয় অবস্থায় আসে? উত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলেন—ভেদবৃত্তি তাপ কঠিন দ্রব্যকে তরল করে ভেদবৃত্তিতাপের আধিক্যেই তরলদ্রব্য ধারণ করে বাষ্পাকার; এবং সংসর্গবৃত্তি শৈত্যই বায়বীয় ও তরলাবস্থাকে আনে কঠিনাবস্থায়। গতি-বা-ক্রিয়ার প্রকারভেদই "তাপ" (Heat is a mode of motion)।

বেদ রজঃগুণকে ব'লেছেন ক্রিয়াশীল; তাই বলা যায়, রজোগুণের প্রাদুর্ভাবই "তাপ"। জগৎসৃষ্টি করিয়াই জগৎস্রষ্টা যদি সবিতাকে জগৎ হইতে অপসারিত করিতেন, তাহ'লে কোন জাগতিক বস্তুর গতি থাকিত না, তাহ'লে জগতের জগত্ব হইত বিলুপ্ত, জাগতিক বস্তুজাত তাহ'লে চিরকাল থাকিত জড়পিণ্ডাকারে। শাস্ত্রের উপদেশ—চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের প্রয়োজন, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদ্বারা চিত্ত হয় বিশুদ্ধ। চিত্তের কামনা-বাসনাদিই চিত্ততাপের বাহ্যলক্ষণ এবং উহারাই চিত্তমল; এই মলধৌত করাই চিত্তের শোধন। চিত্ত মলমুক্ত না

হ'লে আধ্যাত্মিক বন্ধনমুক্তি অসম্ভব। ইতিপূর্ব্বে বহুলশঃ কথিত সংস্কারই চিত্তমল ও দ্বৈতবুদ্ধির কারণ বা বন্ধনের হেতু।

শক্তি-বা-অধিকারানুসারে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে প্রথমতঃ অশুভ সংস্কারগুলি ভস্মীভূত হইয়া চিত্তে হয় শুভ সংস্কারের আধান, বিদূরিত হয় চিত্তের জড়ত্ব, সঙ্কীর্ণ চিত্ত হয় বিস্তীর্ণ, চিত্তে হয় সমবেদন-দয়া ইত্যাদি সদ্বৃত্তিনিচয়ের স্ফুরণ, তৎপরে কামনার হয় হ্রাস, আত্মজ্ঞানের হয় বিস্তার ও চিত্তের সত্ত্বগুণ হয় বর্দ্ধিত। এইরূপ অবস্থায় কাম্যকর্ম্মের হয় ত্যাগ! এই কাম্যকর্ম্ম ত্যাগের নামই "সন্ন্যাস"।

পরমার্থসিদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন এই "সন্ন্যাস"। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ বা বিমল হইলে, কামনাবিলীন হইলে, আত্মজ্ঞানের পরিসর যথোচিত বর্দ্ধিত হইলে, হইয়া থাকে সন্ন্যাস। শুদ্ধচিত্ত বুঝিতে পারেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ, তাছাড়া পদার্থ নাই অন্য; রাগ-দ্বেষ মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত। এই অবস্থায় উপনীত সাধকের কোন বস্তু গ্রহণ করার প্রবৃত্তি থাকে না, কারণ তিনি তখন পূর্ণ, তিনি তখন সর্ব্বময়। সন্ন্যাসই যে পরম সাধন—ভাগ্যবান্ চিন্তাশীলই তাহা বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও শাস্ত্র সন্ন্যাসাধিকার দেন নাই কেন তাহাই চিন্তনীয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট সন্ন্যাস-সাধন অসম্ভব, অন্যের সাধ্য নহে। বর্ত্তমানে, সন্ন্যাসের প্রতি অনেকেরই অশ্রদ্ধা দেখা যায়, ব্রাহ্মণত্বের হ্রাসই তাহার কারণ। গৈরিক বসন পরিধানেই হয় না সন্ন্যাস, সন্ন্যাস দুঃসাধ্য সাধন।

"সন্ন্যাস" = সম্ + নি + ক্ষেপণার্থে (to throw) দিবাদিগণীয় √অস্ + ঘঞ্। সুতরাং "সন্ন্যাস" শব্দে সম্যগ্রূপে ত্যাগ; ত্যাগ = গ্রহণের বিরুদ্ধার্থক। ইতিপূর্ব্বে কথিত কর্ম্মমাত্রই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। জীব, হয় ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের গ্রহণ, না-হয় অনীপ্সিতরূপে স্থিরীকৃত পদার্থের ত্যাগ করার জন্য কর্ম্মে হয় প্রবৃত্ত। ত্যাগ কিংবা গ্রহণ ভিন্ন কর্ম্মের নাই রূপান্তর। পরিবর্ত্তন কথাটার মূল অর্থ বর্জ্জন-

পূর্ব্বক অবস্থান, একভাব ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবান্তরে গমন। কর্ম্মমাত্রই যখন ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, এবং সংসার যখন ত্যাগ-গ্রহণের লীলাভূমি, পরিবর্ত্তন যখন সংসারের স্বভাব, তখন নিখিল সাংসারিক বস্তুই ত্যাগ-শীল, সকলেই ন্যাস-বা-ত্যাগ করিয়া থাকে। সকলেই ত্যাগ করে বটে, কিন্তু অত্যল্প ব্যক্তিই "সন্ন্যাস" অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ। ত্যাগের কারণ দ্বিবিধ ; যাহা ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত হয়—যাহার অভাব-বোধ ও তদভাব পূরণের প্রয়োজন মনে করে, লোকে তাহাকে গ্রহণ করিতে, এবং যাহা হয় তদ্বিপরীত তাহাকে ত্যাগ করিতে সচেষ্ট। রাগ-ও-দ্বেষ (Attraction and Repulsion)-ই যথাক্রমে গ্রহণ-ও-ত্যাগের কারণ। রাগ (=কামনা-বাসনা)-এর কারণ রজোগুণ; আর দ্বেষ (=ঈর্ষ্যা, বিরাগ-বিদ্বেষ, বৈরভাব, ক্রোধ)—এর কারণ তমোগুণ। যাহার প্রকৃতি যত পরিচ্ছিন্ন, তাহার দ্বেষ্য পদার্থ তত অধিক। যেখানে মিথ্যাজ্ঞান, সেইখানেই রাগ-দ্বেষ বিদ্যমান্‌। আবার অপূর্ণ শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ ; অতএব সিদ্ধান্ত এই যে সঙ্কীর্ণ আত্ম-বুদ্ধিরই রাগ-দ্বেষ প্রবল। এবং রাগ-দ্বেষ উভয়ই বন্ধনের কারণ। তাই শ্রুতির উপদেশ-"সন্ন্যাস" পরমপুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন, সন্ন্যাস হইতে শ্রেয়ঃ সাধন আর নাই মুমুক্ষুর পক্ষে।

বন্ধন-মোচনের অধ্যাত্মবিজ্ঞান

অনন্ত শক্তিধারী ব্রহ্ম হইতে যে জগৎকার্য্য, তাহা ২৫টী তত্ত্বাত্মক বলিয়া ব'লেছেন ঋষিগণ। "তৎ"-শব্দে প্রাকৃতিকগুণাতীত পরব্রহ্ম ; "তত্ত্ব"-শব্দে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জীবশক্তি ও গুণাত্মক চরাচর বিশ্ব।

অথ ২৫টী তত্ত্ব :—১। মূলতত্ত্ব পুরুষ, ২। প্রকৃতি, ৩। মহৎ বা বুদ্ধি, ৪। অহং, ৫। মনঃ, ৬।৭।৮।৯।১০ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ১১।১২।১৩।১৪।১৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ১৬।১৭।১৮।১৯।২০ তন্মাত্র, ২১।২২।২৩।২৪।২৫ মহাভূত। এই ২৫টী তত্ত্বের তুলনায় আশ্রয়রূপী পরব্রহ্মকে বেদব্যাস বলেছেন "ষড়্‌বিংশ" অথবা "নিস্তত্ত্ব"।

পুরুষ-সমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্ষিতিপর্য্যন্ত তত্ত্বসকলের বিকাশবিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত উঃ উঃ ২য় ভাগ পৃঃ ৬৭ মনঃ ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পুরুষ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া, ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দস্পর্শাদি ৫টী তন্মাত্র স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া, তাহার সহিত অভিমান বৃত্তিদ্বারা হ'ন একতা-প্রাপ্ত। সুতরাং ১১-ইন্দ্রিয়সমন্বিত ৫-তন্মাত্রাত্মকরূপে তাঁহার একটী দেহ স্বকীয়রূপে হয় পরিকল্পিত ; তাহাতে অভিমান-বৃত্তিদ্বারা আত্মবুদ্ধি করিয়া, তিনি ঐ দেহরূপী হইয়া পান প্রকাশ—ইহাই তাঁহার "সূক্ষ্ম-শরীর" এবং **সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট পুরুষই "জীব"**। এই সূক্ষ্ম-শরীরের সর্ব্বাংশে পুরুষের সম্যক্ আত্মবুদ্ধি হওয়াতে, তিনি ঐ দেহের উপকরণরূপে স্থিত ইন্দ্রিয়সকলকে তাঁহার নিজের শক্তিমাত্র বলিয়া বোধ করেন ; এবং এই সকলশক্তিযুক্ত জীব নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া, তৎসাহায্যে বহিঃস্থিত ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক দেহে হ'ন প্রবিষ্ট। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হ'লে, তিনি স্থূলদেহধারী জীবরূপে পরিণত হ'ন এবং নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া, তজ্জনিত সংস্কারনিবন্ধন এক স্থূল দেহের অন্তে পুনরায় ঐ সংস্কারের উপযোগী অন্য স্থূলদেহ প্রাপ্ত হ'ন। এইরূপে জীবের সংসারে বারংবার ঘটিয়া থাকে যাতায়াত।

মূলতত্ত্ব (=পুরুষ) বাদে ২৪টী তত্ত্বের মধ্যে ৪টী অন্তঃকরণ-বৃত্তি ও ১৫টী বাহ্য-করণ বৃত্তি (=১০ ইন্দ্রিয়+৫ প্রাণ) এবং ৫টী তন্মাত্রা ; এই ১০টী ইন্দ্রিয়সাহায্যেই ঐ ৪টী অন্তঃকরণবৃত্তি স্থূলদেহকে স্বকীয়রূপে আশ্রয় করে এবং তদ্দ্বারা করে সকল কর্ম্ম। পুরুষের স্থূলদেহাবলম্বন-কার্য্যে অন্তঃকরণ বৃত্তিই তাঁহার প্রধান সহায়। ঐ সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ (=জীব) স্থূল দেহ-পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ-বৃত্তিই চালিত হয় প্রথমে।

[বিঃ দ্রঃ—"করণ"=যে যন্ত্র দিয়ে কর্ম্ম করা হয় তাহাই করণ অথবা "করণবৃত্তি" (বিশেষ-বিশেষ কর্ম্ম করার ইন্দ্রিয়)। অতএব

করণশব্দে বুঝায় ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি পঞ্চও করণবিশেষ। জীবের করণ দ্বিবিধ—অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ। অন্তঃকরণ ৪টী—মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার; আর বাহ্যকরণ ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণাদিপঞ্চ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তমোগুণ হইতে প্রাণাদিপঞ্চ। সত্ত্বগুণের করণ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকে **প্রকাশভাব**প্রধান, রজোগুণের করণ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকে **ক্রিয়াভাব** প্রধান এবং তমোগুণের করণ প্রাণাদিপঞ্চকে **ধৃতিভাব** প্রধান। ইতিপূর্ব্বে বহুলশঃ কথিত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়; তাই এখানে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যায়। প্রাণ বলিলে বহিরাগত বোধবিশেষের ধৃতিভাব বুঝায়; অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর স্পর্শ হইতে যে আভ্যন্তরিক বোধবিশেষ ফুটিয়া উঠে, সেই বোধের যাহা অধিষ্ঠান, তাহাকে ধরিয়া রাখাই প্রাণের কার্য্য; দৃষ্টান্তে তৃষ্ণায় জলপান—এখানে জলরূপ বাহ্যবস্তুর সহিত কণ্ঠনালী প্রভৃতির সংস্পর্শ বশতঃ তৃষ্ণা নিবৃত্তিরূপ একটা বোধ ফুটিয়া উঠে; যে শক্তি এই বোধ-টাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই (১) প্রাণ। শরীরস্থ মলাপনয়নের যে শক্তি তাহার যে অধিষ্ঠান, তাকে ধরিয়া রাখে (২) অপান; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার যে শক্তি তাহার যে অধিষ্ঠান তাকে ধরিয়া রাখে (৩) ব্যান; এইরূপ শরীরস্থ রসরক্তাদি ধাতুগত যে আভ্যন্তরিক বোধ তাহাকে ধরিয়া রাখে (৪) উদান এবং অন্ন-পানীয়াদি দ্বারা শরীর গঠন করার যে শক্তি, তাহার অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখে সমান বায়ু। এই পঞ্চবিধ ধৃতি শক্তি দ্বারাই জীবের স্থূলশরীর হয় গঠিত, স্থিত ও লয়প্রাপ্ত। আবার উহারা যখন প্রতিলোমভাবে করে ক্রিয়া, তখনই হয় স্থূলশরীরের লোপ। এই পঞ্চপ্রাণশক্তিই প্রাণময় কোষের যথার্থ স্বরূপ। সাধারণতঃ ইহারা বায়ুরূপেই পরিচিত; বাস্তবিক কিন্তু বায়ু ইহাদের অতি স্থূলরূপ। গতিই (motion)ইহাদের আসল রূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় এই প্রাণাদি পঞ্চও অহংতত্ত্বেরই—বিভিন্ন স্ফুরণ।] পরন্তু

অহংতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত সমন্বিত না হইয়া, মনেরও নাই কোন কার্য্যসামর্থ্য। মহত্তত্ত্ব (= বুদ্ধিতত্ত্ব) + অহংতত্ত্ব + ১১ তত্ত্ব বা ইন্দ্রিয় (মনঃ + ১০ ইন্দ্রিয়) + ৫ তন্মাত্র + ৫ মহাভূত = ২৩টী তত্ত্বকে সমষ্টিভাবে দেহস্বরূপ করিয়া যে পুরুষ বিরাজমান তিনিই ব্রহ্মা = হিরণ্যগর্ভ = মহাবিরাট = বিদ্যাসৃষ্টি। ইনিই প্রকাশিত সৃষ্টির প্রথম পুরুষ। বিদ্যাসৃষ্টি-নামের কারণ এই যে হিরণ্যগর্ভপুরুষ অভিমানাত্মক ধর্ম্মের অতীত এবং বুদ্ধিরূপ দেহে তাঁহার নাই অহংবুদ্ধি। আর সৃষ্টিপ্রকাশের পূর্ব্বে ঐ ২২টী তত্ত্ব অপ্রকাশিতভাবে লীন থাকে হিরণ্যগর্ভপুরুষে। অণ্ডমধ্যে যেমন অপ্রকাশিতভাবে থাকে জীবদেহ, কালে পরিপক্ক হইলে, তন্মধ্য হইতে প্রকাশিত হয় জীবদেহ, তেমন বুদ্ধিরূপ অণ্ড হইতে অভিমানাত্মক ২২-তত্ত্বরূপে জগৎ হয় প্রকাশিত। এই নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভপুরুষের দেহরূপে অবস্থিত সমষ্টিকৃত, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ২৩-তত্ত্বকে বলে ব্রহ্মাণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত ২৩টী তত্ত্বে অসংখ্য বিমিশ্রণের দ্বারা অনন্তরূপী এই জগৎ প্রকাশিত; সুতরাং দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই ন্যূনাধিক-পরিমাণে এই সমস্ত তত্ত্বই আছে নিহিত। দ্রষ্টা পুরুষও আছেন অনুপ্রবিষ্ট প্রত্যেক বস্তুতে; সুতরাং সকলই জীব; পরন্তু আত্মবোধে যে বিশেষ পিণ্ডকে অবলম্বন করিয়া কোন পুরুষ হ'ন প্রকাশিত, সেই বিশেষ পিণ্ডকে তাঁহার দেহ বলা যায় এবং সেই পিণ্ডাশ্রিত পুরুষকে বলা যায় দেহী, আর সেই পুরুষের ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে যে প্রধানতঃ পঞ্চমহাভূতাত্মক অপর দেহপিণ্ডসকল আছে বর্ত্তমান, তাহাদিগকে বলা হয় সেই পুরুষের সম্বন্ধে ভোগ্য বা দৃশ্য। যখন এই সকল বহিঃস্থ বিশেষ বিশেষ তত্ত্বসমষ্টিরূপপিণ্ড কোন পুরুষের কেবল দৃশ্য-ভোগ্যরূপে পরিজ্ঞাত হয়, তখন দৃশ্য-ভোগ্যকে বলা হয় জড়। ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যাংশের সহিত একত্র যখন ইহারা জ্ঞানগম্য হয়, তখন ইহারা জীব বলিয়া জানা যায়। যেমন,

একজন মানুষের স্বরূপ বিশেষরূপে তন্ন-তন্ন করিয়া বিচারে দেখা যায় যে, সে কোন বিশেষ বিশেষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বিশিষ্ট, ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক ১১-ইন্দ্রিয়সমন্বিত, (অহং) অভিমান-বৃত্তি ও-বুদ্ধিবিশিস্ট একটা চৈতন্যশীল পদার্থ; তন্মধ্যে ক্ষিতি-অপ্‌-তেজঃ মরুৎ-ব্যোমাত্মক যে অংশটা, তাহাতেও আছে তাহার আত্ম-বুদ্ধি, ইহাই তাহার ভোগায়তন দেহরূপে হয় কল্পিত ; ইহাকে বলা যায় **"স্থূলদেহ"** ; মৃত্যুতে এইটা মাত্র হয় বিচ্ছিন্ন, অপর সবই থাকে। অবশিস্ট যে বুদ্ধি, অহঙ্কার, ১১ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি তাহা তন্নিহিত চৈতন্যময় পুরুষের তখন বহির্দেহরূপে হয় কল্পিত। এই ১৮-তত্ত্ব-সমন্বিত যে জীবদেহ, তাহাকে জীবের **"সূক্ষ্মশরীর"** বলে : এবং যখন ঐ সূক্ষ্মশরীরও প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়কালে অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, অব্যক্তভাব ধারণ করে, তখন জীব-চৈতন্য কেবল গুণত্রয়ের অব্যক্তাবস্থারূপ প্রকৃতিতত্ত্বে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন এই অব্যক্তা প্রকৃতিই জীবের দেহরূপে হয় কল্পিত ; ইহাকেই বলে জীবের **"কারণদেহ"**। কিন্তু এই ত্রিবিধ দেহ-সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, "স্থূল দেহ"-সমন্বিত হইয়াই জীব বিশেষরূপে জাগতিক বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষ ও ভোগ করেন, "সূক্ষ্মদেহ" তদ্রূপ ভোগোপযোগী নহে ; এবং "কারণ-দেহে" সমস্ত অপ্রকাশ থাকাতে, তাহাতে হয় না কোন প্রকার ভোগ। একজন জীব যখন তাহার স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধি যুক্ত হইয়া থাকে তখন অপর স্থূলদেহ সকল সাধারণতঃ তাহার দৃশ্য এবং ভোগ্যরূপে মাত্র হয় প্রতিভাত ; সুতরাং তাহাদিগকে মনে করে জড়। কিন্তু সেই সকল দেহেও পুনরায় দৃক্‌শক্তি (= পুরুষ) আছেন বর্ত্তমান, অতএব দৃক্‌শক্তি-সমন্বিত বলিয়া, যখন সেই সব দেহকে দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে জড় না বলিয়া, জীবই বলা হয়। পরন্তু যে সত্ত্বগুণাত্মক বুদ্ধিতত্ত্বকে জ্ঞানমাত্র বলিযা বর্ণনা করা হয়, তাহার অংশ সকলপ্রকার দেহে সমান নহে ; যে দেহে যে-পরিমাণে

সত্ত্বাংশ অধিক, সেই দেহবিশিষ্ট জীব সেই পরিমাণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন দেহে এই জ্ঞানাংশ এত অল্প পরিমাণে বিমিশ্রিত যে, সাধারণতঃ তন্মধ্যে জ্ঞান আছে বলিয়াই বোধ হয় না; এই সকল বস্তু সচরাচর কেবল জড়বস্তু বলিয়াই পরিচিত; পরন্তু ইহাদের মধ্যেও ক্ষীণভাবে অস্ফুটরূপে জ্ঞানাংশ আছে নিহিত। সুতরাং তাহারাও **প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব।**

অধ্যাত্মবিজ্ঞানে ব্যষ্টি-সমষ্টি

পূর্ব্বোক্ত ২৩টী তত্ত্বগুলির যে বিমিশ্রণ, তাহা ঘটে সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে; যেমন—মনুষ্যদেহের প্রতিটী রক্তবিন্দু, প্রতিটী মাংসকণিকা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিটী জীবকোষ হয় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবের **ব্যষ্টি দেহ**; এই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যষ্টি জীব মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আবার ইহাদেরই দেহসমষ্টি একত্র মনুষ্যস্বরূপ একটী মনুষ্যের তথা বৃহৎ জীবের দেহরূপে পরিগণিত। সারা বিশ্বও গঠিত এইরূপ দ্বিবিধ-সম্মিলনে। পৃথিবীস্থ প্রতিটী ধূলিকণা স্বতন্ত্র, আবার তৎসমস্ত একত্র একটি বস্তু—পৃথিবী, ধূলিকণাগুলি পৃথিবীর অঙ্গমাত্র। অতএব ব্যষ্টিভাবে তত্ত্বগুলির বিমিশ্রণে যেমন অসংখ্য পদার্থের প্রকাশ, সমষ্টিভাবে সম্মিলনেও অসংখ্য পদার্থ রচিত। পূর্ব্বকথিত ২২টী (অহং + ২১টী) তত্ত্বসম্মিলনে জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত এবং ইহা বুদ্ধিতত্ত্ব-বা-মহত্তত্ত্ব সমন্বিত হইলে (২৩টী) ইহাকে বলে "ব্রহ্মাণ্ড"। অতএব তত্ত্বগুলির সম্মিলন সমষ্টিভাবেও অসংখ্য হওয়াতে এবং বুদ্ধি সেইগুলির সহিত সমন্বিত হওয়াতে, ব্রহ্মাণ্ডও অসংখ্য। এইরূপ যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এই পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রাণী, তাহা বিভক্ত ত্রিবিধ স্তরে; এই প্রত্যেক স্তরকে বলে এক একটী লোক। তন্মধ্যে ১ম স্তরস্থ সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্ত লোকগুলিকে বলে স্বর্লোক বা স্বর্গ; সত্ত্বগুণের উত্তরোত্তর আধিক্যক্রমে স্বর্গলোকের উপকল্পিত স্তর ৫টী, তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্তরের নাম বিশেষরূপে স্বর্লোক, এবং তদুপরিস্থিত লোকগুলির

নাম ক্রমশঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। মহর্লোক প্রজাপতি-লোক এবং শেষোক্ত ৩টী একত্রে ব্রহ্মলোক। যাঁরা এই সকল স্বর্গলোকে থাকেন তাঁরা উচ্চশ্রেণীর দেবতা। ২য়-স্তরস্থ ভুবর্লোকেও (=অন্তরীক্ষে) থাকেন দেবতা-ঋষি-গন্ধর্ব্ব ভূত-প্রেত-পিশাচাদি নামক প্রাণী। ৩য় স্তরস্থ ভূর্লোক=সপ্তপাতাল+সপ্তনরক যেখানে থাকে মর্ত্ত্যমানব ও অপর-বিধ দেবতা, দৈত্য-দানব-নাগেন্দ্র এবং পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গ। সূর্য্যকিরণ দ্বারা যে পর্য্যন্তস্থান আলোকিত হয় তাহাই ভূর্লোক। সত্ত্ব-প্রধান জীবকে বলে দেবতা, রজঃপ্রধান জীবকে বলে অসুর এবং তমো-প্রধান জীবকে বলে রাক্ষস, পিশাচ ইত্যাদি। এই ত্রিবিধভাবসম্পন্ন লোকই আছে মনুষ্যের মধ্যে। দেবভাবাপন্ন সত্ত্বপ্রধান লোকের স্বাভাবিক গুণ—সংযম (=অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, তিতিক্ষা, তপস্যা, সত্যভাষণ, দয়া, তুষ্টি, বৈরাগ্য, দান, সরলতা, বিনয় ও আত্মরতি। রজঃপ্রধান লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—তীব্র বিষয়বাসনা, বিষয়লাভের জন্যই পূজা, দর্প, যুদ্ধোৎসাহ, যশোলিপ্সা, স্তুতিপ্রিয়তা ইত্যাদি। তমঃ-প্রধান লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা ব্যবহার, হিংসা, যাচ্ঞাবৃত্তি, বঞ্চনা, কলহ, শোক, মোহ, আলস্য, দৈন্য, ভয় ইত্যাদি। সুতরাং মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়াতে, তাদের উন্নতির নিমিত্ত আচরণীয় ধর্ম্মসকলও পৃথক্ পৃথক্। আর্য্যঋষি সকল শ্রেণীর লোকের উপযুক্তধর্ম্মই পৃথক্ পৃথক্ রূপেই উপদেশ করিয়াছেন। এই সব ধর্ম্ম আচরণ করিয়া লোক যেরূপ অবস্থা লাভ করে, তদনুসারে মৃত্যুর পরে পরলোকে হয় তাঁদের গতিলাভ।

উপরি উক্ত ভূর্ভুবস্বর্লোকের বাসিন্দা-দেবতারা ১১ শ্রেণীতে বিভক্ত ; ১১ ইন্দ্রিয়ের স্থিতিকারিণী দেবতা—ইন্দ্রিয়ের উপর অধিষ্ঠাত্রীত্ব বা কর্ত্তৃত্ব করেন ; যে দেবতা যে ইন্দ্রিয়ের উপর অধিষ্ঠান বা স্থিতি করেন তাঁহাকে সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা* বলে ; ১১টা ইন্দ্রিয় × ৩ লোক = ৩৩ যে দেবতা সংখ্যা—ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন

ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যোপযোগী মূর্ত্তি। প্রথমে মহাভূত আকাশ হয় সৃষ্ট এবং শব্দ তন্মাত্র ইহার গুণ বা শক্তি। কিন্তু মূলতত্ত্ব পুরুষ (=দ্রষ্টা বা দৃক্‌শক্তি) ইহাতেও আছেন অনুপ্রবিষ্ট, সুতরাং শব্দ-গুণাত্মক আকাশ ঐ পুরুষের দেহরূপে হয় কল্পিত; আকাশরূপদেহ-ধারী "পুরুষকে" শাস্ত্র বলিলেন "দিক্"। শব্দগুণ গ্রহণ করার জন্যই এই দিক্‌-নামক দেবতার শ্রোত্র (=কর্ণ) নামক ১ম্ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্বভাবতঃ ক্রমবিকাশ। এই শ্রোত্রেন্দ্রিয় **"অধ্যাত্ম"**, ইহার বিষয় শব্দ **"অধিভূত"**, এবং যৎকর্ত্তৃক শ্রোত্রেন্দ্রিয় হয় উদ্বুদ্ধ সেই দিক্‌-নামক দেবতা তাঁকে বলা হয় **"অধিদৈব"**। এইরূপ মরুৎ-নামক মহাভূতের শক্তি বা গুণ বা প্রকাশিত ভাব=স্পর্শ; এই স্পর্শগুণবিশিষ্ট পুরুষকে বলা হয় "বায়ু" অথবা "বিদ্যুৎ" দেবতা; যখন মরুৎ জ্ঞাত হ'ন দৃশ্যরূপেমাত্র তখন তাঁকে জড় ২য় মহাভূত বলা হয়, কিন্তু তাহাতেও আছে দৃক্‌শক্তির অধিষ্ঠান; অতএব তিনিও জীব (দেবতা)। এই "বায়ু" বা "বিদ্যুৎ"-নামক দেবতার স্পর্শশক্তি গ্রহণ জন্য ত্বক্‌ নামে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশ। আবার এইরূপে চক্ষুঃ অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, এবং তেজোরূপদেহবিশিষ্ট "সূর্য্য"-নামক দেবতা অধিদৈব। রসনা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত এবং বরুণ অধিদৈব। এইরূপে পুনরায় "বাক্" নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "বহ্নি", অতএব বাক্‌ অধ্যাত্ম, বহ্নি অধিদৈব, বাক্য অধিভূত, পাণি অধ্যাত্ম, ইন্দ্র অধিদৈব, গ্রাহ্য অধিভূত, পায়ু অধ্যাত্ম, উপেন্দ্র অধিদৈব বর্জ্জনীয় অধিভূত; পাদ অধ্যাত্ম মিত্র অধিদৈব, গন্তব্য অধিভূত; উপস্থ অধ্যাত্ম প্রজাপতি অধিদৈব আনন্দ অধিভূত। এই পঞ্চদেবতা বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্দীপক ও অধিষ্ঠাত্রী। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম চন্দ্রমা, মন অধ্যাত্ম। এই ১১শ দেবতা বেদে বিশেষরূপে বলা হ'য়েছে। ইঁহারা যে সকল পিণ্ডে বিশেষরূপে অধিষ্ঠান করিয়া, স্বীয়-স্বীয় বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁদের নামানুসারে সেই সকল পিণ্ডেরও নামকরণ হয়।

—ঃ ইন্দ্রিয় তালিকা ঃ—

	অধ্যাত্ম	অধিদৈব	অধিভূত
	মনঃ	চন্দ্রমা	মন্তব্য
জ্ঞানেন্দ্রিয় :—	১। শ্রোত্রেন্দ্রিয় কর্ণ	দিক্	শব্দ
	২। ত্বগিন্দ্রিয় ত্বক্	বায়ু বিদ্যুৎ	স্পর্শ
	৩। দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুঃ	সূর্য্য	রূপ
	৪। স্বাদেন্দ্রিয় রসনা	বরুণ	রস
	৫। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা	অশ্বিনীকুমার	গন্ধ
কর্ম্মেন্দ্রিয় :—	১। বাক্	বহ্নি	বাক্য
	২। পাণি	ইন্দ্র	গ্রাহ্য
	৩। পায়ু	উপেন্দ্র	বর্জ্জনীয়
	৪। পাদ	মিত্র	গন্তব্য
	৫। উপস্থ	প্রজাপতি	আনন্দ

তদূর্দ্ধে অহংকারাত্মক মূল প্রজাপতি লোকসকল এবং তদুপরি জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মলোক সকল। পরন্তু প্রত্যেক জীবদেহে মহদাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বই আছে নিবিষ্ট; সুতরাং উক্ত তত্ত্বরূপ দেহাভিমানী দেবতাসকলেরও অংশ প্রতিষ্ঠিত আছে প্রতিটী জীবদেহে। বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও বিশেষ বিশেষ কর্ম্মদ্বারা উক্ত বিশেষ বিশেষ দেবতাংশের শক্তি হয় বর্দ্ধিত এবং তন্নিমিত্ত তদ্বারা উক্ত তত্ত্বাধিষ্ঠিত দেবতা সকল আকৃষ্ট হইয়া, সাধকের নানাবিধ অলৌকিক শক্তি করিয়া দেন বর্দ্ধিত। পরন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ইঁহারা সাধারণ দেবতারূপে নহেন গণ্য ; ইঁহারা অপর দেবতার তুলনায় ঈশ্বর বলিয়া হ'ন কথিত। নির্ম্মল বিজ্ঞানময় যে বুদ্ধিতত্ত্ব তাহাতেই ইঁহাদের অবস্থিতি ; বুদ্ধিতত্ত্বের সত্ত্বাংশে বিষ্ণু, রাজসাংশে ব্রহ্মা, তামসাংশে শিব।

যে প্রণালীতে হয় সৃষ্টি, কালক্রমে সেই প্রণালীতেই হয় প্রলয়। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ যেমন স্বীয়গুণসকল চালিত করিয়া, বিচিত্র বিশ্ব

রচনাপূর্ব্বক তাহার প্রত্যেক অংশটা পৃথক্-পৃথক্‌রূপে তাঁহার জীবশক্তির উপভোগযোগ্য করেন, তেমন আবার কালক্রমে গুণসকল সম্যক্ আহরণ-পূর্ব্বক আপনাতে লীন করিয়া, নিজ স্বরূপানন্দও উপভোগ করাইয়া থাকেন। সৃষ্টির বিস্তার, পালন ও সংহার তাঁহার লীলাস্বরূপ ; এই লীলা তাঁর প্রকৃতিগত ; সুতরাং সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে ও পুনরায় লয় প্রাপ্ত হইতেছে তাঁহাতেই। ইহাতে তাঁহার নাই কেহ নিয়ন্তা। এই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ক্রিয়ারূপ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া, তাঁহাকেই বলা হয় **কাল।** সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ও কলিযুগব্যাপী কাল, যাহা প্রায় ৪৩ লক্ষ বৎসরে হয় পূর্ণ, তাকে বলে ১ মহাযুগ ; এইরূপ সহস্রযুগ-ব্যাপক কালের নাম কল্প। এই এক কল্পকাল ব্রহ্মার একদিন বলিয়া গণ্য হয় এবং পুনরায় এক কল্প তাঁহার রাত্রি। এইরূপ দিবা ও রাত্রিকে একদিন গণনা করিয়া, ৩৬০ দিনে ব্রহ্মার হয় এক বৎসর। এইরূপ **দ্বিপরার্দ্ধ** (=লক্ষ কোটী কোটী) বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার দিবাবসানে অহংতত্ত্ব হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাতে হয় লয়প্রাপ্ত। তিনি অব্যক্তা প্রকৃতিতে থাকেন শয়ান। পুনরায় তাঁহার রাত্র্যবসানে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং প্রকাশিত হ'ন ও সমুদয় জগৎ করেন প্রকাশিত। ব্রহ্মার পরমায়ুঃ শেষ হ'লে, তিনি একেবারে পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হ'ন এবং তৎসহ তদঙ্গীভূত ব্রহ্মাণ্ডও লাভ করে ব্রহ্মরূপতা। পরন্তু ব্রহ্মের সগুণত্ব নিত্য ; সুতরাং সৃষ্টিপ্রকাশিনীশক্তিও নিত্য ও অনন্ত। মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য।

কর্ম্ম করিয়া সর্ব্ববিধ কারণস্থানাঘ শক্তিই হয় অবসন্ন ; সর্ব্বজীব দিনে কর্ম্ম করিয়া রাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় নিদ্রা ; কালে আবার উদ্বুদ্ধ হইয়া রজোগুণের ক্রিয়াশক্তিতে করে কর্ম্ম। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাও রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি করিয়া অবশেষে হ'ন শিথিলপ্রযত্ন ও নিদ্রাদ্বারা হ'ন অভিভূত। ব্রহ্মা সুষুপ্ত হইলে, তাঁহাতে অপর সকল জীব আশ্রয়

লয় ও তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা নিদ্রিত হইলে, তিনি লীন হ'ন প্রকৃতিতে; এই প্রকৃতিলীনাবস্থাই তাঁহার নিদ্রা। এই অবস্থায় প্রকাশাত্মক জগৎ অহংতত্ত্বের সহিত হইয়া যায় অপ্রকাশিত। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা প্রকৃতিলীনাবস্থায় আসিলে, কেবল দৃক্শক্তিরূপে তিনি থাকেন; গুণসকলও তখন ঐ দৃক্শক্তিতে লীন হইয়া অপ্রকাশ অবস্থায় যান। কিন্তু গুণসকলকে পৃথকরূপে দেখিবার জন্য, ব্রহ্মার তদবস্থায় একপ্রকার উন্মুখতা থাকে। সাধারণ নিদ্রিতজীবেরও এই অবস্থা; নিদ্রিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অপ্রকট হইয়া, নিদ্রিত পুরুষের কেবল এক অস্ফুট জ্ঞানমাত্র-স্বরূপে লীন হইয়া, তাঁহার সহিত প্রাপ্ত হয় একতা; কিন্তু ইহারা একেবারে হয় না বিনষ্ট; নিদ্রিত পুরুষের জাগরণের জন্য থাকে উন্মুখতা; **ঐ উন্মুখতাই রজোগুণ**; নিদ্রিত পুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি লয়প্রাপ্ত হইলেও এই রজোগুণ পুনরায় প্রকাশিত হইবার জন্য অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া স্বীয় বলসঞ্চয় করিতে থাকে। এইরূপে যখন রজোগুণের বল হয় অধিক, তখনই নিদ্রিত পুরুষ হয় জাগরিত এবং তাহার ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমে হয় উদ্বুদ্ধ। ব্রহ্মার সম্বন্ধেও তদ্রূপ, তাঁহার প্রকৃতিলীনাবস্থায় রজোগুণও হয় প্রশান্ত; কিন্তুএই রজোগুণের বীজভাব লুপ্ত হয় না; সুতরাং তিনি পুনরায় কালক্রমে হ'ন উদ্বুদ্ধ এবং তাঁহার রজোগুণ অঙ্কুরিত হইয়া জগৎ-রচনা কার্য্যে হয় প্রবর্ত্তিত।

শাস্ত্র বলেন—২৫টী তত্ত্বাত্মক এই জগৎ সমষ্টিভাবে ৪ প্রকার প্রভেদযুক্ত। যথা (I) "বিশ্ব" = ১১টী ইন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্র ও ৫ মহাভূত এই ২১টী তত্ত্ব-সমন্বিত সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে প্রকটিত জগৎ—এইটাই প্রকাশিত ১ম্ অবস্থা; এবং তন্নিষ্ঠ পুরুষ বিশ্ব ও বিরাট্ নামেখ্যাত; ইহা জগতের সম্যক্ প্রকাশিত অবস্থা, তাই এই "বিশ্বকে" ও "তন্নিষ্ঠ পুরুষকে" বলে জাগ্রৎ। (II) "তৈজস"—অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ, অহংতত্ত্বই এই ২১টী তত্ত্বের উৎপত্তিস্থান, অহংতত্ত্বে অতি প্রবল রজোগুণ, সুতরাং অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ সর্ব্বদাই সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে

ইচ্ছুক ও উন্মুখ ; কিন্তু জাগ্রৎ-স্থানীয় বিশ্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত তত্ত্ব যখন হয় নাই রচিত, তখন অহংতত্ত্ব পুরুষের থাকে কেবল ঐ উন্মুখতামাত্র ; এই অবস্থাকে তাই বলা হ'য়েছে "স্বপ্ন-স্থানীয়" । কোন ব্যক্তি নিদ্রিত হইলে, প্রথমে সে দেখে স্বপ্ন, তখন সে জাগ্রৎ কালের ন্যায় বুঝতে পারে না বিষয়গুলি, অথচ সম্যক্ সুষুপ্তি না হওয়ায় একদা বিষয়-বোধেচ্ছারও হয় না লোপ, সুতরাং স্বপ্নরূপে দেখে সে বিষয়ের আভাসগুলি। এইরূপে যেহেতু তখন বিশ্ব হয় নাই প্রকাশিত, এবং যদিও তাহা প্রকাশ করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা আছে বর্ত্তমান অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের তথাপি সম্যক বোধগম্য হয় না বিশ্ব ! তাইই অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষকে বলা হয়, "তৈজস" ও অহংতত্ত্বকে বলা হয় জগতের স্বপ্নাবস্থা। (III) "প্রাজ্ঞ"—এইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধিতত্ত্বকে বলা হয় জগতের "সুষুপ্তি" অবস্থা, এবং তন্নিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষকে বলা হয় "প্রাজ্ঞ" ; সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত তাই প্রাজ্ঞ এবং প্রজ্ঞা তাঁহার স্বাভাবিক লক্ষণ। সাধনবলে সাধক এই প্রজ্ঞাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাঁহাকেও বলা যায় "প্রাজ্ঞ"। সাত্ত্বিক মনুষ্য সুষুপ্তিকালে এই প্রজ্ঞা-ভূমিকে স্পর্শ করিয়া পৌছান সত্যে ; কিন্তু এখানে পাবেন না প্রতিষ্ঠিত হ'তে ; জাগ্রৎ হ'লেই হ'ন বিচ্যুত। কিন্তু সাধনসম্পন্ন যোগী বিষয় বাসনা সম্যক্ ত্যাগ করিয়া, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে আহরণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্রস্বরূপে হ'ন প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই প্রজ্ঞাভূমি যোগীর সম্যক্ আয়ত্তে; সুষুপ্তিদশার লোকের ন্যায় প্রজ্ঞাভূমি তাঁহার অনায়ত্তে থাকে না ; ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি তাঁহাকে (যোগীকে) দিতে পারে না কোন ক্লেশ ; সুতরাং চিত্ত তাঁর থাকে প্রসন্ন ; এই অবস্থাতেই যোগী "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ইত্যাদি গীতাবাক্যের হ'ন বিষয়ীভূত। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকৃতি-লীনাবস্থা, বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ—এই তিন অবস্থার অতীত ; এই লীনাবস্থায় গুণসকল লীন হয় দৃক্‌শক্তিতে অর্থাৎ দৃক্‌শক্তিতে

গুণসকলের লীন হওয়ার অবস্থাকে বলে ।IV) **"তুরীয়"** (=চতুর্থ)। এই তুরীয়াবস্থাকে প্রকৃতি-অবস্থাও বলা যায়, পুরুষাবস্থাও বলা যায়। কারণ, গুণত্রয় এই অবস্থায় একদা যুগপৎ বিনষ্ট হয় না, অপ্রকট ও বীজ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, তাই ইহাকে প্রকৃতি-অবস্থা বলা যেতে পারে ; আবার তৎকালেও দৃক্‌শক্তির (=পুরুষের) হয় না অভাব, তাই ইহাকে পুরুষাবস্থাও বলা যেতে পারে। যেহেতু তখন থাকে না আর দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় সেহেতু পুরুষের দ্বৈতভাব (যাহা ক্লেশের মূল) তখন থাকে অপ্রকাশিত। পুরুষের সহিত বীজভাবাপন্ন গুণসকল হইয়া থাকে একীভূত ; সুতরাং এই তুরীয় অবস্থাকে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয় নামই দেয়া যায়। তাই গীতার ৭ম্ অধ্যায়ে ৪।৫ মন্ত্রে জীব ও গুণাত্মক জগৎ এই উভয়কেই একবার প্রকৃতি বলিয়া পুনরায় ১৫শ অঃ১৬শ্লোকে উভয়কেই পুরুষ বলা হ'য়েছে। সাংখ্যও প্রথমতঃ পুরুষ ও প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া, পরে শেষ মীমাংসায় বন্ধ প্রকৃতিরই থাকা এবং প্রকৃতিই আপনি আপনাকে বন্ধ হইতে মুক্ত করা স্বীকার করিয়া জীব ও প্রকৃতির মূলতঃ অভিন্নভাই প্রকারান্তরে দেখিয়াছেন। সূক্ষ্মদেহের প্রাকৃতিক উপাদান গুলির পরব্রহ্মরূপতা লাভই যথার্থ **মুক্তি** ; যখন এই ব্রহ্মরূপতা লাভ হয়, তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য যায় ঘুচে : সুতরা পুরুষ ও প্রকৃতি বলিয়া ভেদযুক্ত আর কিছু থাকে না।

আরও, জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়-ভেদশূন্য জ্ঞান-বা-চিৎশক্তিই = চেতনা ; এই চেতনা স্থূলে নামরূপ আকারে পরিব্যক্ত, সূক্ষ্মে বিরাজিত প্রাণশক্তিরূপে এবং কারণে অবস্থিত অব্যক্ত বীজরূপে। এই স্থূলাভিমানী চৈতন্যই **"বিশ্ব"**, সূক্ষ্মাভিমানী চৈতন্যই **"তৈজস"** এবং কারণাভিমানী চৈতন্যই **"প্রাজ্ঞ"**। সর্ব্বশেষে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ অবাঙ্‌মনোগোচর সেই নিত্য-নিরঞ্জন স্বরূপ পরমানন্দময় পরমাত্মক্ষেত্রই **তুরীয়**—চতুর্থাবস্থা !!

আবার ইতিপূর্ব্বে কথিত—জীব যেমন সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতত্ত্বলাভ করিয়াও, জাগরিত হইলে তাহা হইতে হয় বিচ্যুত, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাও তেমন শয়নাবস্থায় প্রকৃতিতত্ত্বাশ্রয়ে থাকেন এবং তদবস্থায় তাঁহার সর্ব্ববিধ ভেদবুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং তিনি তৎকালে আনন্দময় অবস্থায় আসেন। সুষুপ্তিকালে যেমন বৃত্তিসকল অবাধে সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত হইয়া সুষুপ্ত জীবকে দেয় আনন্দ এবং জাগরিত হইয়া জীব অনুভব করেন সুষুপ্তির আনন্দ, তেমন, ব্রহ্মারও শয়নাবস্থায় লুপ্ত হয় ক্লেশোৎপাদক ভেদবুদ্ধি, তাই তিনি লাভ করেন পরমানন্দময়তা। কিন্তু জাগ্রৎ হইলে, তিনি এই অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া উদ্বোধিত হয়েন, এবং পুনঃ সৃষ্টিকার্য্য রচনা করিতে হ'ন প্রবৃত্ত। সুতরাং শয়নকালে তিনি যে আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন, তাহা তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। পরন্তু সাধকপুরুষ প্রজ্ঞাভূমিতে পূর্ব্বোল্লিখিতবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট সাধন অবলম্বনে সম্যক্ সমাধিনিষ্ঠ হইয়া, ঐ পূর্ণানন্দময়তা সম্যক্ আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হ'ন এবং অবশেষে তাঁহারা পুরুষরূপে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরব্রহ্মের সহিত একীভূতভাবপ্রাপ্ত হন। ইহাকেই বলে **"কেবল"** অথবা **মুক্তাবস্থা**। এই অবস্থা লব্ধ হইলে আর তাহা হইতে বিচ্যুত হ'ন না তাঁহারা, সুতরাং গুণকার্য্যে আর আবদ্ধ হ'ন না।

পরব্রহ্মের সহিত ভেদবুদ্ধিবিরহিত হইয়া চিত্ত সম্যক্ নির্ম্মল হইলে পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার ঘটে ; ইহাই পরমমোক্ষ। জগতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও পরব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, এই মোক্ষলাভার্থ যে সাধন, তাহাই **ব্রহ্মবিদ্যা**। এই সাধন বিভিন্ন প্রকার হ'লেও সাধারণতঃ ইহাকে ত্রিবিধভাবে ভাগ করিয়া হয় ব্যাখ্যাত যথা, (১) জীবাত্মাকে (অর্থাৎ সাধক ব্যক্তি আপনাকে) জগদতীত পরব্রহ্মরূপে চিন্তা করা ব্রহ্মবিদ্যার ১ম্ অঙ্গ ; কেহ কেহ এই একটীমাত্র অঙ্গ ধরিয়া সাধনে হ'ন প্রবৃত্ত ; তাঁরাই জ্ঞানযোগী ; দৃশ্য জড়বর্গ হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিয়া,

আত্মায় নির্ম্মল নির্গুণস্বরূপ ধ্যানই জ্ঞানযোগ। (২) সমগ্র জগৎকে পরব্রহ্মরূপে ধ্যান ব্রহ্মবিদ্যার ২য় অঙ্গ ; এই সাধনে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত ব্রহ্মের প্রধান প্রধান বিভূতিসকল অবলম্বনে ধ্যান প্রবর্ত্তিত করিতে হয়,যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, আকাশ, মনঃ, প্রভৃতি অবলম্বনে তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতি গুণ সমাধান করিয়া, প্রবর্ত্তিত করিতে হয় ধ্যান। ভগবদবতারমূর্ত্তির ধ্যান প্রভৃতিও এই অঙ্গের অন্তর্ভূত।

(৩) জীব ও জড়বর্গ এতদুভয়াতীতরূপে পরব্রহ্মের ধ্যান—ব্রহ্মবিদ্যার ৩য় অঙ্গ ; প্রথমোক্ত দুই অঙ্গের সাধন স্থিরতা প্রাপ্ত হ'লেই, এই ৩য় অঙ্গের সাধন সম্যক্ হয় প্রবর্ত্তিত। এই ত্রিবিধ অঙ্গই পূর্ণভক্তিযোগের অন্তর্গত। বস্তুতঃ সূক্ষ্মশব্দই অহংতত্ত্বের প্রথম তামসিক বিকার ও বাহ্য-জগতের সূক্ষ্মতম অবস্থা ; সুতরাং দৃশ্যজগৎ অতিক্রম করিতে হইলে শব্দাবলম্বনই অতিশয় উপযোগী।

পরব্রহ্ম জগৎ-ও-জীবরূপী হইয়াও এতদুভয়ের অতীত, এবং এতদুভয়ের নিয়ন্তা ও আশ্রয় হইয়াও নিষ্ক্রিয় এবং একান্তাদ্বৈত। পরব্রহ্ম যেমন নির্গুণ ও সগুণ এই দুই অবস্থায়ই নিয়ত আছেন অবস্থিত, মুক্তপুরুষও তেমন থাকেন উভয়বিধ অবস্থাতেই ; যেমন নির্গুণ হ'য়েও পরব্রহ্ম গুণগুলিকে প্রকাশ করিয়া ও তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া রচনা করেন বিশ্ব ; তেমন মুক্তপুরুষও পরব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া, যে বিশেষ দেহ-সংযোগে সাধন অবলম্বন করিয়া, জীবিত-কালেই করেন মুক্তিলাভ, সেই দেহদ্বারা কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতে থাকেন ; কারণ তাঁদের পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রারব্ধকর্ম্ম—যাহা ইহজন্ম উৎপাদন করিয়া, ফলোন্মুখী হইয়াছে, তাহা জ্ঞানোদয়েও হয় না বিনষ্ট। কিন্তু ব্রহ্ম যেমন সমস্ত বিশ্ব-রচনারূপ কর্ম্ম করিয়াও নিয়ত তৎসমস্ত হইতে অতীত ও নির্লিপ্তভাবে থাকেন বিরাজমান, তেমন

মুক্ত পুরুষসকল স্থূলদেহ মধ্যে থাকিয়া, দেহদ্বারা সম্পাদন করেন কর্ম্ম, এবং দেহযুক্ত হইয়াও তৎসমস্ত হইতে অতীত ও থাকেন নির্লিপ্ত-ভাবে। প্রলয়কাল এলে যেমন স্থূলভূতগুলি বিনষ্ট হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে থাকে, তেমন প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগাবসানে মুক্তপুরুষেরও স্থূলদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাঁহারা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করেন; তৎকালে তাঁহার সূক্ষ্মদেহের উপকরণগুলি লাভ করে ব্রহ্মরূপতা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সেগুলির ভিন্নরূপে বিকাশ আর থাকে না, গুণ ও গুণীরূপে ভেদ হয় বিদূরিত, সুতরাং নির্গুণ-নাম হয় তাঁহাদের; কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সম্যক্ যুক্ত হওয়াতে, ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহারা যেমন একদিকে নির্গুণ, অপরদিকে তেমন সগুণও হ'ন; সুতরাং তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন দেহ অবলম্বন করিতে পারেন, যে কোন দেহকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন, এবং তাঁদের গতি হয় সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, তাঁদের নিজের বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও অপর সাধক ও ভক্তগণের আত্যন্তিক ইচ্ছা'তে তাঁদের কখন কখন এইরূপ ক'রে ইচ্ছার হয় উদয়। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াতেই তাঁদের আপেক্ষিক সর্ব্বশক্তিমত্তা জন্মে; সুতরাং দুই স্বাধীন পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা হইলে তাঁদের কার্য্যের যেমন বিরোধ সম্ভাবনা হয়, বহু পুরুষ মুক্ত হইলেও জাগতিক সৃষ্টিকার্য্যের তেমন কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না; কারণ, সকলেই এক ঈশ্বরের অঙ্গীভূত। শাস্ত্রে ব্রহ্মের যেরূপ দ্বিরূপতা, মুক্তপুরুষদিগেরও এইরূপ দ্বিরূপতা উক্ত।

সর্ব্বদ্রষ্টা উত্তমপুরুষ ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ দৃগংশ, যাহা পৃথক্ দর্শনের নিমিত্ত দৃশ্যাত্মক প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ বৈকারিক অংশে অনুপ্রবিষ্ট, তাহারই নাম **জীব**। সুতরাং জীব অপূর্ণজ্ঞ, তিনি ঈশ্বরের অংশবিশেষ। নিত্য পূর্ণজ্ঞ পুরুষকে বলে **ঈশ্বর** এবং তাঁহার যে অংশে তিনি জগৎকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন তাহাকে বলে **জীব**।

মুক্তপুরুষগণ উপযুক্ত সাধনা দ্বারা, সংসারোন্মুখী বহির্ম্মুখী বৃত্তি-সকল সম্যক্ নিরুদ্ধ করিয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'ন উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে। তাঁহারা সংসার-বাসনা-বিহীন হওয়াতে, প্রকৃতি-লীন পুরুষের ন্যায় তাঁদের থাকে না সংসারোন্মুখতা ; সুতরাং তাঁরা উত্তমপুরুষ পরমেশ্বরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ও সম্যক্ অদ্বৈত-ভাবাপন্ন। তদবস্থায় গুণাতীত ব্রহ্ম স্বতঃ প্রকাশিত তাঁদের নিকট, এবং তাঁদের সূক্ষ্মদেহও তৎকালে প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মরূপতা। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁদের আর ঘটে না সংসারবন্ধন। ঈশ্বরের ন্যায় তাঁরাও নিত্য সগুণ ও নির্গুণ ; কিন্তু প্রভেদ এই যে ঈশ্বর সর্ব্ববিধ ভেদ ও সৃষ্টির দ্রষ্টা ও সাক্ষী আছেন নিত্যই, কিন্তু মুক্তপুরুষ ব্রহ্মময় হইলেও, তাঁরা ব্রহ্মময় বিশেষদেহযুক্ত, তাঁরা ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলেও ব্রহ্মস্বরূপান্তর্গত ; তাঁদের এই বিশেষ দেহই তাঁদের মুক্তির পূর্ব্বে বদ্ধজীবাবস্থার পরিচয় দেয়। এই নিমিত্ত তাঁদের সর্ব্বজ্ঞতা আপেক্ষিক ও ধ্যানসাপেক্ষ ; ধ্যানমাত্র যে কোন বিষয় জানিতে সমর্থ তাঁহারা। পক্ষান্তরে ঈশ্বরের যেমন নিত্যই সর্ব্ববিষয় পরিজ্ঞাত, তাঁদের নহে তেমন।

মুক্তাবস্থায় যদিও সর্ব্বপ্রকার দেহাভিমান ও দ্বৈতভাব সম্যক্ বিনষ্ট হয় এবং সমস্ত জগৎই প্রতিভাত হয় ব্রহ্মরূপে, তথাপি দেহসকলের নাশ হয় না সম্যক। স্থূলদেহধারী জীবিতব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়—এইরূপ উপদেশই সর্ব্বশাস্ত্র দেন। কিন্তু কালক্রমে জীবন্মুক্ত পুরুষদের বিনাশ হয় স্থূলদেহের, কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা উহা সঞ্চিত ; সুতরাং ভোগদ্বারা সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই, তৎফল-স্বরূপ দেহও যায়। কিন্তু জ্ঞানোদয়ে তাঁহারা দেহ-সম্বন্ধীয় ভোগে কোন প্রকার লিপ্ত হ'ন না। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়াতে তাঁহারা হ'ন সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শী, অতএব দেহ-সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্ম তাঁদের জ্ঞানের আবরণ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং স্থূলদেহ ছাড়িতে তাঁদের ইচ্ছাও হয়

না। পরন্তু সর্ববিধভোগে তাঁহারা নির্লিপ্ত থাকাতে, স্থূলদেহে বাসও তাঁদের একপ্রকার লীলামাত্র। স্থূল দেহের বিনাশান্তে তাঁদের সূক্ষ্মদেহের উপকরণসকল প্রাপ্ত হয় সম্যক্ ব্রহ্মরূপতা; ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে ইহাদের অবস্থিতি হয় না। গীতার কথায়, "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"; সৃষ্টিও প্রলয়ধর্ম্মাধীন না থাকাতে, তাঁদের দেহ প্রাকৃত উপকরণে নির্ম্মিত হ'লেও তাহা অপ্রাকৃত। তাই শাস্ত্র বলেন তাঁদের দেহকে অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ; কারণ তাঁদের চিতিশক্তি জীবের ন্যায় কখন আবরিত না হওয়ায়, তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বদা থাকেন চিন্ময়। বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁদের দেহে অভিমানও নাই এবং হিরণ্যগর্ভের ন্যায় দেহেতে পৃথক্‌বুদ্ধিও নাই।

ফলকথা এই যে, প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মের এক বিশেষপ্রকার দৃক্‌শক্তি। ঐ দৃক্‌শক্তি যখন বাহিত হয় **বহির্মুখে**, তখন কেবল জাগতিক বাহ্যরূপ ও দেহাদি পদার্থনিচয় ইহার বিষয়ীভূত হয়। এই অবস্থায় ঐ জীবকে বলে **বদ্ধজীব**। প্রকৃতিলীনাবস্থায় জাগতিক সর্ববিধ দেহাদিবস্তু হয় অপ্রকট; এমন কোন বিশেষ দেহাদি পদার্থ তৎকালে থাকে না যাহা ঐ দৃক্‌শক্তির বিষয়ীভূত হ'তে পারে; সুতরাং প্রত্যেক **জীবশক্তি তখন থাকে স্বরূপে (=বিষয়াবলম্বনশূন্য দৃক্‌শক্তিমাত্ররূপে)**। যখন মুমুক্ষু পুরুষ উপযুক্ত সাধন লাভ করেন, তখন ঐ দৃক্‌শক্তি দেহাদি প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হইয়া হয় **অন্তর্মুখী**; অবশেষে সমস্ত প্রাকৃতিক পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া, যখন স্বীয় স্বরূপে হয় অবস্থিত, তখন স্বীয় স্বরূপপ্রাপ্ত দৃক্‌শক্তিও আশ্রয়ীভূত পরব্রহ্মস্বরূপ তাঁহার নিকট হয় প্রকাশিত; তাহাতে লীন হ'ন তিনি। ইহাই তাঁহার **মুক্তাবস্থা**।

পরব্রহ্মকে বলা যায় "পুরুষ"; নির্গুণ ও সগুণ এই উভয়রূপতা দ্বারা পূর্ণ এই পুরুষ (পূর্ণমনেন সর্ব্বম্)। সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম

পূর্ব্বোক্ত ২৪টী জড়বর্গবিশিষ্ট জগৎকে প্রকাশিত করেন "আপনা" হইতে। গুণময় পুরীতে থাকেন তাই জীবাত্মা জীব-ও "পুরুষ" (পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ); পরন্তু অপর সকল পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরব্রহ্ম হ'ন "উত্তমপুরুষ"। উত্তমপুরুষ ভগবান্ ও জীবের অন্তর্য্যামিরূপে এবং জাগতিক কার্য্যের নিয়ন্তা ও আশ্রয়রূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। ∴ পুরুষ দ্বিবিধ :—(ক) উত্তমপুরুষ—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ও ঈশ্বর, (খ) জীব (জীবাত্মা)—অসর্ব্বজ্ঞ, অসর্ব্বব্যাপী সুতরাং বিশিষ্টচৈতন্য। ঈশ্বর সর্ব্বদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকাতে ঈশ্বর সদাই মুক্ত, সৃষ্টজগতে তাঁর নাই অবিদ্যাজনিত ভেদবুদ্ধি। জগতের প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভেও আবরিত থাকে স্বরূপজ্ঞান; সুতরাং প্রকাশিত সম্যক্ জগতের জ্ঞান তাঁহার থাকিলেও তিনি পূর্ণজ্ঞ নহেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—পূর্ণজ্ঞ; ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কালে যাবদীয় রূপ ও ক্রিয়া জগৎ-রূপে হয় প্রকাশিত, তৎসমুদায়েরই নিত্য দ্রষ্টা তিনি ঈশ্বর; মহদাদি ক্ষিতিপর্য্যন্ত সৃষ্টি যখন হয় প্রকাশিত, তিনি-যেমন তৎসমস্তেরই দ্রষ্টা,জ্ঞাতা ও সাক্ষী, তেমন প্রাকৃতিক মহাপ্রলয় কালে যখন সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপা মূলপ্রকৃতিতে হয় লীন তখন এই লীন অবস্থারও দ্রষ্টা থাকেন ঈশ্বর; এবং পরে পুনরায় যখন সৃষ্টি হয় প্রাদুর্ভূত তাহারও দ্রষ্টা পরমেশ্বর। এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রমান্বয়ে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; পরমেশ্বর সর্ব্বসাক্ষী ও ত্রিকালজ্ঞ হওয়ায়, তৎসমুদয়েরই নিত্য দ্রষ্টারূপে তিনি আছেন, সুতরাং কালশক্তি তাঁহাতে অস্তমিত আপাততঃ এবং সর্ব্ববন্ধনরহিত পূর্ণমুক্তপ্রায় অবস্থা! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হ'লেই আবার হয় বন্ধন-মুক্তির লীলা !!!

বন্ধন-মোচনের আধিদৈবিক বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পাশেই চিন্তনীয় উহার আধিভৌতিক বিজ্ঞানকথা। তন্মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই অন্যত্র কথিত হ'য়েছে কিছু তত্ত্ব-সংস্কারাদি আধিদৈবিক মুক্তির কথা।

এখন দেখা যাক্ সংক্ষেপে বন্ধন-মোচনের স্থূল আধিভৌতিক বিজ্ঞান কি বলেন। অবশ্য জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে নাই কোন বিরোধ ; মাত্র ঘনত্বের তারতম্যেই মনে হয় পৃথক পর্য্যায় ;—স্থূলের জ্ঞান = জড় বিজ্ঞান বা আধিভৌতিক জ্ঞান, সূক্ষ্মের জ্ঞান = আধিদৈবিক জ্ঞান এবং কারণ জ্ঞান = আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

আধিভৌতিক বিজ্ঞানীর কথায়—মৃত জীবের স্থূল দেহটীর পরিণাম বায়বীয় অবস্থায় মহাবায়ুতে সংমিশ্রণ ; এবং ভস্মাকারে অথবা মৃত্তিকাকারে বিভিন্ন ধাতব অধাতব অজৈব লবণক্ষারাদি কঠিন পদার্থে **পরিণমন** (Reduction) ; যাই হোক, উভয়ক্ষেত্রেই উক্ত বিভিন্ন মিশ্রিত-যৌগিক পদার্থ গুলিও কালক্রমে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃ-প্রবৃত্ত ভাবেই লাভ করে চরম ও পরম পরিণতি উপাদান কারণে ; ইহারাই বিজ্ঞানীর পরম-অণু = **পরমাণু** (atom)—অবিভাজ্য পরমাণু যেমন C, H, O, N, Na, K, Fe, P, etc। এখানে উল্লেখ থাকে, যে এই বিশিষ্ট বিশিষ্ট পরমাণুগুলির পূর্ব্বাভাসাবস্থা ছিল নির্ব্বিশেষ সমুদ্রে (ব্রহ্মে) ভাসমান উপাদান কারণবীজরূপে ; সবাইই সমতুল্য-সমদর্শন-সম্মিত সমকক্ষ ; এই পূর্ব্বাভাসাবস্থার পরিচ্ছিন্ন বস্তুগুলি সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকদের কাল্পনিক বস্তু—**বিন্দু** (Point) যাহা আধিভৌতিক বিজ্ঞানের ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সন্ধিস্থল বিধায় এস্থলেও আলোচ্য বিষয়। বিন্দুশব্দটীর ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতে দেখা যায়—জানা, পাওয়া বা গমন ও অবয়বীভূত হওয়া অর্থে √বিদ্ + উ কর্ম্মবাচ্যে ; ∴ ইহার অর্থ—বেত্তা-বেদিতব্য, প্রাপ্তা-প্রাপ্তব্য, গন্তা-গন্তব্য, যাহা অবয়বীভূত হয় তাহাই বিন্দু। আবার জ্যামিতিও বলেন যাহা বিভাগের অযোগ্য ও বিস্তাররহিত তাহাই বিন্দু। ∴ বিন্দু ও পরমাণুর লক্ষণ প্রায় একরূপ ; বিন্দু সূক্ষ্ম কাল্পনিক, পরমাণু সূক্ষ্ম বাস্তবিক। যাই হোক, বিন্দুসমষ্টিতে হয় **রেখা** ; জ্যামিতিক সংস্থানে (Figure) রেখা-পরিচ্ছিন্ন =

আকাশাংশ। অতএব বলা যায় সংস্থানমাত্রেরই উপাদান এই দু'টী, বিন্দু ও আকাশ; বিন্দুর পরিচালনে অঙ্কিত হয় রেখা, রেখার পরিচালনে অঙ্কিত হয় তল (Surface) তলের পরিচালনে অঙ্কিত হয় তল ও ঘন (Cubic); কিন্তু ঘনের পরিচালনে অঙ্কিত হয় ঘনই, আর কিছু হয় ন, (Solid geometry)। এক রেখাই বিবিধভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ধারণ করে বিবিধ আকার এই অসীম অনন্ত বিশ্বে!

মঘবা (=ইন্দ্র Electricity) অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বীয় তনুকে (=অবিশেষ সত্তাকে) মায়া-বা-পরিচ্ছেদিকাশক্তিদ্বারা নানারূপে করেন পরিচ্ছিন্ন, এক হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হ'ন **মায়াদ্বারা**। নানারূপে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-তনুই "জগৎ"। ∴ বিন্দুসমষ্টিই (=রেখাই) —রেখাপাতদ্বারাই অঙ্কিত হয় এই জগৎচিত্র। রেখা বস্তুতঃ সম্মূর্চ্ছিত শক্তি বা মূর্ত্তক্রিয়া। বিন্দুবিষয় আরও স্মর্ত্তব্য পৃঃ ১১৩

[বিঃ দ্রঃ—মায়া = পরিমাণার্থক √মা (to measure)+য ণ + আপ্, যদ্দ্বারা মিত হয় পদার্থসকল—পরিচ্ছিন্ন (conditioned) হয়।]

সূক্ষ্মাতীতসূক্ষ্ম কাল্পনিক আধ্যাত্মিক বিন্দুরাজ্য হইতে স্থূল বাস্তবিক আধিভৌতিক রাজ্যে একই বস্তুর অবতরণ Precipitate-রূপে ঘটে বিশ্বনির্ম্মাণে—ইহাই জ্ঞানীদের মুমুক্ষুদের লক্ষ্যের বিষয় এবং চিন্তাশীল পাঠক তাহা জানিলে লাভবান হইবেন নিশ্চয়।

"পরমাণু"-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—শব্দার্থক √অণ্+উন্ কর্তৃবাচ্যে = অণু; যাহা শব্দ করে তাহাই অণু। কোন একটী বস্তু যখন অপর একটী বস্তুকে করে অভিঘাত, তখন অভিঘাতপ্রাপ্ত বস্তু-দ্বয়ের পরস্পার ঘাতপ্রতিঘাত হইতে যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম হয় তাহাকে বলা হয় গতি বা স্থিতি; একটু স্থিরচিন্তা করিলেই বোঝা যায় ঐ ঘাত-প্রতিঘাতে হয় একটী শব্দেরও অভিব্যক্তি। বিরুদ্ধশক্তিদ্বয়ের পরস্পার ঘাতপ্রতীঘাত হইতেই সকল প্রকার ক্রিয়ার হয় উৎপত্তি; ক্রিয়া = শক্তির বিকাশিত অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অণু ও শব্দ

ভেদ সংসর্গ বৃত্তি শক্তি-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আর্য্যঋষিদের বাক্য বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিকও স্বীকার করেন যে ETHER (=আকাশের রজোগুণ) হইতে আলোক-তাপ-তাড়িত ইত্যাদি ভৌতিক শক্তির আবির্ভাব। আর, ছান্দোগ্যোপনিষৎ-রকথায়—আকাশ হইতেই বায়্বাদি ভূতসকলের উৎপত্তি এবং প্রলয়ে আকাশেই বিলীন হয় ইহারা; সুতরাং আকাশ ইহাদিগ হইতে মহত্তর (=অন্যান্য ভৌতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা)। শব্দ ও পরমাণু এক পদার্থ। অণুর শব্দত্ব প্রতিপাদনে বলা যায়—মেঘ যেমন সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আসে, তেমন সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত (=সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান) শক্তি পুনঃ অভিব্যক্তিউন্মুখ হইলে, প্রযত্ন প্রেরিত শব্দ পরমাণুপুঞ্জ আসে স্থূলাবস্থায়। এই কথারই প্রতিধ্বনি বর্ত্তমানের Nebular hypothesis; Nebulae = নীহার = প্রলয়কালের পরমাণুসমষ্টি।

আরও, বশিষ্ঠের কথায়—"নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিনাসন্তিষ্ঠতে জগৎ। তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরেত্বণূন্॥" অর্থাৎ, প্রলয়ে নামরূপ বিনির্ম্মুক্ত জগৎ যাহাতে থাকে, তাকে কেহ প্রকৃতি কেহ মায়া, কেহ বা বলেন অণু।

এইরূপে দেখা গেল **স্থূলে** আধিভৌতিক বন্ধনমুক্তির কথা যেমন সংসার-সমাজ-কারাগার ইত্যাদি হইতে, **সূক্ষ্মে** আধিদৈবিক বন্ধন মুক্তির কথা যেমন ইন্দ্রিয়াদিঘটিত সংস্কারাদি, তত্ত্বাদি ইত্যাদি ব্যাপার হইতে এবং **কারণে** আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সাধকের চিত্তে করে নিরন্তর লীলা বন্ধন-মুক্তির ভাবরাশিগুলি।

সংসার-সমাজে থাকিয়া দৈব পৈত্র কর্ম্মাদি করিতে করিতে যখন হয় আত্মতৃপ্তি অর্থাৎ আত্মরসের পায় সন্ধান, তখনই গৃহীর সুসংযত হয় ইন্দ্রিয়বর্গ—আর ছুটোছুটি করে না বিষয়ের লোভে। সে অবস্থায় একমাত্র আত্মাই যে পরমতত্ত্ব তাহা বুঝে; তাই গৃহী আত্মলাভের বা

মুক্তির আশায় হয় উদ্বুদ্ধ: ইহারই নাম মুমুক্ষু অবস্থা। তখন একমাত্র আত্মার দিকেই লক্ষ্য স্থির থাকে বলিয়া নিরুদ্ধ হয় তাঁহার বাগ্‌যন্ত্র অর্থাৎ মৌনী হ'ন—মুনি হ'ন তিনি; মননশীল মুনি করেন নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের অভ্যাস। এই "অভ্যাস" অর্থে বুঝিতে হইবে, শাস্ত্র কথায়,—"প্রণবধনুতে জীবাত্মা বোধরূপ শর যুক্ত করিয়া ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে অপ্রমত্তভাবে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিতে হয়"; ইহাই মুমুক্ষুর ধ্যান। প্রতিদিনই অল্পাধিক মুক্তির আস্বাদ লইতে হয়; এইরূপ করিলেই জীবন্মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। দৈনন্দিন সাধনার মধ্য দিয়াই মুক্তিসাধনার দিকে লক্ষ্য হওয়া চাই। ["প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"] প্রণবধ্বনিতে সপ্ত অজ্ঞানভূমিকা পাতাল হয় বিক্ষোভিত; [সপ্তপাতাল=বদ্ধ (অতল)→বদ্ধতর (বিতল)→বদ্ধতম (সুতল)→মূঢ় (তলাতল)→মূঢ়তর (রসাতল) →মূঢ়তম (পাতাল)→জড় (মহাতল)]। এবং উদ্বুদ্ধ ও উল্লসিত হয় সপ্ত জ্ঞানভূমিকা সপ্তস্বর্গ মুমুক্ষু (ভূঃ)→মুমুক্ষুতর (ভুবঃ)→মুমুক্ষুতম (স্বঃ)→ব্রহ্মবিদ্ (মহঃ)→ ব্রহ্মবিদ্‌বর (জনঃ)→ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ (তপঃ)→ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ (সত্যং)।

আরও মুক্তপুরুষ তালিকাভুক্ত ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্র ব্রহ্মর্ষিগণ (সনক-সনন্দ-সনাতন-কপিল আসুরি-বোঢ়ু-পঞ্চশিখ) ; নারদাদি দেবর্ষিগণ (মরীচি-অত্রি-অঙ্গিরা-পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতু-প্রচেতাঃ-বশিষ্ঠ ভৃগু-নারদ ; ব্যাস ও শুকদেবাদি পরমহংসগণ। এঁরা ব্রহ্মভাবাপন্ন হ'লেও ব্রহ্মস্বরূপান্তর্গত ; এঁদের বিশেষ-দেহই তাঁদের মুক্তির পূর্বে বদ্ধজীবাবস্থার দেয় পরিচয়। এজন্য এঁদের সর্ববিজ্ঞতা ও আপেক্ষিক ও ধ্যানসাপেক্ষ ; তাঁহারা ধ্যানমাত্র যে কোন বিষয় জানিতে সমর্থ। কিন্তু ঈশ্বরের যেমন নিত্যই সর্ববিজ্ঞতা, তাঁদের মোক্ষসাধনাকারীকে জানিতে হইবে (যোগবাশিষ্ঠের কথায়)—

মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির মূলীভূত কারণ ;

"মনো এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈর্নির্বিবষয়ং স্মৃতম্॥"

সাধারণ বিচারহীন দৃষ্টিতে মনের জন্মমৃত্যু বা বন্ধনমুক্তি প্রত্যক্ষীভূত হয় না। দেহেরই দেখা যায় জন্মমৃত্যু ; দেহ মনেরই স্থূল বিকাশ মাত্র ; মনকে বলে সূক্ষ্মদেহ। এই স্থূলদেহ মনেরই মায়িক বিকাশমাত্র। শৈত্যবশে সূক্ষ্ম বাষ্প যেমন স্থূল জলরূপে হয় পরিণত, বা তরল জল কঠিন বরফ রূপে হয় পরিণত, তেমুন ইচ্ছাশৈত্যে সূক্ষ্মমন হয় পরিণত স্থূলদেহ রূপে। জল জমিয়া হয় বরফ, আবার বরফ গলিয়া হয় জল— বরফ স্বীয় কারণ-জলে পরিণত হয় পুনঃ। মৃত্যুর তেমনই স্বীয় কারণে লয় হওয়া। যে-মন বাসনা-বশে দেহরূপে পরিণত হইল, দেহনাশে বা মৃত্যুতে সে স্বীয় কারণে, অর্থাৎ মনঃ রূপে স্থিত হইল ; ইহাই হইল মনের জন্ম-মৃত্যু প্রণালী। মনের এতাদৃশ জন্ম-মৃত্যু প্রণালীটি রহিতের বা নষ্টের যে চেষ্টা, তাহাই **মোক্ষের সাধনা।** মন সম্যক্ নষ্ট না হইলে মানবের মোক্ষ সুদূরপরাহত।

শাস্ত্রে বর্ণিত মুক্তির ৪টী স্তর—(১) জড়ত্বকে ভেদ করিয়া চৈতন্যলোকে (মন্ত্রচৈতন্য সাহায্যে) যাওয়াই **সালোক্য** ; (২) যে সমষ্টি চৈতন্যে ইষ্ট অবস্থিত, তাঁহার কাছে যাওয়াই **সামীপ্য** ; (৩) যে সূক্ষ্ম কারণরূপকেন্দ্র হইতে ইষ্ট প্রকাশিত অর্থাৎ স্পষ্ট ঘনীভূত রূপদর্শনের অনুভূতি তাহাই **সারূপ্য** ; এই স্তরে এলেই সাধক হইয়া যায় তৎস্বরূপ, এখানেও থাকে বিশিষ্টতা ; (৪) শেষে ক্রমশঃ বিশিষ্টতাবিহীন নির্বিবশেষ চৈতন্যস্বরূপে আসিতে পারেন সাধক, সে অবস্থাকে বলে **সাযুজ্য** বা **নির্ব্বাণ**।

আত্মা স্বভাবতঃ বিমুক্ত ; তাঁহার আভিমানিক বন্ধনবৃত্তির জন্যই প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব। "অখণ্ডসচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতীত সবই অসৎ—সবই মায়া ; ব্রহ্মই পরতত্ত্ব, ব্রহ্মই পরমকারণ"—এই কথাই প্রকৃতিদেবী সকলকেই বলাইয়া, এই জ্ঞানেই সবাইকে জ্ঞানী করিয়া

(যত জন্মেই হোক) তবে নিস্তার করিবেন প্রকৃতি। প্রকৃতির ইহাই স্বার্থ !

অন্য বিশিষ্ট উপায়ঃ—(১) সমাধিই মুক্তিমন্দিরের দ্বার। স্নেহ-প্রেম-ভক্তি, কামাদি বৃত্তি ও রূপরসাদি বিষয় প্রভৃতি জাগতিক ভাব-শূন্য হইতে হইবে মুমুক্ষু সাধককে ; আত্মভাবে সম্যক্ বিভোর না হ'লে দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল না হ'লে জাগতিক ভাবশূন্য হওয়া সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও যখন মানুষ "আমিত্বকে" উদ্বুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয়, তখনই উহাদের মায়া ছাড়িতে পারে। নতুবা কি সাধনার অঙ্গ, কি যোগাঙ্গ, কি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম কিছুই যায় না ছাড়া।

(২) "স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজন্ মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ।
কীর্ত্তায়ৎ সততং দেবীং স বৈ মুচ্যতে বন্ধনাৎ ॥" (দুর্গাপ্রদীপ)

(৩) "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং **নিত্যাভিযুক্তানাং** যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" গী ৯।২২

যোগক্ষেম = মুক্তি (শ্রীধরস্বামী) ; বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ও বৈদিক মুক্তি একার্থবাচক। কারণ মুক্তিই মুমুক্ষুর একমাত্র কাম্য ও প্রয়োজনীয়।

(৪) পতঞ্জলির কথায় ভূত ও ভৌতিকশক্তি মানসশক্তির বশেই ক্রিয়া করে ; পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্থূলাদি (স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অর্থবত্ত, অন্বয়) পঞ্চবিধ অবস্থার তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে বিদিত হইয়া, যিনি ইহাদের উপর যোগশাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মানুসারে সংযম করিতে পারেন, তিনি হ'ন ভূতজয়ী। ভূতের হাত হইতে এড়াইতে না পারিলে, ভগবানের সর্ব্বব্যাপক—পরমানন্দময়রূপ দেখা যায় না। পূজাকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রথমেই করিতে হয় ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়া অর্থাৎ ভগবান্ হইতেই ভূতের কিরূপে ঘটে আবির্ভাব ও তিরোভবে সেই মৌলিক তত্ত্ব বা তথ্যটী নিবিষ্টমনে অনুচিন্তন-অনুধাবন দ্বারা করিতে হয় সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রতিটী ভূতে। এই অভ্যাসেই হয় মুক্তির পথে অগ্রগতি ।

(৫) ভূতশুদ্ধির সহচর ভাবশুদ্ধি যাহাকে শাস্ত্রভাষায় বলে **চিত্ত-শুদ্ধি**। ভাব বা সংস্কাররাহিত্যই চিত্তশুদ্ধি। ভূতের ও ভাবের সমষ্টিই

এই বিশ্বজগৎ; ভূতজয়ী হ'য়ে ভাবসমরে বিজয়ী হ'লেই বহুবাঞ্ছিত মুক্তি হয় করতলগত। সবই মহামায়ার অনুভাব; তাঁহার কৃপা-ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি অসম্ভব। পঠিতব্য "উপনয়নে উপহার" ২য় ভাব পৃঃ১৫০।

(৬) অনাত্মভাবগুলি প্রকৃতিতে লীন হইলেও তাদের হয় আবার আবির্ভাব; সুতরাং প্রকৃতি পর্য্যন্তের বিলয় করিতে না পারিলে যথার্থ আত্মস্বরূপ প্রকটিত হয় না, সাধক মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

(৭) মনে রাখিতে হইবে, আরও,—বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই জ্ঞানের প্রকার ভেদ মাত্র। যতক্ষণ উদয় না হয় বিশুদ্ধবোধের, ততক্ষণ কিছুতেই হয় না সমূলে ছিন্ন অজ্ঞানমূলক অষ্টপাশ বা বন্ধন। একমাত্র পরমাত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলেই ভেদজ্ঞানমূলক বিষয়-রস বা সূক্ষ্মসংস্কার সম্যক্ হয় নিবৃত্ত। [দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৮।৩৯) এবং পৃঃ ৪৩]

(৮) মুমুক্ষু সদাই মনে রাখিবেন অবশ্য—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ। পাশমুক্তো ভবেৎ শিবঃ" অর্থাৎ অষ্টপাশ (= "ঘৃণালজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী, কুলং শীলং জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"। আরও, পঞ্চবিধ ভেদের কথাও ভুলিতে হইবে মুমুক্ষুকে; পঞ্চভেদ যথা, (১) জীবে ব্রহ্মে (২) জীবে ঈশ্বরে (৩) জীবে জীবে (৪) জীবে জড়ে, (৫) জড়ে জড়ে।

(৯) বস্তুতঃ সূক্ষ্মশব্দই অহংতত্ত্বের প্রথম তামসিক বিকার ও বাহ্য জগতের সূক্ষ্মতম অবস্থা; সুতরাং দৃশ্যজগৎ অতিক্রম করিতে হইলে শব্দাবলম্বনই অতিশয় উপযোগী। এই প্রসঙ্গে আরও স্মর্ত্তব্য পরা-পশ্যন্তি-মধ্যমা-বৈখরী বাক্ (= শব্দ); সমস্ত ভাবরাশি সাধকের অন্তস্তলে 'পরায়' উদ্ভূত হইয়া ভাষায় প্রকাশিত হয় 'বৈখরী'তে যেমন "ওঁ" ইত্যোক্ষরং ব্রহ্ম।

(১০) আত্মজ্ঞানী স্বীয় আত্মার আবরক স্বরূপ মনঃকে দেখেন আত্ম-স্বরূপ নিজ হইতে পৃথক্; সুধু পৃথকই নয়, ঐ মনকে প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল দেখিয়া উহাকে বহুরূপীর ভেল্কিবাজিরূপে করেন গ্রহণ।

এই যে মনের প্রহেলিকাত্ব দর্শন—ইহা আত্মজ্ঞানীর জ্ঞানসিদ্ধ, বিচারসিদ্ধ, ও অনুভবসিদ্ধ। যে মনের সঙ্গে অজ্ঞানতাবশে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অনাদি কাল হইতে সংস্থাপিত অর্থাৎ "আমিই মন" বা "মনই আমি" এরূপ ধারণা বদ্ধমূল, মন যাহা ভাবিতেছে, করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, তাহা "আমিই করিতেছি", প্রহলিকাময় মনের কৃত কর্ম্মগুলির কর্ত্তা আমিই এরূপ মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে দৃঢ়ীকৃত, সেই মনের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ নিজেকে আত্মস্বরূপ সাব্যস্থ করিয়া মনের দ্রষ্টারূপে যে অবস্থিতি, তাহাই আত্মস্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি। এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধই জীবত্বের হেতু—উহাই জন্ম মৃত্যু-জরা-ব্যাধির-মূলীভূত কারণ।

(১১) শঙ্করাচার্য্যের কথায়, **"অনিচ্ছৈব পরমং পদং"**; অর্থাৎ অনিচ্ছাই ব্রহ্মপদ স্বরূপ—জীবের পক্ষে কিছুই না চাওয়ার যে অবস্থা, উহাই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা। যখন কোন মানবের "কিছুই চাই না, কিছুই চাই না"—এইরূপ ধ্বনির প্রতিধ্বনি স্বীয় চিত্ত হইতে স্বতঃই ক্রমাগত হইবে উত্থিত, তখন সেই মানবের জীবভ্রান্তি অপগত তথা জগদভ্রান্তি অপনোদিত হইয়া নির্ভয়ে সে "ব্রহ্মাহমস্মি"-রূপে আত্মসংস্থিতি লাভ করিতে পারিবে। তাহার সুখভোগের ইচ্ছাই তো তাহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথকীভুত করিয়া জীবরূপে পরিণত করিয়াছে, জীবস্বভাবসুলভ ভীতি ও ভ্রান্তির অধীন করিয়াছে। এই ইচ্ছার অপগমে মানব ঐ জীবভ্রান্তি ও জীবভীতি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপত্ব করেন লাভ। নির্গুণ ব্রহ্ম আপ্তকাম,—"আছি" মাত্র জ্ঞানবিশিষ্ট; "আছি, আর কিছু চাই না"—এরূপ জ্ঞানস্বরূপ-নির্গুণব্রহ্ম **জ্ঞানসত্তা** মাত্র, সুখভোগের ব্যাপার হইতে অতীত অবস্থায় স্থিত। যে মুহূর্ত্তে সাধকের চিত্ত হইবে **নিরিচ্ছ** সেই মুহূর্ত্তেই হইবে ব্রহ্মস্বরূপ। মনে রাখিতে হইবে—ব্রহ্মকে যদি ব্যক্তিত্ববাচক এক জন মহাপ্রতাপশালী ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষরূপে মনে ধারণা পোষণ করেন সাধক, তবে সাধকের ব্রহ্মস্বরূপ

হওয়া সাধকের পক্ষে অসম্ভব নিঃসন্দেহে। আর ব্রহ্মকে শুদ্ধ নির্গুণ জ্ঞানসত্তা বোধে যদি সাধক ধারণা করিতে পারেন তবে তাঁহার স্বরূপত্ব লাভের চেষ্টা সাধকের পক্ষে ভীতিজনক ও অসম্ভব নহে। ভীতি ও ভ্রান্তির কারণ যে ইচ্ছা-বায়ু তাহার সুবিচাররূপ সুচিকিৎসা দ্বারা উপশম হইলে সাধকের থাকিতে পারে না পুনঃ ভীতি-ও ভ্রান্তির-দ্বারা বিক্ষোভনের ও বিঘূর্ণনের কারণ। স্বচ্ছ আকাশ চিরনীলিমাময় দৃষ্ট হওয়া যেমন একটী জীবের পক্ষে একটা চিরভ্রান্তি, তেমন নির্ম্মল আত্মা দৃষ্ট না হইয়া যে সদা চিত্ত-নীলিমা দৃষ্ট হয় উহাও একটী চির ভ্রান্তি। এই চিরভ্রান্তিই অনাত্মা মায়া। নীলিমার অপগমে যেমন স্বচ্ছ আকাশের স্বরূপ দর্শন লাভ হ'তে পারে, তেমন চিত্ত-নীলিমা প্রশমিত হইলে, অর্থাৎ ভ্রান্তি ভীতি-ইচ্ছা প্রভৃতি উপাদান বিশিষ্ট চিত্তের প্রশমন হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপে আত্মজ্ঞান লাভ হয় সম্ভব। ইচ্ছা-বায়ুর সমাহার যে চিত্ত, তাহা অনিচ্ছ হইলেই যখন অস্তিত্বহীন হয়, তখনই হয় আত্মস্থিতি। বাসনা হইতে উৎপন্ন ভয় ও ভ্রান্তি দ্বারা অভিভূত মানবই হয় ভীত-ভ্রান্ত (দিগ্‌ভ্রান্ত) ও বিঘূর্ণিত।

মুক্তির সাধন উপায়রূপে ঘোষণা ক'রেছেন আরও শঙ্করাচার্য্য—**"অক্রিয়ৈব পরা পূজা"** অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করাই ব্রহ্মপূজা। অবশ্য এই সববচন মাত্র মুমুক্ষুর জন্য।

(১২) সংসার-কারাগারের দাগী-কয়েদী বিষয়াসক্ত ব্যক্তি উহার উন্নতির জন্য করে কর্ম্ম; আর ভদ্র কয়েদী ভাবে ও গণনা করে দিন তার খালাসের দিনটী অর্থাৎ মুক্তিকামী বিচারশীল ভদ্রলোক কয়েদী যিনি সশ্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডতনন তিনি চান মুক্তি—মাত্র মুক্তি কারাগার হইতে।

(১৩) হৃদয়-BOILER-এ বাসনার আগুন জ্বলিতেছে দাউ-দাউ। আর ঐ অগ্নির তেজে সদা উদ্দীপ্ত হইয়া ঘোর বিষয়ের উন্নতির জন্য প্রাণপণ অধ্যবসায় ও তীব্র উদ্যম করিতেছে মানুষ, আর মুখে বলিতেছে গীতার সুরে "নির্লিপ্ত কর্ম্ম করিতেছি" "পরোপকার করিতেছি" ইত্যাদি।

গীতোক্ত নির্লিপ্ত কর্ম্মের উপদেশটী নিছক্ নিরর্থক শব্দসূচক স্তোভ-বাক্যমাত্র! এ উপদেশ আধ্যাত্মিক মোক্ষবিষয়ে প্রযুজ্য হতে পারে না। মহাভারতেই আছে গীতাবিস্মৃতির কথা যেখানে অর্জ্জুন গীতার উপদেশ ভুলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে গীতার পুনরুক্তি করার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণও বলেছিলেন, "উহা যোগস্থ হইয়া বলেছিলাম, আমারও কিছু নাই মনে"। যাই হোক "নির্লিপ্ত কর্ম্মের" উপদেশের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক, আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না!

(১৪) মুমুক্ষুর স্মর্ত্তব্য আরও "আপ্তকাম মহাপুরুষ" লক্ষণ পৃঃ ৭৮।৭৯

অতঃপর নিম্নে প্রদত্ত হয় আদি জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের (খৃঃ ৭৮৮ জন্ম) মুক্তিসাধন ব্যবস্থা :—

১ম—জ্ঞানযোগে আবশ্যকীয় **অভ্যাস** :—(১) কর্ম্মকরণ = বেদবেদাঙ্গ পাঠ + **কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান** (= স্বর্গাদি সুখ-সাধন কর্ম্ম) + নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান (= সন্ধ্যাবন্দনাদি + পুত্রাদি জন্মকাল-রূপ উপস্থিত হইলে ভগবৎ অভিপ্রেত কর্ত্তব্যকর্ম্ম, সংসারযাত্রানির্ব্বাহোপ-যোগী নির্দ্ধারিত কর্ম্ম যন্ত্রবৎ সম্পাদন করা); (২) **বর্জ্জন করা নিষিদ্ধ কর্ম্ম** (= নরকাদি দুঃখভোগের কারণ ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি নিন্দিত কর্ম্ম ; (৩) প্রায়শ্চিত্ত (= চন্দ্রায়নব্রতাদি) (৪) হরিতোষণ কর্ম্ম = ভক্তিযোগ বা সগুণব্রহ্মবিষয়ক চিত্তের একাগ্রতাসাধককর্ম্ম (৫) সর্ব্বভূতে দয়া = প্রাণীহিংসা ও প্রাণীপীড়ন বর্জ্জন করা এবং পরোপকার করা। এইরূপ অভ্যাসের পর করিতে হইবে (ক) "নিত্যা-নিত্য বস্তু-বিবেক" অর্থাৎ আত্মস্বরূপই নিশ্চয়, এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ অনিত্য, এই প্রকার জ্ঞান ও ধারণা অভ্যাস করা। (খ) "ইহামুত্রফল-ভোগ বিরাগ" অর্থাৎ ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয়ত্রই সকলপ্রকার ভোগের প্রতি কাকবিষ্ঠাসম তুচ্ছ-জ্ঞান করার অভ্যাস করা [নির্ম্মল বৈরাগ্য] ইহার পরে প্রয়োজন ৬টী সাধন (সাধকের ষট্‌সম্পত্তি)

(১) "শম"-সাধন = সর্ব্বদা বাসনা ত্যাগ অভ্যাস।

(২) "দম"-সাধন = অন্তঃকরণের যাবতীয় বাহ্যবৃত্তির দমন অভ্যাস।

(৩) "উপরতি"-সাধন = বিষয় সন্নিকর্ষ সত্ত্বেও তাহা হইতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যাহার (= গুটিয়ে নেয়া) অভ্যাস।

(৪) "তিতিক্ষা"-সাধন = শীত-উষ্ণ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বসমুদয় সহ্য করার অভ্যাস।

(৫) "শ্রদ্ধা"-সাধন = বেদ ও আচার্য্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করার অভ্যাস।

(৬) "সমাধান"-সাধন = "সৎ"-স্বরূপ অর্থাৎ "অস্তিত্ব" মাত্র ব্রহ্মের ভাবে চিত্তকে একাগ্র করার অভ্যাস; এই অবস্থায় দরকার মুমুক্ষুত্ব-অভ্যাসও। মুমুক্ষুত্ব = মুক্তির জন্য ইচ্ছা; এই ইচ্ছা যদি মিলিয়ে যায় ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার সহিত, তাহ'লে যেন "সোণায় সোহাগা"। এই থেকেই শুরু হয় **ব্রহ্মবিচার** :—

(ক) শ্রবণ, (খ) মনন, (গ) নিদিধ্যাসন, (ঘ) সমাধি।

অথ **ব্রহ্মবিচার** :—(ক) অধ্যারোপ—ভ্রমকালে কিরূপ হয় প্রতীতি (সর্প ও রজ্জু); রজ্জুতে সর্পভ্রম = **ভ্রমজ্ঞান** ইহা প্রাতিভাষিক সত্য। (খ) অপবাদ—ভ্রমনাশে কিরূপ হয় প্রতীতি, জড়জগৎ ব্যবহারিক সত্য = **সংশয় জ্ঞান**। (গ) মহাবাক্য বিবেক—বেদের সার উপদেশের আলোচনা; ইহাই পারমার্থিক সত্য = ব্রহ্ম—**নিশ্চয়জ্ঞান**।

২য়—রাজযোগে ১৫টী অঙ্গ :—

(১) যম—"সমস্তই ব্রহ্ম" ভাবিয়া ইন্দ্রিয় সংযম; ৫টী প্রক্রিয়ায় এই যমসাধন হয় সাধিত যেমন—অহিংসা-অস্তেয়-অপরিগ্রহ সর্ব্বভূত-হিতকর সত্যভাষণ ব্রহ্মচর্য্য। আরও, কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের (আহার-নিদ্রা) সময় অন্যান্য কর্ম্ম থেকে আবশ্যকানুরূপ কথঞ্চিৎ সংযম করিতে হয় কর্ম্মীকে—ইহারই নাম "যম"-অভ্যাস। (২) নিয়ম—"আমি অসঙ্গ-অবিক্রিয়-সর্ব্বগত ব্রহ্ম"—এই প্রকার ধারণার প্রবাহ এবং ব্রহ্মভিন্ন-বোধের তিরস্কার অভ্যাস করা। (৩) ত্যাগ = বিশ্ব-চরাচর

সমস্তই ব্রহ্মে নাম-ও-রূপ সাহায্যে কল্পিত, আমার কিছুই নয়—এইরূপ ভাবনা অভ্যাস করা। (৪) মৌন—ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, এইরূপ চিন্তা অভ্যাস করা (৫) দেশ—ব্রহ্মের আদি-মধ্য-অন্ত কিছুই নাই এবং তাঁহা দ্বারা এই সব সতত ব্যাপ্ত—এই প্রকার চিন্তাধারা অভ্যাস। (৬) কাল—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু যে কাল তাহা ব্রহ্ম এই প্রকার চিন্তার ধারা অভ্যাস। (৭) আসন = যে সুখরূপ-ব্রহ্মচিন্তা করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা থাকে না সেই ব্রহ্মচিন্তা করার অভ্যাস। (৮) মূলবন্ধ—সর্ব্বভূত ও সর্ব্বভাবের মূলকারণ ব্রহ্ম—এই চিন্তা করার অভ্যাস। (৯) দেহসাম্য – যাহা স্বভাবতঃ **বিষম** পদার্থ (elementary) তাহাও ব্রহ্মেতে হয় লীন, এই ভাবে ব্রহ্মচিন্তা করা। (১০) দৃক্-স্থিতি—ব্রহ্মকে দৃষ্টি-দর্শন-দৃশ্যের বিরামস্থান রূপে চিন্তা করা। (১১) 'প্রাণ-সংযম (প্রাণায়াম)—"এতদ্বারা প্রপঞ্চ মিথ্যা", "এক ব্রহ্মই আছেন" এইরূপ চিন্তার অভ্যাস এবং তজ্জন্য বিষয়াদির উপেক্ষা। (১২) প্রত্যাহার—বিষয়সমূহে আত্মদৃষ্টি করিয়া চিন্মাত্রস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া। (১৩) ধারণা—যেখানেই মন যায় সেইখানেই ব্রহ্মদর্শন। (১৪) ধ্যান—"ব্রহ্মই আছেন", এই প্রকার ঐকান্তিক বৃত্তি বশতঃ নিরালম্বভাবে মনের স্থিরস্থিতি। (১৫) **সমাধি**—অন্তঃকরণকে নির্ব্বিকার ও ব্রহ্মাকার করিয়া সম্যক্‌রূপে বৃত্তি-বিস্মরণ।

মনে রাখিতে হইবে **সমাধির আছে ৪টী বিঘ্ন :**— (১) "লয়" = অনন্ত ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া চিত্তবৃত্তির নিদ্রা (= আলস্য); ইহা দূর করার কৌশল—সৎসঙ্গ, ভগবৎশরণাগতি ও গাঢ় গুরুভক্তি। (২) "বিক্ষেপ" = চিত্ত হয় অন্যনিষ্ঠ; দূরীকরণ ধৈর্য্য ধ'রে ভগবৎকৃপার আশায় থাকা। (৩) "কষায়" = নানাবিধ বাসনার উদয়; দূরীকরণ হয়—বাসনার বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হওয়া (Reasoning দ্বারা) (৪) "রসাস্বাদ = সবিকল্প সমাধির উল্লাসে

"আহ্লাদে আটখানা" হওয়া ; দূর হয় বিবেক+প্রজ্ঞা দ্বারা।

৩য়—ভক্তিমার্গ ঃ—

শাণ্ডিল্য-গোত্রের আদিপুরুষ শাণ্ডিল্যমুনি সামবেদীয় ঋষি ; ৪ বেদ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থানুধাবন করিয়া পরমশ্রেয়ঃ (=মোক্ষ) লাভ করিতে না প্যারায় অনন্তর ভক্তিসূত্র প্রণয়ন করিয়া ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরমতত্ত্বের প্রতি শুদ্ধতত্ত্বের যে অনাবিল আকর্ষণ তাহাই আসলভক্তি ; ভক্তি=সগুণব্রহ্মবিষয়ক চিত্তের একাগ্রতাসাধক জ্ঞানময় কর্ম্মাদির সনিষ্ঠ অনুষ্ঠান। নির্গুণব্রহ্মে হয় না ভক্তি।

ভক্তি মানবের সহজাত ধর্ম্ম ; যতদিন এই ধর্ম্মের সম্যক্ বিকাশ না হয় ততদিন বেদে অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনে অধিকারই হয় না। ভক্তি বড় লজ্জাশীলা, অন্দরমহলেই তাঁর বাস। ত্রিবেণীর গুপ্তধারা সরস্বতী অন্তঃসলিলা যেন যোগীর সুষুম্না ; ত্রিবেণীর অপর দু'টী ধারা গঙ্গা ও যমুনা যথাক্রমে ঈড়া (কর্ম্মনাড়ী) ও পিঙ্গলা (জ্ঞান নাড়ী), আর সুষুম্না হয় ভক্তিনাড়ী।

কর্ম্মই (=প্রকৃতি, প্রকাশ) বাদ ; জ্ঞান অদ্বৈতবাদ ; আর ভক্তি দ্বৈতবাদ। "অন্তর্বহির্হরির্যদি তপসা ততঃকিম্।
নান্তর্বহির্হরির্যদি তপসা ততঃকিম্॥"

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃকিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসাততঃকিম্॥ নবধা ভক্তিলক্ষণম্ ঃ—অর্চ্চনা-বন্দনা-দাস্য-সেবন, স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, সখ্য, **আত্মনিবেদন** ; শ্রদ্ধেয় সমীপে ভক্তের শিষ্টাচারপ্রণালী পঞ্চবিধ ঃ—ধীর-স্থির-শুশ্রূষু-বিনীত-গুরুজনের আদেশপালনে **উদ্যত বা তৎপর**। বাক্যমনের অতীত, ইন্দ্রিয়াতীত বা অতীন্দ্রিয় বস্তু যে পরমাত্মা, তাঁকে উপাসনা-আরাধনা দ্বারা মানব চায় করিতে **ইন্দ্রিয়ভোগ্য** ; ভক্তি-

সাধনই তাহার প্রধান উপায়। ভক্তিহিম তথা অতীন্দ্রিয় প্রেম, কতখানি হইলে জমাট্ বাঁধে বা জড় হইয়া যায়—স্থূলে পায় প্রকাশ, তাহা ধারণাতীত। যতদিন স্থূলদেহ আছে, ততদিন স্থূলের অতীত বস্তুর প্রতি যতই মানব আসক্তিযুক্ত হউক না কেন, স্থূল যে তাহার একান্ত প্রিয় তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না। মানব অত্যধিক মাত্রায় স্থূলত্বপ্রিয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাহার নিজেরই দেহাত্মবোধ ; সুতরাং তাহার প্রিয়তমকে (ঈশ্বরকে বা আত্মাকে) ঠিক নিজের মত স্থূলে আনিয়া আদর করিবে, সেবা করিবে, ভোগ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক।

তথাকথিত যোগমার্গ হইতেই উদ্ভব এই ভক্তিমার্গের ; মানবের যখন একটু একটু করিয়া ভগবৎসত্তায় বিশ্বাস আসে তখন হইতে আরম্ভ হয় দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে দ্রব্যাদি অর্পণ ; এইরূপ কিছুদিন করার পর, সাধক আর মাত্র দ্রব্য অর্পণ করিয়া তৃপ্তি পায় না, একটু একটু করিয়া সাধনভজন আরম্ভ করে→তপোযজ্ঞ→ইহাতে দেহমন হয় শুদ্ধ। অতঃপর সাধক লাভ করেন যোগযজ্ঞের অধিকার ; তখন ভগবানের সহিত যোগ-সংযোগ রাখিয়া যাবতীয় কর্ম্মই ব্রহ্মার্পণ রূপে করেন ; এইরূপে কিছুদিন ভগবানের সহিত যোগ বা মিলন সংঘটিত হ'লে, উদয় হয় ভগবানের প্রতি ভালবাসা-আসক্তি-বা-ভক্তির। **এই ভক্তি** যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রেমে পরিণত হয় তখনই নিষ্পন্ন হয় স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ স্বরূপের অধ্যায় বা উপলব্ধি ; এই রূপেই লাভ হয় মহাজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকাররূপ **মুক্তি**। প্রেমে আত্মহারা হওয়ার নামই আত্মদান বা **মুক্তি** বা "আমিত্ব-বিলয়"।

পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের উপদেশ :—যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি। প্রথম ৫টী বহিরঙ্গ সাধন, এবং শেষ তিনটী অন্তরঙ্গ সাধন বা তান্ত্রিকী পরিভাষায় বলে **"সংযম"**॥

চিত্তকে দেশবিশেষে (নাভিচক্রে, নাসিকাগ্রে হৃৎপদ্মে প্রভৃতি

আধ্যাত্মিক প্রদেশে অথবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন ভগবন্মূর্ত্তিতে, কোন ভূতে বা ভৌতিক পদার্থে) বন্ধন করিয়া রাখার নাম **"ধারণা"**। "প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে। এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥"

"ধারণা" সুখসাধ্যসাধন নহে। ধারণা-নামক যোগাঙ্গ আয়ত্ত করিতে হইলে, শাস্ত্রোপদেশানুসারে রাগ দ্বেষবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা (= পরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য-ন্যায় ও পাপ-অন্যায় দেখিলে যথাক্রমে মৈত্রী-সখ্যতা-সৌখ্য, দয়াকরুণা, প্রণামশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা করার নাম মৈত্র্যাদিভাবনা) প্রথমে চিত্তকে করিতে হবে প্রসন্ন— নির্ম্মল, যম-নিয়মাদি সাধনে হ'তে হবে সিদ্ধ। এইরূপ করিলে তবে অধিকার জন্মিবে ধারণা করার। ধারণা সিদ্ধ হইলে, ধ্যান ও সমাধি অনায়াসেই হয় সিদ্ধ। ধারণার গাঢ়াবস্থাই ধ্যান এবং ধ্যানের গাঢ়াবস্থাই **সমাধি**। পতঞ্জলি বলেন—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"। আর, "তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"—অর্থাৎ যে দেশে—যে বিষয়ে চিত্ত হইবে ধৃত, যে-পদার্থকে ধ্যেয়রূপে গ্রহণপূর্ব্বক বন্ধন করিবে চিত্ত, তদ্দেশ-বা-তদ্বিষয় ত্যাগ করিয়া চিত্ত যদি দেশ-বা-বিষয়ান্তরে গমন না করে, ধ্যেয় বিষয়েই যদি প্রত্যয়ের—চিত্তবৃত্তির একতানতা হয়, ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞান যদি অনন্তরিত বা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হয়, তবে তাহাকে বলা হইবে ধ্যান। এই ধ্যানই যখন শুদ্ধ ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আমি ধ্যান করিতেছি, ধ্যেয় স্বভাবাবেশবশতঃ ইত্যাদিরূপ ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহা হইবে "সমাধি"। পড়ুন পৃঃ ২৫৮-২৬৪

ভক্তি যে মুক্তির উপায়—সে সম্বন্ধে দু'জন সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎভক্তের অভিমত প্রদত্ত হয় নিম্নে সুধী পাঠকবর্গের বিবেচনার জন্য :—

শঙ্করাচার্য্য (৭৮৮ খৃঃ) ভগবদ-ভক্তি	রামানুজ (১০১৭ খৃঃ) ভগবৎ-ভক্তি
১। (ক) আপনাকে—নিজেকে মনে করা "ভগবানের" = দাস্যভাব	১। (ক) স্বীকার্য্য
(খ) ভগবানকে মনে করা "আপনার" = শান্ত ভাব	(খ) স্বীকার্য্য
(গ) ভক্ত ভগবানে অভেদ হ'য়ে যাওয়ার কথা।	(গ) অসম্ভব
২। শান্ত ভাবেরই বেশী পক্ষপাতী।	২। শান্তভাব নাই : দাস্যভাবই বেশী।
৩। দেহাভিমানযুক্ত দশায় দাস্যভাব বা সন্তান ভাবের পরিচয় দেয় তাঁর প্রণীত (i) বিশ্বেশ্বর স্তব, (ii) গঙ্গাস্তব, (iii) নারায়ণ-স্তোত্র, (iv) সূর্য্যস্তোত্র, (v) শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্ (vi) অচ্যুতাষ্টকং, (vii) ভবান্যষ্টকং ইত্যাদি।	৩। কেবল দাস্যভাব।
৪। পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিজ-আত্মাকে সর্ব্বদেবে অনুস্যূত এক অদ্বয়পরতত্ত্বে একীভূত, বা একীভূতজ্ঞান করিতেন।	৪। নিজেকে মনে করিতেন "অবতার"।
৫। সুবিদিত ঔদাসীন্য।	৫। সুবিদিত আসক্তি।
৬। সকল দেবতার অন্তর্গত সূক্ষ্মতম এক সাধারণ ব্রহ্মতত্ত্বই উপাস্য।	৬। সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণই এক মাত্র উপাস্য।
৭। অদ্বৈতবাদী।	৭। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।
৮। এক অদ্বৈত নির্বিশেষব্রহ্মতত্ত্বই সত্য, অপর সব মায়া।	৮। জীব-ও জড়বিশিষ্ট একঅদ্বৈত তত্ত্বই সত্য; মায়া কিছুই নহে।
৯। মুক্তি = ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ ; কিন্তু ইহাও পরমার্থতঃ আকাশ-কুসুমসম অসম্ভব ॥	৯। মুক্তি = বৈকুণ্ঠবাস ও নারায়ণের চিরকৈঙ্কর্য্য।

শঙ্করের মতে বৈকুণ্ঠবাস এক প্রকার স্বর্গবাস মাত্র ; মুক্তি নহে।

পূর্ব্বকথিত শঙ্করের "শান্তভাব" ও রামানুজের "দাস্যভাব" সমালোচনায় বলা যায়—"শান্তভাব" সূচিত করে সর্ব্বকর্ম্মের পূর্ণবিরতিতে শান্তি অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন-মোচন বা যথার্থ-মুক্তি ; আর, "দাস্যভাব" সূচিত করে প্রভুর আদেশ পালনে সদাই কর্ম্মব্যস্ততা। সুতরাং মুমুক্ষু মহাশয়ের লক্ষ্য যেহেতু মুক্তি বা কর্ম্মবন্ধন-মোচন, সেহেতু তাঁকে ভক্তি-মার্গের দাস্যভাবই তাঁর শিরোধার্য্য করিলে মুক্তির (=ছুটীর) যে আশা নেই—তাহা বেশই সুখবোধ্য। অতএব, মুমুক্ষুকে মনন করিতে হইবে অণুক্ষণ যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাই একমাত্র সত্য যাঁহাতে নিত্যযুক্ততা উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মীস্থিতি, "সৎ"-এর কোলে চিৎ-"রূপিণী" চিন্ময়ী মহতী শক্তি ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত "সৎ"-বস্তুতে বা "সত্যে, তাই তাঁকে নিঃসংশয়েই বলা যায় **"সত্যবতী"**—বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপা—ইঁনিই সমস্ত চরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মহতী চিতিশক্তি, ইনিই জগজ্জনী-জগদ্ধারিণী-জগৎপালিনী-জগৎবিমোহিনী-জগৎপ্রণাশিনী মহামোক্ষপ্রদায়িনী ; আপন গাত্র হইতে সন্তান উৎপাদন করিয়া আবার আপন গাত্রেই সন্তানকে মিলাইয়া ল'ন—ইহাই তাঁহার লীলা। লীলাকৈবল্যবশতঃ ব্যবহারিকক্ষেত্রে তাঁর জীবসন্তানের গাত্রে সঞ্চিত বহু মল। তাই এই মলমুক্ত না করিলে সন্তানকে, মানুষ-মায়ের মত বুক ভ'রে ভাল বাসিতে পারেন না, প্রাণ ভ'রে আদর করিতে পারেন না ; এবং মলমুক্ত না হ'লে সন্তানও যে জননীর অপারস্নেহ ভোগ করার স্থান পায় না ; সঙ্কীর্ণ স্থান তাহার ক্ষুদ্র ব্যষ্টিবুক মলে অশুদ্ধ সেই বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপা জননীর গাত্রে মিলিতে হ'লে জীব-সন্তানকে হ'তে হবে নিশ্চয়ই মল-মুক্ত। তাই সেই সত্যবতী-মায়ের অনন্ত **প্রেমসিন্ধুতে** অবগাহন স্নান করার সুযোগ দিবার পূর্ব্বে জীবকে বন্ধন-যাতনা অনুভব করাইয়া মুক্তির দিকে টানিয়া লইতেছেন, বন্ধনজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ না

পাইলে আসে না মুক্তিরূপ আনন্দ। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের আধিপত্য হইতে চিরমুক্ত হইয়া, চিরশান্তিময় অনন্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে —অপার প্রেমসমুদ্রে চিরতরে নিমগ্ন হইবেন এবং কবে বর্ত্তমান কাল-প্রবাহের অগণিত তরঙ্গভঙ্গ হইতে তাঁহার দৃষ্টি অপসৃত হইয়া মহামুক্তি ক্ষেত্রে হইবে প্রসারিত তাহারই জন্য মুমুক্ষু করেন অপেক্ষা; সেখানে বিরাজমান পূর্ণ স্বাধীনতা। তাই সত্যবতী-মা সন্তানস্নেহে বিহ্বলা হইয়া যেন, ভাবে ভাবে সন্তানের পরিতৃপ্তি-সাধনে নিয়ত নিরতা থাকিয়া, ভাব-অধীনতার (=দাস্যভাবের) হস্ত হইতে প্রিয় মুমুক্ষু সন্তানকে চিরমুক্ত করিয়া লইবার জন্য ধীরে ধীরে তাহার অজ্ঞাতসারে বন্ধনের— ভাববিদ্রোহের করেন আয়োজন অথবা মঙ্গলের পূর্ব্বায়োজন ইহা সত্য-বতীমায়ের মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছার পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধনরূপ ক্রূর আয়োজন মাত্র! প্রেমিক ভক্তিবাদীর প্রেমের তরেই মুক্তির প্রয়োজন! নারায়ণের চিরকৈঙ্কর্য্যও একটা বন্ধন মাত্র—নারায়ণের স্নেহডোরে বাঁধা পড়া—বন্ধন! মুক্তি-বিরোধীর ভাগ্যে অগাধ প্রেমসাগরে স্বাধীন ভাবে সন্তরণ ও অবগাহন স্থান নাই। স্মর্ত্তব্য শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ (পৃঃ ৭০) বিষ্ণু জগদ্ব্যপক চৈতন্য—মুক্তি দাতা; জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক সাধনাই বহন করে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে। অর্থাৎ সাধকগণ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ উভয়াত্মক সাধনাবলে বিষ্ণুর পরমপদের পায় সন্ধান। কেবলকর্ম্ম কিংবা কেবলজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না লাভ; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় দ্বারাই মোক্ষ হয় লাভ; সুতরাং এতদুভয়াত্মক কর্ম্মই সাধনা। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না, কর্ম্মও হয় না; ভক্তি মানুষের সহজাত ধর্ম্ম। স্বরূপ ভক্তের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ভক্তিরও হয় বৃদ্ধি; কিন্তু অজ্ঞানের ভক্তির ভাণ অসারভক্তি, লোকদেখানো চাটুকার ভক্তের ভক্তি; এবং "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ"—প্রবাদটারও আছে তাৎপর্য্য!

বন্ধনমোচনে জীবন্মুক্তি

১। দেহাবাচ্ছিন্নপুনুষে যা মুক্তিঃ পরিজায়তে।
জীবন্মুক্তির্বুধৈঃ প্রোক্তা জীবন্মুক্তস্তয়াযুতঃ॥

২। অহঙ্কারময়ীং ত্যক্ত্বা বাসনাং লীলয়ৈব যঃ।
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সন্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

…………এই মুক্তি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের হয় না, যথা—শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে"। জীবন্মুক্ত আচার্য্যের প্রসাদে ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে তাঁহার হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি (=আত্মার সারূপ্য লাভ), এবং তিনি হ'ন জীবন্মুক্ত; জীবন্মুক্ত হইলে মহাপ্রলয়ে তাঁহাদেরই হয় নির্ব্বাণ মুক্তি; যথা—

শরীরেণানবচ্ছিন্নে জীবে মুক্তিশ্চ যা ভবেৎ।
সা জ্ঞেয়া পরমা মুক্তিস্তয়া নির্ব্বাণমুক্তকঃ॥

শরীরেণ অনবচ্ছিন্নে (ন+অবচ্ছিন্নে—ছিন্নে বা) জীবে অর্থাৎ যে জীবে শরীর হয় নাই ছিন্ন, কথান্তরে জীবিত কালেই। পরমামুক্তি = চরমামুক্তি বা নির্ব্বাণমুক্তি; নির্ব্বাণ=নিঃ (নাস্তি) বাণঃ যস্মিন্ (তৎ, সা, সঃ), বাণঃ=শর (তীর), শব্দ (ধ্বনি) অর্থাৎ যথায় নাই শব্দ; বা যে স্থান শরদ্বারা (=ইন্দ্রিয় দ্বারা) লক্ষিত হয় না; কথান্তরে পরমাত্মক্ষেত্র। মুক্তির স্তর তিনটী :—ক্রমমুক্তি→বিকলেবরকৈবল্য→নির্ব্বাণ অর্থাৎ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা (পরমাত্মক্ষেত্রে)। এই প্রসঙ্গে আসে প্রলয়কথা; প্রলয় চারিপ্রকার, নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রাকৃতিক-আত্যন্তিক। প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্ন উঠে—শ্রুতির কথায় "সর্ববিদ্যা ক্রিয়াপরা"; যদি ব্রহ্মবিদ্যা হইতে সমস্ত বিদ্যাই ক্রিয়াপরা হইল, তবে ক্রিয়ার পাপ পুণ্য জনিত সুখ ও দুঃখরূপ ফল আছেই, যদি ক্রিয়াফল হইল মোক্ষ বা মুক্তি, তা'হলে ঘটপটাদির ন্যায় তাহার (মোক্ষের) অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়; ঘট যেমন নাশ্য পদার্থ, তেমন মোক্ষও নাশ্য!

ইহার উত্তর গীতার ৭।১৯॥ আরও শ্রুতি বলেন—যে পুরুষ স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা ঐহিক সাম্রাজ্য ও পারলৌকিক মোক্ষ লাভ ক'রেছেন ভোগান্তে তাঁহার ঐ কর্ম্মফল হয় বিনষ্ট; আর যে পুরুষ জ্ঞানযোগ দ্বারা ঐহিক সাম্রাজ্য ও পারলৌকিক মোক্ষ লাভ ক'রেছেন তাঁহারও

ভোগান্তে নষ্ট হয় ঐ কর্ম্মফল। স্মৃতি বলেন, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি"; অতএব ক্রিয়া আচরণে অর্থাৎ কর্ম্মে আছেই দুঃখ→ফলে স্পর্দ্ধাদুঃখ, ভোগান্তে পতন দুঃখ; ক্রিয়াতে দুঃখ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না।

সমাধানে বলা যায়—তাপত্রয় (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) নিবৃত্ত হ'লে নিত্যসুখ (মোক্ষ) হয় লাভ; এই মোক্ষও ত্রিবিধ—ক্রমমোক্ষ, বিকলেবরকৈবল্যং ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠা; স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় (১) সালোক্য (=উপাস্য দেবতার লোকে (=স্থানে) বাস) (২) সান্নিধ্য (=উপাস্যের নিকটে বাস) (৩) সাযুজ্য (=উপাস্যের সমান যোগ্যতা লাভ) (৪) সারূপ্য (=উপাস্যের সমান রূপ লাভ), (৫) সাষ্টি (= উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্য)।

ক্রমমোক্ষ, বিদেহকৈবল্য, স্বরূপপ্রতিষ্ঠা—এই ত্রিবিধ মোক্ষ হইলে তবে হয় নির্ব্বাণ মুক্তি। ক্রিয়াফলের সুখদুঃখ জনকত্ব আছে, ত্রিবিধ মোক্ষরূপ নিত্যসুখের ধ্বংস = নির্ব্বাণ মুক্তি।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে।

বিহায় তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমৈপতি দিব্যং।

[স্যন্দমানা = বেগবতী] নদীর মত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষে পৌঁছিয়া যান অস্ত (= অবসান ঘটে)। এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য—জীবের ৮০ অশীতি লক্ষ যোনির (উৎপত্তিস্থান) পর চারিলক্ষ হয় মানব যোনি। জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় জীব সম্বন্ধে প্রতিদিন হয় উৎপত্তি-স্থিতি-লয়। এই লয়কে বলে নিত্য-প্রলয়; ঐ সুষুপ্তিতে (নিত্য-প্রলয়ে) জীব দিব্য শরীরের ভেদ অবলম্বন করিয়া তদুচিত ভোগসকল করে ভোগ অর্থাৎ লাভ করে ব্রহ্মানন্দ: ঐ নিত্য প্রলয়ান্তে অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থায় স্বীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া সুষুপ্তি অবস্থার সংস্কারবশতঃ বলিয়া থাকেন—"আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছু জানি না"। ∴ জীবের স্বভাবজ কর্ম্মজন্য নিত্যপ্রলয়ে

লাভ হয় ব্রহ্মানন্দ, অন্য যোনির তাহা হয় না, যেহেতু তাহারা স্বীয় স্বীয় বিষয়জ্ঞানবিশিষ্ট ; নাই তাদের পরমার্থজ্ঞান। এবং নৈমিত্তিক প্রলয়ে অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মার দিনাবসান নিমিত্তক ত্রৈলোক্যের লয়কে বলে নৈমিত্তিক প্রলয়, কার্য্যব্রহ্মা নিজ দিনাবসানে ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া শয়ন করেন, এবং নিজরাত্রির অবসানে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করেন জগৎ। দ্রঃ গীতা ৮।১৯।

জীবন্মুক্তপুরুষের হয় না আর জন্ম ; যেহেতু প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মসকলকে জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান দগ্ধ করিয়া ফেলে যাহাতে আর অঙ্কুর হ'তে না পারে, অগ্নিদগ্ধ বীজেতে যেমন অঙ্কুর হয় না সেরূপ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশেতে জীবাত্মা পুনঃরায় আবির্ভূত হ'ন না। দ্রষ্টব্য গীতা "যথৈধাংসি সমিদ্ধ........জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধকর্ম্মের নিশ্চয়ই ভোগ হয় ; জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা অনারব্ধ কর্ম্মসকল হয় দগ্ধ, অর্থাৎ তাহার নির্বীর্য্য হেতু আর অঙ্কুর হয় না। জীবন্মুক্তপুরুষের প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের জন্য শরীর ধারণে কোন দোষ দেখা যায় না ; এবং তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার জন্মেরও নাই সম্ভাবনা।

শ্রুতি—"প্রারব্ধ নিশ্চয়াদ্‌ভুঙ্‌ক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে।
অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নির্বীর্য্যং ক্রিয়তে তথা॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ" ॥

আদি-মুক্ত পুরুষের স্বসম্বেদনের স্বগতোক্তি, "একোঽহম্ বহুস্যাম" —তাই তাঁর স্বেচ্ছায় **বন্ধন**লীলারূপ সৃষ্টি এবং তাঁরই স্বেচ্ছায় **মুক্তি-লীলারূপ** প্রলয়। সৃষ্টি মানে মায়োপহিত চৈতন্যের মহতী চিতিশক্তির ঘনীভূত প্রকাশ জড়শক্তিরূপে জটিল জমাট্‌বাঁধা শৃঙ্খলান্বিত রূপ। পাটিগণিতের ভগ্নাংশ-দশমিকের লব-হরযুক্ত $\left(=\frac{\text{numerator}}{\text{denominator}}\right)$ ও-বন্ধনী

(= vinculum and 1st, 2nd and 3rd brackets) সমন্বিত অঙ্কপাশের জটিলতা হইতে এই জটিলতার কতকটা অনুমান হ'তে পারে। এইরূপ সুদীর্ঘ জটিল অঙ্কপাশকে ধৈর্য্য ও মনোনিবেশ সহকারে সরলীকরণের নিয়মানুসারে অঙ্ক কষিয়া পাশমুক্ত বা বন্ধনীমুক্ত করিয়া যখন নির্ভুল সমাধানে উক্ত জটিল সুদীর্ঘ অঙ্কটীর শেষ স্বল্পসংখ্য উত্তরটী হয় ঠিক অর্থাৎ নির্ভুল, তখন নিশ্চিতই হয় অঙ্ককারীর উল্লাস ও আনন্দ। বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রের "বন্ধন-মুক্তি" বা "বন্ধন-মোচন" এর বেলায় ও হয় সেই আনন্দ ও সেই উল্লাস; অবশ্য উল্লেখ থাকে যে, পারমার্থিকক্ষেত্রের মুক্তি-অবস্থার শেষ উত্তরটী হওয়া চাই পূর্ণ এক সংখ্যা (১), অথবা শূন্য অ-সংখ্য (= 0) শ্রুতির কথায়—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

আর তার পাশে অখ্যাত নাস্তিকের কথায়–

শূন্যমদঃ শূন্যমিদং শূন্যাৎ শূন্যমুদচ্যতে।
শূন্যস্য শূন্যমাদায় শূন্যমেবাবশিষ্যতে ॥

বেদব্যাসের কথায়—"ষড়্‌বিংশ" বা নিস্তত্ত্ব পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন; মাত্র ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে পরিচ্ছিন্ন হ'য়ে হ'লেন ২৫টী জটিল তত্ত্বসমন্বিত—তত্ত্ব যুক্ত [দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৩৪]। অগণিত ব্যষ্টির আশ্রয়রূপী সর্ব্বসমষ্টিই = পূর্ণ, এই পরব্রহ্ম, ইনি দেশ-কাল-বস্তু কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন নহেন, ইঁনি অনন্ত অচ্যুত ইঁনি সত্য (= অব্যভিচারা)। ইনিই জ্ঞান। সত্তা-চিৎ-আনন্দের অবাধিত অবস্থাই বস্তুতঃ পূর্ণাবস্থা; প্রকৃত পূর্ণাবস্থার রূপ বেদই বর্ণনা ক'রেছেন। অপূর্ণ কখনও প্রকৃতপূর্ণের রূপ ধারণা করিতে পারে না, পূর্ণ না হইয়া কেহ কখন পূর্ণকে জানিতে পারেন না। শাস্ত্রমতে আত্মদর্শনই মানবের চরম উন্নতি, আত্মদর্শন হইলেই জীবের পরিণাম-

ক্রমের হয় পরিসমাপ্তি। আনন্দময় সুখস্বরূপ দেশতঃ, কালতঃ, ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মভাবে অবস্থান করিতে না পারিলে, ভূমা সুখের নাই আশা। তাই বন্ধ-তত্ত্বযুক্ত পরিচ্ছিন্নকে হ'তে হবে তত্ত্বমুক্ত ও অপরিচ্ছিন্ন। সঙ্কীর্ণপরিসর কূপে থাকিয়া পান করা যায় না আকাশব্যাপিনী সুধাময়ী চন্দ্রিকা। শাস্ত্র কথা—যে ব্যক্তি পরমব্যোম-রূপ গুহাতে (=অবিভক্ত আকাশরূপ আবরণীতে—ঢাক্‌নীতে) নিহিত ব্রহ্মকে পারেন জানিতে, তিনি সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থানপূর্বক ভোগ করেন পরমানন্দ। গুহানিহিত ব্রহ্মকে জানিতে হইলে পঞ্চকোশের বিবেচন প্রয়োজন; পঞ্চকোশের বিবেক দ্বারাই গুহানিহিত ব্রহ্মকে জানা সম্ভব। গুহা=√গুহ (আচ্ছাদন করা)+ক অধি+আপ্, কোশ(বা কোষ)-ও ব্যক্তা-বস্থার বাচক; যাহা স্থূল, যাহা ব্যক্ত, অর্থাৎ যাহা কার্য্য তাহা কার্য্য-কারণাত্মক, তাহার অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা (=অন্তর্ভাব) আছে নিশ্চয়ই। স্থূলের সূক্ষ্ম দেখিতে হইলে বা কার্য্যের কারণ জানিতে হইলে প্রবেশ করিতে হয় স্থূলের অন্তরে। যাহা যাহার কারণ, যাহা যাহার অন্তর্ভাব, তাহা তাহার আত্মা। বাহ্য বা ব্যক্তভাব "শরীরাত্মা", অন্তর্ভাব বা অব্যক্ত "অন্তরাত্মা"। "শরীরাত্মা" ও "অন্তরাত্মা" ভেদে আত্মাকে বলা যায় দ্বিবিধ। বিকার বা কার্য্যপদার্থের অবস্থা দ্বিবিধ, "অন্তঃ" ও "বহিঃ এবং কার্য্য বা বিকার মাত্রই কারণগর্ভধৃত। নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম-পরমাত্মা ব্যতীত সকলেরই পশ্চাতে আছেন অন্তরাত্মা (=অন্ত-আত্মা)। অন্নময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা—প্রাণময়কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব (=শরীর); এইরূপ প্রাণময় কোষাধিষ্ঠিত আত্মা—মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব (=শরীর); মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা—বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব (=শরীর); বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা আবার আনন্দময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব (=শরীর)। সুতরাং অন্নময়

কোষের অন্তরাত্মা প্রাণময়কোষ ; প্রাণময়কোষের অন্তরাত্মা মনোময়-কোষ ; মনোময়ের অন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়কোষ এবং বিজ্ঞানময়ের অন্তরাত্মা আনন্দময়কোষ। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় —এই কোষচতুষ্টয় (=সূক্ষ্ম ও কারণশরীর) অদৃশ্য ; সূক্ষ্মশরীর-তত্ত্ববিদ্ যোগিগণেরই এই কোষচতুষ্টয় দ্রষ্টব্য এবং সমাধিছুরিকা দ্বারা ব্যবচ্ছেদ্য। তবে চিন্তাশীল অনুমানপ্রমাণের সাহায্যে অনুমান করিতে পারেন ইহাদের অস্তিত্ব।

যাহা পরমকারণ, যাহা সর্ব্বাভ্যন্তর, যাহা সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ তাহা পরমাত্মা ; তাই শাস্ত্রব্যাখ্যা যে পঞ্চকোষ বা স্থূলাদি শরীরত্রয়ের বিবেচনাদ্বারা কার্য্যকারণতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা ; কার্য্যমাত্রেরই আছে স্থূল বা বহিঃ ও সূক্ষ্ম বা অন্তঃ অবস্থা। আন্তর অবস্থা বাহ্যাবস্থা হইতে ব্যাপকতর—ইহা প্রতিপন্ন করেন শাস্ত্র ; কিন্তু সাধারণের সহজজ্ঞানে হয় প্রতীয়মান যে বাহ্যই হয় ব্যাপকতর, অন্তরকেই সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর বলিয়া, এবং বাহ্য প্রকৃতি হইতে আন্তরপ্রকৃতিকেই পরিচ্ছিন্ন বা সঙ্কীর্ণ মনে করা হয় ; এবং আরও বেশ বোঝা যায় না শাস্ত্রের কথা—যে আত্মাই অন্তরে আত্মাই বাহিরে, আত্মা সর্ব্বভূতে ও আত্মাতেই সর্ব্বভূত বিরাজমান। এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের কারণে বলা যায়— অবিদ্যা বা অবিবেকই তাহার কারণ ; রজঃ ও তমঃ বা রাগ ও দ্বেষ এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ মানুষের আত্মজ্ঞান হইয়াছে সঙ্কীর্ণ, মানুষের ধর্ম্ম-জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি হইয়াছে নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন তাই মানুষ আত্মার প্রকৃতরূপ দেখিতে পায় না, তাই তাহার পরবুদ্ধি এত প্রবল, তাই তাহার বাহ্যকেই অন্তর হতে ব্যাপকতর মনে করে। তাহার আত্মজ্ঞান মলিন হইয়াছে বলিয়াই তো কর্ম্মকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দু'ভাগে ভাগ করে মানুষ। যে সকল কার্য্যের কারণ মানুষের বহিঃস্থিতরূপে হয় প্রতীত, সেই সকল কর্ম্মকে সে বলে স্বয়ংসিদ্ধ। শাস্ত্রের উপদেশ—কর্ম্মমাত্রই বুদ্ধিপূর্ব্বক, সকল কর্ম্মই সঙ্কল্পমূলক; সঙ্কল্পেরই করিতে

হইবে পূজা, সঙ্কল্পতত্ত্ব জানিয়া যে ব্যক্তি দৃঢ়-সঙ্কল্প হইতে পারে সে হয় কামচার— তাহার কোন কামনাই অতৃপ্ত থাকে না, কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে ; ইচ্ছাশক্তিই (Will force) সর্ব্বশক্তির মূল। সংকল্প-শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি জড়শক্তির উপর করে আধিপত্য।

জীবব্রহ্মের একত্ব যখন সাধক বুঝিতে পারে তখনই ধীরে ধীরে তাহার জীবত্ববন্ধন, কর্ম্মসংস্কার, দেহাত্মবোধ প্রভৃতি স্খলিত হইতে আরম্ভ হয়। জ্ঞান যতদিন সংশয়রহিত ও বিপর্য্যয়-প্রতীতিরহিত না হয় ততদিন সংসারসংস্কারশ্রেণীয় আধিপত্য হয় না বিদূরিত। [বিঃ দ্রঃ বিপর্য্যয় ৫টী যথা, (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ (৫) মৃত্যুভয়]।

অস্মিতা ও মমতাই বন্ধনের প্রধান কারণ। মুমুক্ষুর লক্ষ্য—এই দু'টীর বিলয়সাধন। অস্মিতানাশ মানে বুদ্ধিনাশ, যেহেতু বুদ্ধি ও অস্মিতা অভিন্ন। বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বই অস্মিতা ; যাহা যথার্থ "আমি" তাহা কিন্তু প্রতিবিম্ব নহে, স্বয়ংচিৎ। অস্মিতাও নিতান্ত সহজ বস্তু নহে—উহা বহুজন্ম বহুযুগসঞ্চিত প্রতীতি বিশেষ। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াহৃত বিষয়সমূহের প্রকাশক মাত্র। যখন চিত্তে আর কোন প্রকার বৃত্তিপ্রবাহ চলে না, প্রকাশকরূপে কিছুই থাকে না, তখন প্রকাশক যে বুদ্ধি, তাহারও হয় লোপ। এইরূপে স্মৃতি-ভ্রংশ হইতে হয় বুদ্ধিনাশ; বুদ্ধির নাশে অস্মিতার যে আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা তাহা সম্যক্ হয় বিলুপ্ত। পরমপ্রেমময় পরমাত্মস্বরূপে একান্ত মুগ্ধ হইলে, নিজের পৃথক অস্তিত্ববিষয়ক স্মৃতি হয় বিলুপ্ত। দ্রষ্টব্য গীতা ২।৬৩

আরও, আত্মার প্রকাশে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হ'লে অস্মিতা অবধি অর্থাৎ প্রকৃতি পর্য্যন্ত যাবতীয় অনাত্মবস্তু-বস্তুর সত্তা সম্যক্ হয় বাধিত ; তথাপি যাবৎ-প্রারব্ধ উহাদের হয় অনুবর্ত্তন। তাহার ফলে স্থূলদেহধারণ, লোকশিক্ষা, উপদেশ, শাস্ত্র-প্রণয়ন, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্ম করেন সাধক। ইহাকে বেদান্ত বলেন "বাধিতানুবৃত্তি" এবং যোগ

দর্শন বলেন "নির্ম্মাণ-চিত্তের ফল"। সাধক যখন "আস্মিতাকে বা বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে হ'ন উদ্যত তখন তাঁর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরও কম্পিত বা সম্বেদিত হ'য়ে উঠে, যেহেতু ইহারা চিরতরে সত্তাহীন হ'তে চ'লেছে। যতদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মরূপে অবস্থিতি না হয়, ততদিন দেহাদি অনাত্মবস্তুর ভাণ হইবেই। প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয় হ'লে, সাধক লাভ করেন "বিকলেবরকৈবলং", তখন আর অনাত্মবস্তুর ভাণও হয় না। প্রবল প্রারব্ধ সংস্কার গুলি ক্ষয় হ'লেই হয় মুক্তি। এই জগৎ, এই দেহাদি ইহারা যে বিজ্ঞানমাত্র—এইরূপ প্রতীতির নামই মুক্তি; বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া দেহ বলিয়া অনাত্মা বলিয়া কোথাও কিছু নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না—ইহাই মুক্তপুরুষ আত্মজ্ঞের প্রতীতি।

গীতার উপদেশ মনের দাসত্বহেতু যে মানুষ মনোময় হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে মনোনাশ দুরূহ ও দুঃখজনক। মনোরাজ্যে "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"-রূপ সত্যজ্ঞান সঞ্চার হ'লেই সংস্কারপ্রবাহরূপী মনোনদ হইতে থাকে ক্ষীণ। নূতন সংস্কার যোগান-অভাবে ক্রমে ঐ প্রবাহ হয় শুষ্ক এবং মন পরিণত হয় বিচারপ্রাঙ্গনে—সুশোভন উর্ব্বরা জ্ঞান-শস্যোৎপাদিকা ভূমিরূপে দৃষ্ট হয় মন। যেমন নদী শুষ্ক হ'লে, থাকে নদ্যাধার উর্ব্বরা ভূমিক্ষেত্র, তেমন মন নষ্ট হ'লে অর্থাৎ শুকিয়ে গেলে, থাকে তার—মনের আধার ব্রহ্মমাত্রই থাকেন; এই মনাধার ব্রহ্মই হইল বিচারপ্রাঙ্গণ—জ্ঞানোৎকর্ষের ভূমি; যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানসত্তামাত্র—বিচারশক্তির উৎসমাত্র। আবার প্রশ্ন, ব্রহ্ম কিরূপে মনের আধার হইল? উত্তর—রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন ঐ ভ্রান্ত সর্পকে রজ্জুর বিবর্ত্ত বা মায়িক বিবর্ত্ত বলা যায়, তেমন ব্রহ্মেতে জগৎ ভ্রান্তি হইলে জগৎকে (মনঃকে) ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলা যায়। [বিঃ দ্রঃ এইরূপ জ্ঞান হইতেই বোধ হয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নাম রাখা হ'য়েছে]।

মনঃ ব্রহ্মেরই সূক্ষ্ম বিবর্ত্ত বিধায় মনের অধ্যাস ত্যাগ করা দুরূহ।

ভ্রান্তিময় দৃশ্যদর্শনোৎপন্ন স্মৃতি বা সংস্কাররাশিরূপ মনঃ ভ্রান্তিই। অনাদিকাল হইতে চলিতেছে ব্রহ্মে স্থূলরূপ জগদ্-ভ্রান্তি ও সূক্ষ্মরূপ মনোভ্রান্তি। একত্বজ্ঞান মূলক ব্রহ্মজ্ঞানে, আসক্তি হইতে উৎপন্ন নানাত্বমূলক জগৎজ্ঞান ও তন্মূলক সংস্কাররাশির নাশ হয় এরূপ জ্ঞান-সাধক আর জগদ্দর্শন করেন না। এই মনোরূপ স্মৃত্যাধারের নাশ হেতু "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি"।

সগুণ ব্রহ্ম তথা "ব্যবহারিক" (= জাগতিক) ক্ষেত্র হইতে নির্গুণ ব্রহ্মে তথা "কেবল-আত্মা" ক্ষেত্রে প্রবেশ ও স্থিতিই মোক্ষ। যেহেতু "ব্রহ্মৈব মোক্ষঃ", "ব্রহ্মভাব হি মোক্ষঃ", "স্বাত্মন্যাবস্থানং মোক্ষঃ," "চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ"। মোক্ষ হয় মনেরই; মনের যে স্বীয় বৃত্তি গুলির উচ্ছেদ, মনের যে ব্রহ্মভাব অর্থাৎ বিষয়ভাববর্জ্জিতা অবস্থা, মনের যে স্বীয় আত্মায় অবস্থিতি, উহাই মনের মুক্তাবস্থা।

চিদাভাসিত চিত্তই জীব, অর্থাৎ মনের উপর যে চৈতন্যের আভাস পড়ে, ঐ চিদাভাসযুক্ত মনঃই জীব। এদিকে অনাদিকাল প্রসিদ্ধ সংস্কার বা স্মৃতিসমষ্টিই মনঃ; এখন মনের নাশ করিতে পারিলেই তদুপরি পতিত চিৎপ্রতিবিম্ব স্বীয় আধারে বা অধিষ্ঠানসত্তায় অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে ফিরে যেতে পারে; তবেই চিৎপ্রতিবিম্ব ও স্মৃতিসমষ্টি-মনঃ এই দুইয়ের যুক্তপদার্থ যে জীব, সে হইল "মুক্ত" এবং সে বলিল—

"কেহ নাই, কিছু নাই, তুমি আর আমি
তুমি-প্রভু, আমি দাসী, হে প্রাণস্বামী।"

—:০:—

"কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধ'রবে যবে?
জীবনে তুই যা' নিয়েছিস
মরণে সব নিতে হবে।"

মর্ম্ম :—মৃত্যুতে মাত্র মূর্ত্তিরই হয় লোপ ; ভাব-সংস্কাররাশি সবই যাবে সাথে সাথে। অতএব মুক্তিকামীকে নির্ভাবনা নিশ্চিন্ত মনে মনন করিতে হইবে মরার কথায়।

মনুষ্যকে মুক্ত হইতে হইলে অর্থাৎ পরমাত্মায় যুক্ত হ'তে হ'লে, মধ্যবর্ত্তিস্বরূপ যে ঈশ্বরূপ আত্মা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া হ'তে পারে না। মানুষকে প্রথমে হ'তে হবে ঈশ্বর-আত্মা, ঈশ্বর-আত্মাই উপনীত হবেন পরমভাবে অর্থাৎ পরমাত্মায় ইহাই মুক্তি—ইহাই মূলতত্ত্ব।

এই যে নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা (পরমাত্মক্ষেত্র), ইহাই হইল জীবের চিরবিশ্রামের স্থান। এই অব্যক্ত জ্ঞানসত্তারূপী নির্গুণ আত্মায় যে চিরসমাহিত ও লীন হওয়া—ইহাই হইল মানবের পরম বা চরম প্রাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও চরিতার্থতা। এই নির্গুণ ব্রহ্মরাজ্যই শান্তিরাজ্য ও সত্যরাজ্য। সগুণ রাজ্যের দুঃখময় মহাশোচনীয় অবস্থা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থায় প্রত্যাগমনই মুক্তি। মিশ্র জটিলতাপূর্ণ বহুরূপ হইতে রূপান্তরিত হইয়া সরল অমিশ্র শুদ্ধবোধস্বরূপে পরিণত হওয়ার নামই মুক্তি ; কি রাসায়নিকের আধিভৌতিক মুক্তি, কি দার্শনিকের আধ্যাত্মিক মুক্তি—এই উভয় অবস্থায় আসার জন্য মনোময়ী মহতী ইচ্ছাময়ী মহামায়া মনোময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকটিতা আত্মমূর্ত্তিতে।

১৪। ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তিরহস্য

উপনয়নে-উপহার ১ম-২য়-৩য় ভাগের সমাপ্তিতে দ্বিজগণের অবগতির জন্য, সংক্ষেপে দেয়া যায় **ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তিরহস্য**—

বৈদিকযুগে কার্য্য ও গুণানুসারে মানবের যে পদবী হইয়াছিল, তাহাই বংশগত হইয়া পরিণত হইয়াছে জাতিতে। বৌদ্ধযুগে জাতির

পার্থক্য হইয়াছিল ধ্বংস। তৎপরে পুনঃরায় চাতুর্বর্ণ্যাশ্রম হয় প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানকালে আবার তাহাও ধ্বংস হইবার উপক্রম হইতেছে। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল: কিছুই একভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণমধ্যে যে বিভাগ হইয়াছিল, তাহার মূল বিবিধ প্রকারের বেদমন্ত্র হইতেই। মরণশীল মনুষ্যের সাধারণ নাম ছিল মর্ত্ত্যাস। যদিও মানবগণের জাতি বিভাগ বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদীয় যুগের প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নাম ব্যবহার হয় নাই, তথাচ তৎকাল কার্য্যের বিভাগানুসারে পৃথক্ পৃথক্ নামের ব্যবহার মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয়। চর্ষণী বা কৃষক, কর্ম্মকার বা ত্বষ্টা এবং তন্তুবায় শব্দের উল্লেখ আছে বহু মন্ত্রে; তাঁহারা ছিলেন ঋগ্বেদের মন্ত্র-সমাহর্ত্তা বা রচয়িতা ঋষি। যাঁহার যেরূপ শক্তি ও গুণ ছিল, তিনি সেইরূপই কার্য্য করিতেন। কৃষ্টি, কৃষক বা চর্ষণিগণ চাষবাস করিতেন, আবার ইন্দ্রের জন্য ঋক্‌মন্ত্র রচনা ও যজ্ঞকার্য্য করিতেন। ঋগ্বেদের ১০ম।১০১ সূক্ত পাঠে বোঝা যায় আর্য্যগণ **একত্রে মিলিয়া** নৌকা ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত, হল চালনা ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই করিতেন; ১০ম।৬৭, ৬৮ সূক্তে বৃহস্পতি প্রমুখ ঋষিগণের গোচারণ ও গোপালন বিষয়ক ব্যাপার বর্ণিত; ১০ম। ৮১, ৮২ সূক্তে কর্ম্মকার সম্প্রদায়ভুক্ত বিশ্বকর্ম্মা ঋষির গভীর জ্ঞানোন্মেষক বহু ঋক্‌মন্ত্র-আছে। নিম্ন-মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মা ঋষি তদানীন্তন সাধারণ ঋত্বিকগণের কার্য্যপ্রণালার উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুস্মাকমন্তরং বভুব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উকথ্‌শাসশ্চরন্তি॥" ১০।৮২।৭ঋ

মর্ম্ম—হে ঋষিগণ! যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও প্রজাবর্গ সৃজন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে (বিশ্বকর্ম্মাকে) জানিতে পার নাই। তোমাদের অন্তঃকরণ হইয়াছে অন্যপ্রকার। উদরনিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত, প্রাণপরায়ণ ঋত্বিকগণ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বিবিধ যজ্ঞকার্য্যে সদাব্যস্ত ও অজ্ঞানরূপ কুয়াসা দ্বারা আবৃত হইয়া নানারূপ বৃথা জল্পনা

করিয়া থাকেন। অর্থাৎ না-বুঝিয়া ভগবানের স্তবস্তুতিপাঠে যজমানের মনস্তুষ্টি করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে ঐ ঋক্ রচনাকালে ঋত্বিক্‌গণের ব্যবহারিক ও মানসিক অধোগতি কিরূপ হইয়াছিল। ঋত্বিকগণের মধ্যে এইরূপ অধোগতির বিষয় শুক্লযজুর্বেদেও হইয়াছে প্রতিধ্বনিত

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনা জনাঃ॥" [ঈশোপনিষৎ ৩]

কল্পিত বিরাট পুরুষের চারিঅঙ্গে চারিবর্ণের লোকঃ—

১। **সপ্তর্ষিমণ্ডল সহ ধ্রুবলোক**—মুখমণ্ডল বা মস্তক। এইলোকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ও বাস। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের অন্যতম বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেই জানেন।

২। **সূর্য্যলোক**—বক্ষ, হৃদয় ও বাহু এই লোক **ক্ষত্রিয়ের** উৎপত্তি ও বাস। তৈজসশক্তি বা তেজের নাম ক্ষত্র। সূর্য্যলোক তেজের আকর। বিশ্বামিত্র এই লোকের ঋষি; তিনি করেন গমনাগমন সপ্তর্ষিলোক হইতে সূর্য্যলোকে; কথান্তরে সূর্য্যই বিশ্বামিত্র।

৩। **সচন্দ্র অন্তরীক্ষলোক**—উরুদেশ, **বৈশ্যের** উৎপত্তি-ও-বাস।

৪। **সসাগরা ভূর্লোক**=পদদ্বয়; উৎপত্তি-ও বাস **শূদ্রের**; ইহা মর্ত্ত্যলোক।

সমস্ত লোকেই বাস করে জীব। প্রাচীন শাস্ত্রে ইহা উক্ত; এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহা প্রমাণিত হ'য়েছে। এই ৪র্থলোকে বাস করিয়া যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তিনি সেই লোকেই প্রকৃতপক্ষে করেন বাস। অনুলোমে ব্রহ্মই শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এবং বিলোমে তিনিই কর্ম্ম ও সাধনা দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে স্বীয় আদি-ব্রহ্মদশা হ'ন প্রাপ্ত।

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ গীঃ ১৮।৪২

"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥" [গৌতমসংহিতা]

এই সকল শাস্ত্রবাক্যে স্পষ্ট দেখা যায় যে স্বভাবসিদ্ধ গুণানুসারে মানবের উপাধি হইতেছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। গীতার স্থানে স্থানে স্পষ্ট ভাবে ইহা উক্ত ॥ **বৃহদারণ্যক বলেন :—**

I সৃষ্টির প্রথম অবস্থা বা **ব্রাহ্মণসৃষ্টি—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব"**—অগ্রে (জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান নভোমণ্ডল) এবং (একমাত্র ব্রহ্মই) আসীৎ (ছিলেন) অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন একমাত্র ব্রহ্মই, আর কিছুই ছিল না। প্রাচীন ভাষ্যকার "ব্রহ্ম" অর্থে লিখেছেন "ব্রাহ্মণজাতি" ; এস্থলে ঐ অর্থ সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

"তদেকং সন্ন ব্যভবৎ" :—তদ্ (ব্রহ্ম) একং (অদ্বিতীয়) সৎ (থাকায়) ন ব্যভবৎ (কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ ছিলেন না)। অর্থাৎ একা কোন কার্য্য হইতে পারেন না ; তজ্জন্য অন্ততঃ দুইজনের দরকার।

II সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থা বা **ক্ষত্রসৃষ্টি—"তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং"—তৎ** (তস্মাৎ = সেইহেতু) শ্রেয়রূপং (শক্তিশালী উৎকৃষ্টরূপ) ক্ষত্রং (বল-তেজ-বীর্য্য vibration) অত্যসৃজত (= অতি + অসৃজত অর্থাৎ ব্রহ্মে এই ভাব জাগিলে, আবির্ভাব হইল এক তৈজস শক্তির ; এই তৈজস শক্তিই ক্ষত্র = সংবরণ করা অর্থে √ক্ষদ + কর্তৃবাচ্যে ত্র।

"যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি" অর্থাৎ যানি ক্ষত্রাণি (যে সকল তৈজস শক্তি) ইন্দ্রঃ, বরুণ, সোম, রুদ্রঃ, পর্জ্জন্যঃ, যমঃ, মৃত্যুঃ, ঈশানঃ এতানি দেবত্রা (এই সকল দেবলোকপালক) [বভুবুঃ] হইয়াছিলেন আবির্ভূত ইন্দ্রাদিরূপে ; **"তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি"**—[এই জগৎ সৃষ্টিব্যাপারে] সেই ক্ষত্র বা তৈজসশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু নাই। **"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে"**—রাজসূয় যজ্ঞের সাধারণ অর্থ সামবেদীয় যজ্ঞবিশেষ। এখানে অর্থ অন্যরূপ

যথা √রাজ মানে দীপ্তি পাওয়া এবং √সূ মানে প্রসব ক্ষেপ-প্রেরণ। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি দ্বারা অর্থাৎ তেজঃ ক্ষেপণ করিয়া গ্রহনক্ষত্র উৎপন্ন করতঃ অসীম অন্তরীক্ষে যে বিশালরাজ্যের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাই রাজসূয়-যজ্ঞ নামে প্রাচীন গ্রন্থে ব্যাখ্যাত। এই সৃষ্টিব্যাপাররূপ রাজ সূয়-যজ্ঞ সম্পান্ন হইতেছে প্রত্যহই দুইভাবে—১ম্ সূর্য্যদ্বারা, ২য় চন্দ্রদ্বারা। সেইহেতু সৃষ্টিব্যাপাররূপ রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি সৃষ্টিব্যাপারে নিম্নস্থ ক্ষত্রিয়কে (= সূর্য্যকে) নিযুক্ত করিতেছে। অথবা নিম্নের চন্দ্রমণ্ডলস্থ ব্রহ্মশক্তি সৃষ্টিব্যাপারে সহায়তা করার জন্য ঊর্দ্ধস্থ ক্ষত্রিয়শক্তিকে (= সূর্য্যকে) করিতেছে উপাসনা। (সৌম্য হি ব্রাহ্মণঃ)। **"ক্ষত্র এব তদ্ যশো দধাতি"**—ক্ষত্র এব অর্থাৎ সূর্য্যদেবই সেই রাজসূয়যজ্ঞে বা সৃষ্টিব্যাপারে চন্দ্রদেবকে প্রদান করিয়া থাকেন ভোজ্যপদার্থ, সংহতি (নীরন্ধ্রতা বা গাঢ়সংযোগ) ও সেই যশ বা যশের হেতুভূতব্যাপ্তি [দ্রঃ দ্রঃ ভোজন করা অর্থে √অশ হইতে নিষ্পন্ন এই যশঃ শব্দটী] কথান্তরে সূর্য্যের তেজঃ বা শক্তি ও জ্যোতিঃ না পাইলে চন্দ্রদেব রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিতেন না।

"সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম"— যিনব্রহ্ম বা ব্রহ্ম শব্দবাচ্য, ক্ষত্রিয়ের তাহাই উৎপত্তি স্থল। কথান্তরে ব্রহ্ম হইতে তৈজস্ বা ক্ষত্র শক্তির উৎপত্তি। **ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়জাতি নহে।** চন্দ্রই বিরাট পুরুষের মনঃরূপে কল্পিত ; তাই চন্দ্র প্রপিতামহ এবং ব্রহ্মারূপী সূর্য্য পিতামহ। যদিও রাজা বা সূর্য্য আকারে ও শক্তিতে চন্দ্রাপেক্ষা বড়, তথাচ চন্দ্র সূর্য্যের অগ্রজাত জনক। অগ্নিসোম = Sun (= Heat) + Moon (= Cold)। তাই বলা হইয়াছে—**"তস্মাৎ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি"** (তাই ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হেতু, রাজা (সূর্য্য) পরমতা বা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইলেও **"ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং"** অর্থাৎ স্বীয় উৎপত্তি বা কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে অন্তত আশ্রয় করিয়া থাকেন।

III সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থা বা **বৈশ্যসৃষ্টি**- প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মলোক বা ধ্রুবলোক ; এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তেজের খনিস্বরূপ সূর্য্যলোক সৃষ্টি করিলেন। তৃতীয় অবস্থায় সেই তেজ সমস্ত পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করিয়া চন্দ্র, তারা গ্রহাদি সৃষ্টি করিলেন। তাই নিম্নোক্ত মন্ত্র উক্ত হইয়াছে—**"স নৈব ব্যভবৎ ; স বিশম-সৃজত, যানি এতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি"।** অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম, ক্ষত্র বা তেজ সৃষ্টি করিয়াও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না, সৃষ্টি প্রবাহ চালাবার জন্য কার্য্যকরণে সমর্থ হ'লেন না, তারপর তিনি বিশং [= সমস্ত জলপরমাণুতে তৈজস (সূর্য্য) শক্তির প্রবেশরূপ চন্দ্র-লোক] সৃষ্টি করিলেন। সুষুম্ন সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমাঃ। রুঃ যঃ। আরও, "রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।"—ইহা হইতে নিম্নোক্ত গণদেবতা সকলের নাম হ'য়েছে। তারপর ৮ বসু ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ১৩ বিশ্বদেব এবং ৪৯ মরুতগণ হইল উৎপন্ন। এই সকল দেবতা, মিশ্রিত সৃষ্টিকরণোপযোগী পরমাণু বিশেষ। প্রবেশ করা অর্থে √বিশ হইতে বৈশ্য শব্দ নিষ্পন্ন সূক্ষ্ম পরমাণু সকল মিলিত হইয়া তরল জলীয় অবস্থা প্রাপ্ত। মানবরূপী বৈশ্যজাতি নহে ইহা।

IV সৃষ্টির চতুর্থাবস্থা বা **শূদ্রসৃষ্টি** "স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণং অসৃজত পূষণং, ইয়ং বৈ পূষা, ইয়ং হীদংসর্বংপুষ্যতি, যদিদং কিঞ্চ।"

মর্ম্ম :—তৃতীয় লোক সৃষ্টির পরও সৃষ্টির সুবিধা হইল না। তিনি শূদ্রবর্ণীয় স্থূল পদার্থ পূষার সৃষ্টি করিলেন। পূষা কে ? ইয়ং (= পৃথিবী) বৈ পূষা। সৌরজগতের সমস্ত পদার্থকেই পোষণ করিতেছেন পৃথিবী। পৃথ্বিতত্ত্বের বা পৃথিবীর সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে সৃষ্টি হয় নাই সৌরজগতের। ক্লেদ শোক পবিত্রতা অর্থে √শুচ হইতে নিষ্পন্ন শূদ্র-শব্দটী ; ক্লেদ অর্থে ম যুক্ত হইয়া ও জলে সর পড়িয়া ক্রমশঃ পঙ্কবৎ ও কঠিন হইয়া সৃষ্টি হয় পৃথিবীর। তাই শূদ্র বলে পৃথিবীকে। সেইরূপ

মনুষ্যগণমধ্যে অজ্ঞানরূপ মলযুক্ত ব্যক্তিগণকে বলে শূদ্র। পৃথিবীর পবিত্রীকরণশক্তিও আছে এবং পোষণ করার শক্তি তো আছেই। পৃথ্বিতত্ত্বরূপ পরমাণুদ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজিত ও পালিত। তাই পৃথিবীকে বলে "পূষা"। পৃথিবীর আরও অন্যতম নাম বিশ্বা ও বিশ্বাম্ভরা! পঞ্চদশীর পঞ্চীকরণ ব্যাপার বুঝিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে পৃথিবী একটী প্রধান উপাদান; পৃথিবীর অভাবে ব্রহ্মসৃষ্ট জগৎ পারে না দাঁড়াইতে। তাই পৃথিবীকে ব্রহ্মের বা ভগবান্ বিষ্ণুর পদদ্বয় বলে; পদদ্বয় না থাকিলে কেহই পারে না দাঁড়াইতে। ছান্দো-গ্যোপনিষদ বলেন, "এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ"। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে পৃথিবী সারতত্ত্ব। কারণদেহের অস্থিস্বরূপ পৃথিবী।

V সৃষ্টির পঞ্চম অবস্থা বা **ধর্ম্মসৃষ্টি**—ব্রহ্মা, পৃথ্বিতত্ত্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার অভীপ্সিত সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন ঠিকমত হইতেছে না। তাই পুনরায় চিন্তা করিয়া "ধর্ম্ম" নামে একটী উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন পদার্থ করিলেন সৃষ্টি।

১৪। "স নৈব ব্যভবৎ, তৎ শ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ধর্ম্মং; তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যৎ ধর্ম্মঃ। তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি"।

এই ধর্ম্মই ক্ষত্রের বা শক্তিরও শক্তিস্বরূপ। কারণ, অগ্নি-জল-পৃথ্বিতত্ত্বের সংমিশ্রণে সূর্য্যাদি সমস্ত গ্রহলোক হইয়াছে সৃষ্ট। অগ্নি-জল-পৃথ্বি—এই তিনটী তত্ত্বকে একত্রে সংমিশ্রণ করিয়া রাখা ও সমস্ত গ্রহগণকে স্ব স্ব কক্ষায় আবদ্ধ রাখা, একমাত্র ধর্ম্মদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও সত্য একই পদার্থ। ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই। ধারণ করা অর্থে √ধৃ হইতে নিষ্পন্ন এই ধর্ম্ম-শব্দটী। এই পৃথিবী ব্রহ্মের চতুর্বিধ প্রজা বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান। পরমাত্মাই প্রত্যক্ষ ধ্রুব বা ধর্ম্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া বিদ্যমান্।

[বিশ্বামিত্র ঋষি সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান অত্যন্ত গূঢ় রহস্যময়। সূর্য্যই ব্রহ্মা, সূর্য্যই প্রজাপতি এবং সূর্য্যই **বিশ্বামিত্র**।]

শাস্ত্র বলেন—ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ। ব্রহ্মার সৃষ্ট এই চারিবর্ণ চিরকালই বর্ত্তমান একভাবে। জল শ্বেতবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল ও অগ্নিমিলিত চন্দ্র পীত-বর্ণ এবং পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ। যুগভেদে বিষ্ণুর বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে (২৪৮ অঃ) যজ্ঞবরাহকে পৃথিবী বলেন :—

"ত্বং হি শুক্লঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং চম্পকপ্রভঃ।
দ্বাপরে রক্তসঙ্কাশঃ কৃষ্ণঃ কলিযুগে ভবান্॥
বৈবর্ণ্যমভিধৎসে ত্বং প্রাপ্তেষু যুগসন্ধিষু।
বৈবর্ণ্যং সর্ব্বধর্ম্মাণামুৎপাদয়সি বেদবিৎ॥"

এমন সরল সংস্কৃতের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সূক্ষ্ম পরমাণুরূপে প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়েই বর্ণচতুষ্টয়ের অবস্থান। হৃদয়ের হিতা নাম্নী অতীব সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহ হৃদয় হইতে হৃদয়বেষ্টন অন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল নাড়ী শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের অতি সূক্ষ্ম রস দ্বারা পরিপূর্ণ। জীবাত্মা সুষুপ্তির অবস্থায় এই সকল নাড়ীতে থাকেন; তখন তিনি প্রাণ-ব্রহ্ম সহ এক হ'য়ে যান। পুনঃ জাগরিত হইলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের বিস্ফুলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিস্তারের ন্যায়, ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে সেন্দ্রিয় প্রাণসমূহ নিজ নিজ বিষয়ের দিকে হ'ন ধাবিত। জ্ঞানীরা প্রত্যহ পরোক্ষে তাঁদের ব্রহ্মদর্শনের বিষয় আছেন অবগত। [হিতা = গমন করা অর্থে √হি + ভাববাচ্যে ক্ত + স্ত্রিয়াং আপ্; শুভঙ্করী-মঙ্গলময়-অনুকূল নাড়ী]।

পরমাত্মার যেমন চারি ভাব—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়, চারিবর্ণ—শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ, চারিযুগ—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, চারিবিধি—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ; তেমন পরমাত্মা ব্রহ্মেরই চারি বিভাগ—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র। মানবের মধ্যে স্বাভাবিক এই চারি বিভাগ। কেবল মানবের মধ্যে কেন? সমস্ত পদার্থের মধ্যে গুণ ও অবস্থানুসারে এই বিভাগ আছে ও হইতে পারে। ঈশ্বরকৃত যে মনুষ্যজাতির বিভাগ,

তাহা পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশের মানবমধ্যেই বিদ্যমান ; তবে ভারতের মত বাঁধাবাঁধি বন্দোবস্ত বা প্রথা নাই কোথাও। পূর্ব্বোক্ত ১৪ নং আলোচ্যমান সূক্তের ব্রহ্মাঙ্গ বিভাগাবলম্বনে মানবসমাজকে বিভাগ করা হ'য়েছে। এ বিভাগ নিন্দার্হ নহে মোটেই, বরং শান্তি-সুশৃঙ্খলা রক্ষার অমোঘ উপায়। নিন্দার্হ হইতেছে অস্পৃশ্যতা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতা। শাস্ত্রে যে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিলে আর কোন দুঃখ ক্ষোভের ও কষ্টের কারণ থাকিতে পারে না ও অপ্রসন্নতা বলিয়া কিছুই থাকে না।

মহাভারত বনপর্ব্ব ১২৫ অঃ শ্লোক—

"যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেৎ দ্বিজঃ॥"

যে শূদ্রো দম-সত্য-ধর্ম্মে সদা অনুরক্ত তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়, যেহেতু সদ্ব্যবহারই ও সদাচারই দ্বিজত্বের লক্ষণ। এইরূপ বহু শাস্ত্রবাক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু আক্ষেপের কথা শাস্ত্র মানিয়া ক'জন চলেন ?

মানবের দেবতা ও কার্য্যাদর্শনে জাতি নির্ণয়—

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতিনাং মুনিনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥" (উঃ গীতা ৩।৭)

মানবের মধ্যে বাহ্যিকভাবদর্শনে জাতি নির্ণয় -

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥"

অনুলোমে এই প্রকার, বিলোমে ইহার বিপরীত।

মান, অপমান ও স্বার্থত্যাগ করিয়া, যিনি ভগবানে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে সমর্থ হ'য়েছেন, তিনিই জ্ঞানচক্ষে সমস্ত দর্শন করিয়া ভূমা ও আনন্দময়স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার দ্বারা সাধিত হয় জগতের বহু উপকার।

ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি বর্ণের মনুষ্য উদ্ভবের উক্তি নহে সত্য

—তাহা প্রমাণিত অত্রিঋষিবচন দ্বারা। অত্রিসংহিতায় দশবিধ ব্রাহ্মণ ও তল্লক্ষণ সম্বন্ধে ঋষির উক্তি—

"দেবো মুনি দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

১। দেব, ২। মুনি, ৩। দ্বিজ, ৪। রাজা, ৫। বৈশ্য, ৬। শূদ্র, ৭। নিষাদ, ৮। পশু, ৯। ম্লেচ্ছ, ১০। চাণ্ডাল—এই দশ প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে শাস্ত্রে; উহাঁদের গুণ ও কার্য্য ঐ সংহিতায় দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির উদ্ভব সত্য হইলে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইত না কখনই নিম্নোক্ত উক্তি।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন—

"এতে বিবস্বতঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈবান্বয়ে স্মৃতাঃ।
যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমতীতা সহস্রশঃ॥" [বাঃ পুঃ ৯৯অ]

মর্ম্ম :—পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় (ইক্ষাকু ও ঐল বংশীয়) যে সকল কীর্ত্তি-বর্দ্ধন রাজাদের বিষয় কীর্ত্তিত হইল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অতীত হইয়াছেন, যাঁরা বর্ত্তমান এবং যাঁরা ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁদের মধ্যে (গুণ ও কর্ম্মানুসারে) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র উক্ত বংশদ্বয়ে বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। যুগে যুগে সহস্র সহস্র মহাত্মা অতীত হ'য়েছেন।

সমাপ্তিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণোৎপত্তির যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, প্রচলিত অর্থানুসারে তাহার নাই কোন সার্থকতা, বা তাহাতে নিহিত নাই কোন সত্য। যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য। আলোচ্য ঋকের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করিতে না পারায় ও প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি না হওয়ায়, ভাষ্যাদির বিকৃতার্থানুসারে একটী ভ্রমাত্মক ধারণা চলিয়া আসিতেছে মাত্র। এখন প্রাচীনের আদর্শ কল্যাণকর ও

শান্তিপূর্ণ সাম্যবাদের বৈদিক ব্যবস্থার প্রতি বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত সাম্যবাদীদের দৃষ্টি সসম্মানে আকর্ষণ করা যায়। তাঁরা জেনে রাখুন—মানবসমাজের জাতিবিভাগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মঙ্গলসূচক। স্থির ধীর বিচারশীল চিত্তে সুধী-ধীমান্ আধুনিক তথাকথিত সাম্যবাদীকে ভাবিতে হইবে—প্রকৃতির বৈষম্যেই সৃষ্টি ও স্থিতি; সাম্যে হ'তে পারে না কোন সৃষ্টি অথবা স্থিতি; পরন্তু সাম্য প্রলয়েরই পূর্ব্বলক্ষণ। অবশ্য অতীব উচ্চস্তরীয় মুমুক্ষু সাধকই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সর্ব্বভূতে করেন সমদর্শন; সাধারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা পাইতে হ'লে বর্ত্তমানের বিকৃত সাম্যবাদ অচল। স্থূল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও যদি লক্ষ্য করা যায় বেতার বার্ত্তাপ্রেরক যন্ত্রের দিকে (Radio) তাহ'লে বেশ অনুমানই হয় যে তরঙ্গই বেতারের স্বরূপ এবং তরঙ্গের রূপ হয় না কখনও সরল বা সমানও একটানা—ইহা সুবিদিত। আমাদের এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ লীলাময়ী প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে লীলার স্বরূপই ঐ তরঙ্গ, যাকে বলে লীলাতরঙ্গ। ব্যবহারিক জগতে বাস ক'রে প্রলয়রূপ সাম্যের অলীক স্বপ্ন দেখা সুধী সজ্জনের সঙ্গত কর্ম্ম নহে। আরও আধুনিক সাম্যবাদী জেনেরাখুন—একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই বা আত্মসত্তাই যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা লীলাকৈবল্যবশতঃ ইচ্ছানুসারে উদ্ভাসিত, তরঙ্গায়িত, কোথাও উজ্জ্বলায়িত কোথাও বা অনুজ্জ্বলায়িত—এইরূপ ধারণা বা উপলব্ধিতে অবস্থান করিলেই এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপ্রসন্নতা বলিয়া—নিরানন্দ বলিয়া কোথাও কছু থাকে না। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের পরস্পর সংক্ষোভ-তারতম্যানুসারে ব্রহ্মের (অজ্ঞোর) লীলাকৈবল্যবশতঃ অভেদ ব্রহ্মসমুদ্রে ভেদোপচার অবশ্যম্ভাবী। লীলাময়ী প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে যতদিন থাকিবে লীলা ততদিনই হইবে অভেদে ভেদোপচার !! ইহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না কোন কালে কোনও মনুষ্যশক্তি।